কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

ঈমান-আকীদা

প্রথম খণ্ড

মাওলানা সাঈদ আহমদ
উস্তাদ, দারুল উলূম হাটহাজারী

CS CamScanner

দারুল ফিকর

CamScanner

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

ঈমান-আকীদা

প্রথম খণ্ড

ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা, অসচ্ছতা, শিথিলতা, অসাবধানতা, সিদ্ধান্তহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার কোনো অবকাশ নেই

মাওলানা সাঈদ আহমদ

উস্তাদ : দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : জামিআতুল কাউসার, চট্টগ্রাম

দারুল ফিকর
জযবা | ইলম | ইত্তেবা

CamScanner

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমান-আকীদা ১

মাওলানা সাঈদ আহমদ

প্রথম প্রকাশ
রমযান ১৪৪৫ হিজরী, মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : খালেদ হাসান খান আরাফাত
পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহারেব মুহাম্মাদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই : মা-মনি প্রিন্টার্স, ০১৭৩৮৮৭৮৭৮০

বাংলাবাজার পরিবেশক
উমেদ প্রকাশ
১১ ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
চট্টগ্রাম পরিবেশক
ইসলামিয়া লাইব্রেরি হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৬৪৫-১৫৩৭৩৮

অনলাইন পরিবেশক
Rokomari.com | Wafilife.com
Jazabor.com | khidmahshop.com

মূল্য : ৫৬০ টাকা

দারুল ফিকর
জযবা | ইলম | ইস্তেবা
১১ ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
Darulfikr.bn@gmail.com
Umedprokash.com
Phone : 01757597724

এ বই ‘আমি ইসলামের মধ্যে আছি’ এমন ঘোর থেকে বেরিয়ে ‘ইসলাম কি আমার মধ্যে আছে?’ এমন প্রশ্ন জাগিয়ে তোলার জন্য।

এ বই ‘আমি মুসলিম, আমার বাপ-দাদা মুসলিম’ এমন দাবিতে আত্মতৃপ্ত না হয়ে, প্রকৃতপক্ষে আমি মুসলিম কি না তা অনুসন্ধান করে দেখার জন্য।

এ বই অন্য কারও ঈমান যাচাই করার জন্য নয়; বরং নিজের ঈমান-আকীদা বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করার জন্য এবং ঈমান-ইসলাম হারানোর চোরাপথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য।

এ বই কাউকে তাকফীর (কাফের বলা ও সাব্যস্ত) করার জন্য নয়; বরং নিজেকে কুফর থেকে বাঁচানো ও অন্যকে সতর্ক করার জন্য।

কুফরের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই, কুফরের ভয়াবহতা তুলে ধরি। কুফর নিয়ে আলোচনা করা মানেই কাউকে তাকফীর করা নয়।

কুফর ও তাকফীরের মাঝে রয়েছে পার্থক্য, তাকফীরের জন্য রয়েছে কিছু প্রতিবন্ধকতা ও শর্ত, যা বুঝতে অনেকেই ব্যর্থ। তাকফীর জনসাধারণ তো দূরের কথা, সাধারণ আলেমও এর জন্য অনুপযুক্ত।

কুফর-শিরকমিশ্রিত ঈমান-আকীদা নিয়ে যদি কেউ আমলের পাহাড় গড়ে তোলে, তবে তার সকল আমল বরবাদ এবং পরকালে এ আমলের স্বরূপ হলো ফলবিহীন চাষাবাদ। এ জন্যই ঈমান-আকীদা ঠিক করতে হবে আমলের আগে এবং সর্বপ্রথমে।

CamScanner

প্রাক কথা

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার ওপর প্রথম ও প্রধান আদেশ হলো, তাঁর ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর রাসূলের আনীত দ্বীন কবুল করা।

বস্তুত ঈমানই বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় হক, এটাই বান্দার আসল সম্পদ, এতেই দুনিয়া-আখিরাতের প্রকৃত কল্যাণ এবং চিরস্থায়ী জান্নাত-জাহান্নামের ফায়সালার ভিত্তি। এই ঈমানই মহান প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর কাছে সম্মানিত হওয়ার প্রধানতম পথ ও সহজতম পন্থা।

আর ঈমান ছাড়া বান্দা তার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাছে বিদ্রোহের অপরাধে চরম ঘৃণিত ও বিতাড়িত; বরং এর চেয়ে বড় বঞ্চনা আর কিছুই হতে পারে না।

এ কথা স্পষ্ট যে, ঈমানের মূল উপাদান ও সর্বপ্রথম সম্পর্ক হলো আকীদার সঙ্গে। তাই আকীদা ছাড়া ঈমান অর্জনের কোনো সুযোগ ও বাস্তবতা ইসলামে নেই।

ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস তিনটি : ১. তাওহীদ বা একত্ববাদ। ২. রিসালাত বা রাসূলের অনুসরণ। ৩. আখিরাত বা পরকালের জীবন। আকীদা-বিশ্বাসের এই মৌলিক তিনটি স্তম্ভ আমাদের কাছে যা দাবি করে, তা সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, 'আমি আল্লাহ তাআলাকে একক মেনে তাঁরই ইবাদত করি ও আনুগত্য করি, যা বাস্তবায়ন করি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে, যেন আমি পরকালে সফল হতে পারি।'

কাজেই আমার থেকে এমন কোনো কথা-কাজ ও আচরণ-উচ্চারণ যাতে প্রকাশ না পায়, যা তাওহীদের বিপরীত হয় তথা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা হয়, যা রিসালাতের খেলাফ হয় তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বিরোধিতা হয়, এবং যেটার কারণে পরকালে আমি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাই।

দ্বীন ইসলামের মূল ও আসল হলো আকীদা। সকল নবী-রাসূল আকীদার দাওয়াত দিতেন, যা তাঁরা ওহীর মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। সকল নবী-রাসূলের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক তাগিদ ছিল আকীদা পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারেই। কুরআন কারীম নবীগণের

CamScanner

দাওয়াতের যে চিত্র তুলে ধরেছে তা থেকে এ বিষয়টি একদম স্পষ্ট যে, তাঁদের দাওয়াতের সূচনাই হয়েছিল আকীদার মাধ্যমে।

পরিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া সবই মূল্যহীন। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

'বলুন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব কাদের কৃতকর্ম বেশি নিষ্ফল? যাদের চেষ্টা পার্থিব জীবনে হয় বিভ্রান্ত অথচ তারা মনে করে যে, তারা খুব ভালো কাজ করছে। তারাই সেই লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলি ও তাঁর সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করে। সুতরাং তাদের কৃতকর্ম পণ্ড হয়ে গেছে। কাজেই কিয়ামতের দিন তাদের জন্য তুলাদণ্ড খাড়া করব না।'[১]

যেকোনো আকীদা-বিশ্বাস এমনই প্রভাব রাখে যে, যদি তা অন্তরে ভালোভাবে বসে যায়, তাহলে আমল ও কাজকর্মে এর প্রতিফলন ঘটে, জন্ম নেয় আইন-কানুন ও নীতিনৈতিকতা মেনে চলার অনুভূতি। তাই আকীদা-বিশ্বাস ইসলামের সকল আইন-কানুন ও নীতিমালা বাস্তবায়িত হওয়ার এক মৌলিক শক্তি। ইসলাম হালাল ও হারামের যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছে, তা বাস্তবায়নের মূল নির্ভর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নয়, বরং ঈমান ও আকীদার বিশুদ্ধতা এবং আখিরাতে আল্লাহর সামনে উপস্থিতির অনুভূতি জাগ্রত রাখা।

আকীদার গুরুত্ব এবং তা শত্রুতা ও মিত্রতার মাপকাঠি হওয়ার এর চেয়ে বড় দলীল আর কী হতে পারে যে, সূরা কাফিরূন মক্কা মুকাররামায় ওই সময় অবতীর্ণ হয়েছে, যখন নম্রতা, কৌশল এবং আকীদা ও ইবাদতের ব্যাপারে শত্রুতা সৃষ্টি না করা এবং বিষয়টিকে ইসলামের শক্তিমত্তা ও নিরাপদ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখাই ছিল সময়ের বাহ্যত দাবি। কিন্তু কুরআন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে,

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.

'বলুন, হে কাফেরগণ! না আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি, আর না তোমরা আমার মাবুদের উপাসনা করো। আর না (ভবিষ্যতেও) আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করব, আর না তোমরা আমার মাবুদের উপাসনা করবে।'[২]

১. সূরা কাহাফ, (১৮) : ১০৩-১০৫

২. সূরা কাফিরূন, (১০৯) : ১-৫; দস্তুরে হায়াত, পৃষ্ঠা ২৪

CamScanner

বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং সঠিক আকীদার ওপর দৃঢ়পদ থাকা এবং এ ব্যাপারে কোনো ধরনের আপসরফার অবৈধতার স্বপক্ষে এর চেয়ে বড় দলীল আর কিছুই হতে পারে না।

ইসলাম আকীদার ক্ষেত্রে কঠিন ও দৃঢ়পদ থাকার আদেশ করেছে এবং এ ব্যাপারে এতটাই জোর দিয়েছে যে, এতে কোনো ধরনের শিথিলতা বা আপসমূলক মনোভাবকে অবৈধ সাব্যস্ত করেছে। হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী রাহ.-এর ভাষায়, 'ঈমান ও আকীদার ব্যাপারে এই দৃঢ়তা ও অনমনীয়তাই হলো সেই সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা, যা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াত আর শক্তিমান নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক লিডার, বিপ্লবী এবং ওই সব ব্যক্তিবর্গের মাঝে টেনে দেওয়া হয়েছে, যাদের চিন্তা-ভাবনার মূল উৎস নবীগণের শিক্ষা, নির্দেশনা এবং পবিত্র সীরাতের স্থলে অন্য কোনো কিছু।'

তিনি আরও লেখেন, 'বর্তমান যুগের ক্রমবনতিশীল অবস্থায় যারা দুঃখিত তাদের কারও কারও মধ্যে এই স্বভাব সৃষ্টি হয়েছে যে, যখনই কোনো ব্যক্তি সংস্কার ও বিপ্লবের স্লোগান দেয় অথবা কোনো বড় শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বসে, তখন তার আকীদাগত যেকোনো ত্রুটি, চিন্তা-দর্শনের যেকোনো বক্রতা ক্ষমার্হ মনে করে এবং আকীদার বিষয়টিকে বিবেচনাযোগ্য কোনো বিষয়ই মনে করে না।

উল্টো ওই সব মানুষকে ভর্ৎসনার টার্গেটে পরিণত করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাতিল শক্তির সাথে গোপন আঁতাতের অপবাদও আরোপ করে, যারা এ ক্ষেত্রে আকীদার বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসে এবং আকীদার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করে। এই চিন্তা-রীতি ও কর্ম-নীতির সাথে বিশুদ্ধ দ্বীনীরুচি ও নববী পথ ও পন্থার কোনোই মিল নেই।'[৩]

একটি বিনীত আরয :

আমরা ফিকহের জন্য 'নূরুল ইযাহ' থেকে 'হেদায়া'সহ অনেক কিতাব পড়লেও আকীদার জন্য শুধুমাত্র 'শারহুল আকায়িদ' কিতাবটি পড়ি। আর কিছু মাদরাসায় 'আকীদাতুত তাহাবী'ও পড়ানো হয়। এখানে আমার নেসাব বিষয়ে আলোচনা করা উদ্দেশ্য না, আর আমি এটার আহলও না। এ বিষয়ে যারা উপযুক্ত ও এটি যাদের দায়িত্ব, তারা ফিকর করবেন ও বলবেন।

তবে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয় যে, বর্তমান আমাদের দরসগুলোতে

---

৩. দস্তূরে হায়াত, পৃষ্ঠা ২১-২২; নির্বাচিত প্রবন্ধ, ১/১৮-১৯

CamScanner

যে সকল ফন ও বিষয় অবহেলিত অথবা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে, তন্মধ্যে 'কুরআনে কারীম' ও 'আকীদা' প্রথম ও প্রধানতম।

কাজেই এর বিশেষ গুরুত্বের জন্য বর্তমান নেসাবের মধ্যেই দরসগুলোতে ঈমান-আকীদা সংক্রান্ত বিষয়কে যথাযথ মূল্যায়ন করা। এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও মূল্যায়নেও ঈমান-আকীদা সংশ্লিষ্ট বিষয় অধিক গুরুত্ব দেওয়া।

এ ছাড়া আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেমন :

১. আকীদার মূল মাবাহিসকে সুবিন্যস্ত আকারে সহজভাবে তুলে ধরা।

২. আকীদাগুলো নুসূসসহ ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা। এরপর তা হিফয করানো। যেমন আরকানে ঈমান কয়টি ও এর নস কী? ইত্যাদি।

৩. কিতাবে উল্লেখিত ফেরকাগুলোর সাথে সাথে বর্তমান আলোচিত আহলুস সুন্নাহর খেলাফ আকীদা-মানহাজ এবং ফেরাকে ইসলামিয়া ও আদয়ানে বাতিলা আর সমকালীন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা।

৪. একটা তিক্ত বাস্তবতা হচ্ছে, সাধারণত আমাদের দরস ও আলোচনাগুলোতে যা আলোচিত হয়, তা প্রচলিত না। আর যা প্রচলিত, তা আলোচিত হয় না। তাই ফেরকাগুলোর বিভিন্ন আকীদা ও দর্শন থাকলেও বর্তমানে তাদের কর্মপদ্ধতি ও মাঠ পর্যায়ের বিশ্লেষণ করা এবং পর্যালোচনা করা অপরিহার্য। যাতে রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া যায়। অন্যথায় দরসের পড়া দিয়ে কাজের ময়দানে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ফল দেখতে হবে। এর অনেক উদাহরণ আছে। যেমন : মির্যা কাদিয়ানীর 'নবী দাবি' ও 'খতমে নবুওয়াত' অস্বীকারের বিষয়টি আমাদের জানা থাকলেও 'ইমাম মাহদী' দাবীর বিষয়টি এবং বর্তমানে তাদের কর্মপদ্ধতি জানা না থাকার কারণে বছর দুয়েক আগে বিবিসির আয়োজনে কাদিয়ানীদের সাথে যে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এর অনাকাঙ্ক্ষিত ফল দেখতে হয়েছে।

৫. ফেরকাগুলোর আকীদা-দর্শন তাদের রচিত ও নির্ভরযোগ্য উৎস বা তাদের প্রকাশিত লিখনী থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করা। এরপর 'কাইফিয়াতে রদ' বিশেষত তাদের উসূল ও মূলনীতির আলোকে রদের পদ্ধতি রপ্ত করানো।

মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী রাহ. 'হিন্দুস্তান মে মুসলমানূ কা নেযামে তালীম' গ্রন্থে বলেছেন, 'মতবাদগুলো নতুন কিছু নিয়ে আসে না, এগুলো আসে পুরোনো কোনো বাতিল মতবাদের অংশবিশেষ নিয়ে, নতুন রূপে, নতুন উপস্থাপনে।'

কবি বলেন,

یہ شان نیا رنگ — نیا دور نیا ہے　　نام تو اسلام مگر کام کفر ہے

لا حول ولا قوت — یہ کیسا بشر ہے　　صورت بوزینہ مگر دم کا قصر ہے

ای قوم مسلمان خبردار خبردار　　یہ وقت نہ غفلت کا ہے ہوشیار ہو ہوشیار

সচেতন মহলের কাছে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং বর্তমান সময়ের কঠিন অবস্থা ও বাস্তবতা অপরিষ্কার নয়। সুতরাং সময়ের আবেদন ও দাবিকে সামনে রেখে আমাদের কিতাবের দরসের পদ্ধতি সাজানো দরকার।

এখানে আরেকটি তথ্য উল্লেখ করা মুনাসিব মনে হচ্ছে যে, একসময় আকীদার কিতাবাদি অপ্রকাশিত বা সহজলভ্য না থাকলেও এখন অনেক আকীদার কিতাব প্রকাশিত হচ্ছে এবং সহজে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন : হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিকহের কিতাব 'বাদায়িউস সানায়ি'-এর লেখক ইমাম আবু বকর কাসানী রাহ. (মৃ. ৫৮৭ হি.)-এর সংক্ষিপ্ত ও ছোট ছোট বাক্যে সুখপাঠ্য 'আল-মু'তামাদ মিনাল মু'তাকাদ', দরসে নেযামীতে পাঠ্য 'কানযুদ দাকায়েক' কিতাবের রচয়িতা ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফী মাতুরীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ৭১০ হি.)-এর 'আল-ই'তিকাদ' ও লেখক কর্তৃক এর শরাহ 'আল-ই'তিমাদ ফীল ই'তিকাদ', দরসে নেযামীর কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' ও 'আল-ফাওযুল কাবীরের' লেখক শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী রাহ. (মৃ. ১১৭৬ হি.)-এর 'আল-আকীদাতাতুল হাসানাহ' ও মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.)-এর 'আল-মুসায়ারাহ' এবং এর ওপর কাসেম ইবনে কুতলূবুগা রাহ. (মৃ. ৮৭৯ হি.)-এর তা'লীক সহজে পাওয়া যায়।

এভাবে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর দিকে সম্বোধিত পাঁচটি কিতাব তথা 'আল-ফিকহুল আকবার', 'আল-ফিকহুল আবসাত', 'আর-রিসালা', 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' ও 'কিতাবুল ওসিয়্যাহ' এবং পাঁচ কিতাবের সমষ্টি ও মুলাখ্খাছ, যা কামালুদ্দীন বায়াযী রাহ. (মৃ. ১০৯৮ হি.)-এর প্রস্তুতকৃত 'আল-উসূলুল মুনীফাহ' নামে পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরও অনেক কিতাব রয়েছে, যা বিভিন্ন জামাতে নেসাবের উপযোগী। আল্লাহর তাওফীক শামিলে হাল হলে আমাদের প্রতিষ্ঠান 'জামিআতুল কাউসার'-এ উল্লিখিত কিতাবগুলো বিভিন্ন জামাতে নেসাবের নিয়ত করেছি।

রচনা-পদ্ধতি :

এই কিতাবটির বিন্যাসের ক্ষেত্রে এ লেখার শুরুতে উল্লেখিত আকীদার মৌলিক তিন স্তম্ভ (তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত, যেগুলোকে কাছাকাছি অর্থে আরবীতে

'ইলাহিয়্যাত', 'নুবুওয়াত' ও 'সামইয়্যাত' বলে) সামনে রাখা হয়েছে, একে কেন্দ্র করেই পুরো বইকে সাজানো হয়েছে। তবে আকীদাসমূহ জানার মূল উদ্দেশ্য যেহেতু এগুলোর ওপর ঈমান আনা ও কুফর থেকে বেঁচে থাকা, তাই আকীদার আগে ঈমান ও কুফর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তা ছাড়া আকীদা নিয়ে অনেক কাজ হলেও ঈমান-কুফর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও লেখালেখি তুলনামূলক কম। বিশেষত সমসাময়িক বিষয়গুলোর আলোকপাত নিতান্তই কম। অথচ ঈমানের আলোচনায় সমসাময়িক বিষয়গুলো আলোকপাত করা অত্যন্ত জরুরি। আর আকীদার কিতাবেও ঈমানের আলোচনাটা শেষের দিকে হওয়ায় বছরের শেষে মাদরাসার ছাত্রদেরও বিস্তারিত জানার ও সমসাময়িক বিষয়গুলো আলোকপাতের সুযোগ হয় না। তাই প্রথমেই এ বিষয়ে সমসাময়িক বিষয়গুলোসহ সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

জানা কথা, কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মত বিষয়ে কারও আলাদা কোনো মাযহাব-মাসলাক ও ধারা নেই, বরং এ ক্ষেত্রে আহলে হক সকলেই একমত। তবে অস্পষ্ট ও ইজতিহাদী বিষয়ে বিভিন্ন ধারা ও মাসলাকগত ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে। আর ইখতিলাফ সৃষ্টি হলে যেকোনো একটি ধারা অবলম্বন করতে হয়। যেমন : ইমাম তাহাবী রাহ. তাঁর বিখ্যাত আকীদার কিতাবটির শুরুতে লিখেছেন,

هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ: أَبِيْ حَنِيفَةَ، وَأَبِيْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَمَا يَعْتَقِدُوْنَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَيَدِينُوْنَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

অর্থাৎ তিনি এই কিতাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদা বর্ণনা করবেন। আর এসব আকীদা তিনি ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহ.-এর মাসলাক ও আকীদা মোতাবেক বর্ণনা করবেন।

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইখতিলাফী বিষয়ে তিনি এই তিন ইমামের মাসলাক ও আকীদা মোতাবেক বর্ণনা করবেন, যেমনটা তিনি ঈমানের সংজ্ঞায় করেছেন। অর্থাৎ তিনি যদিও কোনো বিষয়ে ইখতিলাফ ও এর বিশ্লেষণ, অতঃপর একটাকে প্রাধান্যদান—এ জাতীয় কাজ করেননি; কিন্তু তিনি ঈমানের সংজ্ঞা লিখেছেন, সিফাতের আলোচনা এনেছেন—এগুলোতে ইখতিলাফ আছে। কিন্তু তিনি বিস্তারিত আলোচনায় যাননি, মতানৈক্যের আলাপ তোলেননি; বরং শুধু হানাফী ইমামগণের মতটা উল্লেখ করেছেন। কাজেই মতানৈক্যের আলাপ না করা, আর মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় না আনা এক কথা নয়।

এ গ্রন্থেও ইখতিলাফী বিষয়ে কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি প্রধানত ইমাম আযম আবু

CamScanner

হানীফা রাহ., ইমাম তাহাবী, ইমাম মাতুরীদী রাহ. ও মাতুরীদী ধারার ইমামগণের ব্যাখ্যাকৃত ও বিশ্লেষিত আকীদা তাঁদেরই কিতাব থেকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। এবং কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে আশআরী ও প্রকৃত আছারী বা হাম্বলীদের মিল ও একতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আশা করছি এই কিতাব আমাদের বিশুদ্ধ ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং কুফর ও রিদ্দাহর এই ভয়াল স্রোতে ঈমানের সাথে জুড়ে থাকার মাধ্যম হবে, ইনশাআল্লাহ। কিতাবটিকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন ও পরিবেশনের জন্য আমরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করেছি।

কিতাবটি লেখার পর পারদর্শী অনুজ ও অগ্রজদের কাছে পাঠিয়েছি। তারা কিছু কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষত মুহতারাম মাওলানা ইউসুফ ওবায়দী সাহেব ও মাওলানা তাকী হাফিযাহুমাল্লাহ কিছু মুলাহাযা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তাঁর শান মোতাবেক উত্তম বদলা দান করুন।

এরপরও মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং বিজ্ঞ পাঠক ও উলামায়ে কেরামের খেদমতে অনুরোধ রইল, এই গ্রন্থে কোনো ভুল বা অসংগতি চোখে পড়লে আমাদের জানাবেন, আমরা সেটা পর্যালোচনা করে দেখব ইনশাআল্লাহ।

কিছু অনুরোধ :

১. এই কিতাব পাঠকারী সকলের কাছে আবেদন থাকবে, সম্ভব হলে এটি পড়ার আগে আপনার তা'লীমী মুরুব্বীর সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। আর এই কিতাবের বক্তব্যের সাথে দ্বিমত সৃষ্টি হলে আপনি আপনার মুরুব্বীর পরামর্শ ও নির্দেশনাকেই মেনে চলবেন। কারণ, আপনার তা'লীমী মুরুব্বীই আপনার ব্যাপারে ভালো জানেন, তার দিকনির্দেশনাই আপনার জন্য সুফল বয়ে আনবে।

২. সম্ভব হলে পুরো কিতাব পড়ে মন্তব্য করবেন বা লিখবেন, অথবা সূচিপত্র দেখে সংশ্লিষ্ট সব আলোচনা পড়ে কোনো অসংগতি মনে হলে আমাকে বা প্রকাশককে জানাবেন। এটাই যথাযথ নিয়ম। উদাহরণস্বরূপ আপনি কোথাও দেখলেন যে, 'আল্লাহর হাত' লেখা হয়েছে, আর এটা দেখেই ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়ে দিলেন, তাহলে আপনি ভুল করবেন। কেননা 'আল্লাহর হাত' বলে অনুবাদ করা যাবে কি না- এ বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা রয়েছে। কাজেই এ বিষয়ে কিছু বলতে হলে অবশ্যই ওই আলোচনা পড়ে করতে হবে।

৩. ভুল-বিচ্যুতি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে ইসলামে অবদান রাখা অনেক ইমামের নাম উল্লেখ করতে হয়েছে। তবে যথাসম্ভব শ্রদ্ধা ও ইনসাফের

CS CamScanner

সাথে বলার চেষ্টা করেছি। আশা করি এতে কেউ মনে কষ্ট নেবেন না।

৪. পাঠকদের সাধারণত একটি অভ্যাস হলো, বই পাঠ করার সময় বইয়ের টীকাগুলো এড়িয়ে যাওয়া বা হালকাভাবে দৃষ্টি বুলিয়ে যাওয়া। এ গ্রন্থটির বেলায় এমনটি করলে আপনি অনেক মূল্যবান তথ্য থেকে মাহরুম হবেন। সুতরাং মূল পাঠের মতোই টীকাগুলোও মনযোগ দিয়ে পাঠ করার বিশেষ অনুরোধ রইল।

৫. এই বই পড়ে আপনি যদি উপকৃত হন, তাহলে আমার জন্য, 'জামিআতুল কাউসার' ও এ বান্দার অল্প-স্বল্প দ্বীনী খেদমাতগুলো ইখলাসের সাথে মাকবুলের জন্য এবং ঈমানের সাথে মওত নসীব হওয়ার জন্য দুআর দরখাস্ত করছি।

প্রকাশনা জগতের অনন্য প্রতিষ্ঠান দারুল ফিকর ও উম্মেদ প্রকাশের স্বত্বাধিকারী মুহাম্মাদ হোসাইন ভাই অনেক কষ্ট করেছেন। তাকে-সহ এই গ্রন্থের পেছনে শ্রমদানকারী সবাইকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। এই বইটিকে লেখক-পাঠক সবার জন্য নাজাতের জরিয়া হিসেবে কবুল করুন।

বান্দা সাঈদ আহমদ

খাদিমুত তালাবা, হাটহাজারী মাদরাসা চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

৫/৯/১৪৪৫ হিজরী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ঈমান-আকীদার গুরুত্ব ও কুফর-শিরকের পরিণতি

ঈমান ও আকীদা পরিচিতি ১৯
ঈমান-আকীদার গুরুত্ব ২১
প্রথম ও প্রধান কাজ ঈমান আনা ও আকীদা ঠিক করা ২২
ঈমান-আকীদা ঠিক করা সর্বোত্তম আমল ২৪
ঈমান-আকীদা সংরক্ষণ ফরজ ২৭
কোনো ভালো কাজই ঈমানের সমতুল্য হতে পারে না ৩১
আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য ঈমান-আকীদা ঠিক থাকা শর্ত ৩২
ঈমান ছাড়া আমলের কোনো প্রতিদান নেই আখিরাতে ৩৩
ঈমান বড়ই মূল্যবান, আমল ছাড়া শুধু ঈমানের মূল্য আছে ৩৫
গুনাহগার হলেও ঈমানের মূল্য ও প্রতিদান আছে ৩৭
ঈমান ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না ৩৮
চূড়ান্ত সফলতার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল থাকতে হবে ৩৮
ঈমানবিহীন মৃত্যুর ঠিকানা চিরস্থায়ী জাহান্নাম ৩৯
কুফর-শিরক গুনাহের কোনো ক্ষমা নেই ৩৯
আমাদের সৃষ্টি অনর্থক নয় ৪০
আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ৪০
এ জগতে পুণ্য ও পাপ উভয়টা করার সুযোগ আছে ৪১
পৃথিবীতে দু-রকমের লোক পাওয়া যাবে ৪১
পরিপূর্ণ সফলতার জন্য ঈমানের সাথে আমলও জরুরি ৪২

CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঈমান পরিচিতি ও মুমিন হওয়ার জন্য শর্তসমূহ

পরিপূর্ণ ঈমান হচ্ছে সাতটি বিষয় পালন ও বাস্তবায়নের নাম : ৪৪
প্রথম বিষয় : মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা........ ৪৪
বিশ্বাস-সত্যায়নের ভিত্তি বিজ্ঞান, যৌক্তিকতা ও বিবেককে বানানো যাবে না........ ৪৬
অদৃশ্য-অদেখা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—এমন সকল বিষয় ও বস্তুর ওপর ঈমান আনতে হবে........ ৫০
তাসদীক তথা বিশ্বাস-সত্যায়ন ও মা'রিফাত তথা জানা-চেনার মাঝে পার্থক্য........ ৫২
দ্বিতীয় বিষয় : ওই সকল বিষয় বিশ্বাস করতে হবে, যা ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত........ ৫৩
অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও জরুরিয়াতে দ্বীনের সংখ্যার তালিকা........ ৫৫
জরুরি জ্ঞাতব্য........ ৫৭
'মূল ঈমান' বাড়েও না, কমেও না; তবে ঈমানের গুণগত অবস্থা বাড়ে-কমে........ ৫৮
ইসলামে প্রমাণিত সকল বিষয় ঈমানের জন্য শর্ত না হলেও বিশ্বাস করা ওয়াজিব........ ৫৯
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত জিহাদ কেন?........ ৬৩
তৃতীয় বিষয় : অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোর নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যা ও রূপ-পদ্ধতিসহ বিশ্বাস করতে হবে........ ৬৪
চতুর্থ বিষয় : মৌখিকভাবে সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি প্রদান........ ৭০
অন্তরের বিশ্বাস ছাড়া শুধু মুখে সাক্ষ্য দিলে বা দাবি করলেই ঈমানদার হওয়া যায় না........ ৭২
অন্তরের বিশ্বাস ও বক্তব্য-বিবৃতি এবং কলম দ্বারা আকুতি-সম্মতি প্রকাশ্য-গোপনে সর্বত্র একই হতে হবে........ ৭৩
শানে নুযুল........ ৭৫
অনেক বেশি আমলকারীও ঈমানবিহীন হতে পারে........ ৭৫
পঞ্চম বিষয় : আনুগত্য অবধারিত বা পালনীয় হিসেবে মেনে নেওয়া........ ৭৬
ষষ্ঠ বিষয় : ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য সকল ধর্ম-কর্ম, মতবাদ ও আদর্শ থেকে বিমুখতা ও সম্পর্কহীনতা আবশ্যকীয়........ ৭৯
ঈমানের জন্য উল্লিখিত বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত থাকা শর্ত কেন?........ ৮৪
সপ্তম বিষয় : শরীয়তের করণীয়-বর্জনীয় মতে আমল করা........ ৮৫
আমল ঈমানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত কি না........ ৮৫
হানাফীরা মুরজিয়া ও 'গুনইয়াতুত তালিবীন' প্রসঙ্গ........ ৮৮

CS CamScanner

আরকানে ঈমানের বিববরণ ... ৯৬
তাকলীদযুক্ত ঈমান গ্রহণযোগ্য কি না ... ৯৭
দ্বিতীয় প্রশ্ন : তাকলীদযুক্ত ঈমান আনলে মুকাল্লিদের ঈমান শুদ্ধ হবে কি না? ... ৯৯
বিশেষ জ্ঞাতব্য ... ১০১

তৃতীয় অধ্যায়
কুফরের পরিচয় ও ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

কুফরের পরিচয় ... ১০৪
একটা বিধানের ক্ষেত্রেও কুফর পাওয়া গেলে ঈমান থাকবে না ... ১০৫
নিরানব্বইটা কুফর ও একটা ঈমানের বিষয় থাকলে কি কাফের হবে না? ... ১০৯
'নাওয়াকিদুল ঈমান' / 'নাওয়াকিদুল ইসলাম' পরিচিতি, সংখ্যা ও কিতাব ... ১১২
'আলফাযুল কুফর' বা 'কুফরী উক্তি' তাকফীরের জন্য নয় ... ১১৪
বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির কবলে কুফর ও তাকফীর ... ১১৬
কুফর ও তাকফীরের মাঝে পার্থক্য ... ১২০
আহলে কিবলা কি কাফের হয় না? ... ১২২
গুনাহের কারণে আহলে কিবলাকে কাফের না বলার ব্যাখ্যা ... ১২৭
ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ আলোচনার উদ্দেশ্য ... ১২৮
ঈমান ভঙ্গ হয় বা কুফর প্রকাশ পায় তিন মাধ্যমে ... ১২৮
ঈমান ভঙ্গ হওয়ার মৌলিক কারণ ... ১২৮
মানুষ দুই ধরনের এবং কাফেরদের প্রকার ... ১২৯
কাফেরদের বিভিন্ন প্রকারের নাম পরিচিতি ... ১৩০
ঈমান ভঙ্গের প্রচলিত কতিপয় কারণ ও বিভিন্ন রূপ ... ১৩১
ঈমান ভঙ্গ হওয়ার প্রথম কারণ ... ১৩১
ব্যাখ্যা ... ১৩১
মুরতাদের বিধান ... ১৩১
ঈমান ভঙ্গ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ ... ১৩৩
ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণ ... ১৩৪
ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ ... ১৩৭
ঈমান ভঙ্গের পঞ্চম কারণ ... ১৩৭
ঈমান ভঙ্গের ষষ্ঠ কারণ ... ১৪০
শাতেম বিষয়ে বিধান ... ১৪০

CamScanner

শাতেমের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে কি না ১৪৫
জরুরি জ্ঞাতব্য ১৪৫
শাতেমের শাস্তির বিধান ১৪৬
ঈমান ভঙ্গের সপ্তম কারণ ১৪৯
ঈমান ভঙ্গের অষ্টম কারণ ১৫০
ঈমান ভঙ্গের নবম কারণ ১৫১
ঈমান ভঙ্গের দশম কারণ ১৫২
যান্দাকা ও যিন্দীকের পরিচয় ১৫৩
ঈমান ভঙ্গের এগারোতম কারণ ১৫৫
হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর রয়েছে : ১৫৮
মাযহাবের ইমামগণ কোনো হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বানান না ১৫৯
ঈমান ভঙ্গের বারোতম কারণ ১৬০
ঈমান ভঙ্গের তেরোতম কারণ ১৬১
ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম—এই বিশ্বাস রাখতে হবে ১৬৩
কাফেরকে কাফের মনে করার এবং ধর্মীয় পরিচিতি স্পষ্ট থাকার প্রয়োজনীয়তা ... ১৬৫
দুনিয়াতে কাফেরের কিছু প্রাপ্য ১৬৭
আলেমদের কি ফতোয়া দেওয়ার আইনগত অধিকার নেই? ১৬৮
মুসলিম-কাফের পরকালে আল্লাহ বিচার করবেন, এ নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না ১৬৯
মানুষ তিন স্তরে বিভক্ত ১৭০
একটি সংশয় নিরসন : ১৭১
'ওয়াহ্দাতুল আদইয়ান' ও 'হিওয়ারুল আদইয়ান' বা ইন্টারফেইথ তথা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ : বিধান ও সতর্কতা ১৭৪
প্রসঙ্গ : ধর্ম যার যার উৎসব সবার ১৭৭
একটি আপত্তি ও তার জবাব : ১৭৯
দারুল উলূম করাচির ফতোয়া, ... ১৮২
অমুসলিমদের খাবার বা হাদিয়া গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কে জরুরি মাসআলা ১৮৫
আল-ওয়ালা ওয়াল বারা : কারও সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদের বিধান ১৮৭
অমুসলিম ও কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ও আচরণের চার অবস্থা : ১৮৯
প্রথমটার ব্যাখ্যা : মুওয়ালাত তথা বন্ধুত্ব ১৮৯
দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা : মুদারাত তথা বাহ্যিক সদাচরণ ১৯১
তৃতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা : মুওয়াসাত তথা কল্যাণকামিতা ও উপকার সাধন ১৯২
চতুর্থ প্রকারের ব্যাখ্যা : মুআমালাত তথা লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ১৯৩

CamScanner

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করা ও গুপ্তচরবৃত্তি করা ঈমান ভঙ্গের কারণ কি না ১৯৫
হাতিব বিন আবী বালতাআ রাযি.-এর হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণের মতামত .. ১৯৯
প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমামগণের বক্তব্য ২০০
তাতারিদের সাথে যোগদানকারীদের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া ২০৬
ঈমান ভঙ্গের চৌদ্দতম কারণ ২০৭
কাফেরদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণের প্রকার ও বিধান ২০৭
আয়াতটির শানে নুযুল : ২০৯
দুনিয়াবি বিষয়ে কাফেরদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণ করার বিধান ২১০
কাফেরদের অনুকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ২১২
অন্যদের অনুকরণ ও বেশভূষা গ্রহণ করার ভয়াবহ ক্ষতি ২১৪
ঈমান ভঙ্গের পনেরোতম কারণ ২১৬
ঈমান ভঙ্গের ষোলোতম কারণ ২১৭
আহলে কুরআনের হাদীস-সুন্নাহ অস্বীকারের রহস্য ও জবাব ২২০
ঈমান ভঙ্গের সতেরোতম কারণ ২২৩
জিহাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি কোনোটাই কাম্য নয় ২২৩
ঈমান ভঙ্গের আঠারোতম কারণ ২২৬
কিসাস নিয়ে আলোচনা ২২৬
জরুরি জ্ঞাতব্য ২২৮
হদ নিয়ে আলোচনা ২২৯
কিসাস ও হদের মধ্যে পার্থক্য ২২৯
হদ পাঁচ প্রকার : ২৩০
তা'যীর সম্পর্কে আলোচনা ২৩১
ঈমান ভঙ্গের উনিশতম কারণ ২৩১
ঈমান ভঙ্গের বিশতম কারণ ২৩২
ঈমান ভঙ্গের একুশতম কারণ ২৩৪
ঈমান ভঙ্গের বাইশতম কারণ ২৩৯
সতর্কতা কাম্য ২৪১
ঈসা আ.-এর অবতরণ কি খতমে নবুওয়াত আকীদা-বিরোধী? ২৪১
ঈমান ভঙ্গের তেইশতম কারণ ২৪২
ঈমান ভঙ্গের চব্বিশতম কারণ ২৪৩
সেকুলারিজম কী ও কেন? ২৪৩
সেকুলারিজম কেন? ২৪৮

শাতেমের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে কি না ১৪৫
জরুরি জ্ঞাতব্য ১৪৫
শাতেমের শাস্তির বিধান ১৪৬
ঈমান ভঙ্গের সপ্তম কারণ ১৪৯
ঈমান ভঙ্গের অষ্টম কারণ ১৫০
ঈমান ভঙ্গের নবম কারণ ১৫১
ঈমান ভঙ্গের দশম কারণ ১৫২
যান্দাকা ও যিন্দীকের পরিচয় ১৫৩
ঈমান ভঙ্গের এগারোতম কারণ ১৫৫
হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর রয়েছে : ১৫৮
মাযহাবের ইমামগণ কোনো হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বানান না ১৫৯
ঈমান ভঙ্গের বারোতম কারণ ১৬০
ঈমান ভঙ্গের তেরোতম কারণ ১৬১
ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম—এই বিশ্বাস রাখতে হবে ১৬৩
কাফেরকে কাফের মনে করার এবং ধর্মীয় পরিচিতি স্পষ্ট থাকার প্রয়োজনীয়তা ১৬৫
দুনিয়াতে কাফেরের কিছু প্রাপ্য ১৬৭
আলেমদের কি ফতোয়া দেওয়ার আইনগত অধিকার নেই? ১৬৮
মুসলিম-কাফের পরকালে আল্লাহ বিচার করবেন, এ নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না ১৬৯
মানুষ তিন স্তরে বিভক্ত ১৭০
একটি সংশয় নিরসন : ১৭১
'ওয়াহদাতুল আদইয়ান' ও 'হিওয়ারুল আদইয়ান' বা ইন্টারফেইথ তথা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ : বিধান ও সতর্কতা ১৭৪
প্রসঙ্গ : ধর্ম যার যার উৎসব সবার ১৭৭
একটি আপত্তি ও তার জবাব : ১৭৯
দারুল উলূম করাচির ফতোয়া, ... ১৮২
অমুসলিমদের খাবার বা হাদিয়া গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কে জরুরি মাসআলা ১৮৫
আল-ওয়ালা ওয়াল বারা : কারও সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদের বিধান ১৮৭
অমুসলিম ও কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ও আচরণের চার অবস্থা : ১৮৯
প্রথমটার ব্যাখ্যা : মুওয়ালাত তথা বন্ধুত্ব ১৮৯
দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা : মুদারাত তথা বাহ্যিক সদাচরণ ১৯১
তৃতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা : মুওয়াসাত তথা কল্যাণকামিতা ও উপকার সাধন ১৯২
চতুর্থ প্রকারের ব্যাখ্যা : মুআমালাত তথা লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ১৯৩

CS CamScanner

ঈমান ও আকীদা পরিচিতি

মুসলিমদের ধর্ম-বিশ্বাস বোঝাতে কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফে শুধু 'ঈমান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'আকীদা' বা অন্য কোনো শব্দ কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত হয়নি। তবে হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে মুসলিমদের 'ধর্ম-বিশ্বাস' বোঝাতে আরও কিছু শব্দ ও পরিভাষা পরিচিতি লাভ করে। যেমন : 'আল-ফিকহুল আকবার', 'আস-সুন্নাহ', 'আশ-শরীয়াহ', 'উসূলিদ্দিয়ানাহ', 'উসূলুদ্দীন', 'আত-তাওহীদ', 'আল-আকীদাহ' ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে 'আকীদা' পরিভাষাটি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। এমনকি পরবর্তী যুগে এটিই একমাত্র পরিভাষায় পরিণত হয়।

সুতরাং 'আকীদা' শব্দটি কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত না হলেও দ্বিতীয় শতক থেকে সালাফ ও ইমামগণ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। ইমাম তাহাবী রাহ. (২২৯-৩২১ হিজরী) তাঁর বিখ্যাত আকীদার কিতাবটির শুরুতে 'আকীদা' শব্দটি উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর বিখ্যাত এ গ্রন্থটিও 'আকীদাহ তহাবিয়্যাহ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

তবে অনেক সময় 'ঈমান' ও 'আকীদা' শব্দদ্বয়ের মাঝে এভাবে ফরক করা হয় যে, ঈমান হলো মূল ও আসল, আর আকীদা-বিশ্বাস হলো তার উপাদান। অর্থাৎ আল্লাহ এক, নবী-রাসূল সত্য, আখিরাত সত্য ইত্যাদি আকীদা-বিশ্বাসের সমষ্টিতে 'ঈমান' জন্মলাভ করে। এ ক্ষেত্রে আকীদা-বিশ্বাস যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে 'ঈমান' বিশুদ্ধ হবে না। কাজেই বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য পরিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস থাকতে হবে।

'আকীদা' বা 'ই'তিকাদ' শব্দের অর্থ হলো, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা, দৃঢ়করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। আর ধর্ম-বিশ্বাস দ্বারা যেহেতু মানুষ তার ধর্মের সাথে সন্দেহমুক্ত ও দৃঢ় চুক্তি করে এবং শক্ত

CamScanner

ও দৃঢ়ভাবে বন্ধন সৃষ্টি করে, তাই এটিকে 'আকীদা' বা 'ই'তিকাদ' বলা হয়। প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমদ ফাইউমী রাহ. (মৃ. ৭৭০ হি.) লেখেন,

الْعَقِيدَةُ: مَا يَدِينُ الْإِنْسَانُ بِهِ، وَلَهُ عَقِيدَةٌ حَسَنَةٌ سَالِمَةٌ مِنَ الشَّكِّ.

"মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে 'আকীদা' বলা হয়। (যেমন আরবীতে বলা হয়,) তার সন্দেহমুক্ত ভালো আকীদা-বিশ্বাস আছে।"[১]

১. আল-মিসবাহুল মুনীর, ২/৪২১

প্রথম অধ্যায়
ঈমান-আকীদার গুরুত্ব ও কুফর-শিরকের পরিণতি

ঈমান-আকীদার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার ওপর প্রথম ফরজ ও প্রধান হক হলো, ঈমান আনা ও আকীদা পরিশুদ্ধ করা। তাই ইসলামের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হলো ঈমান-আকীদা। যার ওপর নির্ভর করে নামাজ, রোযা, হজ ও যাকাতসহ শরীয়তের সকল আমলের গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রতিদান পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা। বিশাল দালান দাঁড়ানোর জন্য যেমন ফাউন্ডেশন আবশ্যক, তেমনই নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য ঈমান প্রয়োজনীয়।

ঈমান-আকীদার দৃষ্টান্ত হলো ১, ২ সংখ্যার মতো, আর আমল হলো শূন্যের মতো। যদি ১, ২ সংখ্যা ছাড়া হাজারো শূন্য লেখা হয়, তাহলে দুনিয়াতে এর কোনো মূল্য নেই। অনুরূপ সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমান-আকীদা পোষণ না করে যদি হাজারো আমল করা হয়, তাহলে আখিরাতে এর কোনো মূল্য নেই।

এ জন্য বিভিন্ন আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তাআলা আমলের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিদানের জন্য ঈমানকে পূর্বশর্ত বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ নেক আমল করবে, যদি সে ঈমানদার হয়, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী অবশ্যই প্রতিদান প্রদান করব।'[১]

এ আয়াতসহ আরও অনেক আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়, নেক আমলের পূর্বশর্ত হলো ঈমান। তাই নিম্নোক্ত হাদীসেও সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, নামাজ ইত্যাদি আমলের

---

১. সূরা নাহল, (১৬) : ৯৭; আরও দেখুন, সূরা নিসা, (৪) : ১২৪; সূরা নাহল, (১৬) : ৯৭

CamScanner

পূর্বে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো ঈমান আনা ও আকীদা ঠিক করা।

প্রথম ও প্রধান কাজ ঈমান আনা ও আকীদা ঠিক করা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا ﷺ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ: فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ...». وفي رواية: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى».

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রাযি.-কে ইয়ামান অভিমুখে (শাসকরূপে) প্রেরণকালে বলেন, সেখানের অধিবাসীদের "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল"—এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দেবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।'[২]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'তুমি (মুআয রাযি.) আহলে কিতাবদের এক কওমের কাছে চলেছ। অতএব তাদের প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত হবে, তারা যেন তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়।'[৩]

হাদীসে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, নামাজ ইত্যাদি আমলের পূর্বে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো, ঈমান আনা ও আকীদা ঠিক করা।

এভাবে কুরআনে কারীম সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; **বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ, কিয়ামত-দিবস, সকল ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের ওপর।**

আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির,

---

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯
৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৭২

CamScanner

ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্য। এবং যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং যারা কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণে যত্নবান থাকে, অর্থ-সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণ করে। এরাই তারা যারা সাচ্চা (নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত) এবং এরাই মুত্তাকী।'[৪]

ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি : ১. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল—এ কথার সাক্ষ্যদান, ২. নামাজ কায়েম করা, ৩. যাকাত দেওয়া, ৪. হজ করা এবং ৫. রমজানে রোযা রাখা।'[৫]

আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্য হচ্ছে, নামাজ-রোযা, হজ-যাকাত প্রভৃতি আমলের পূর্বে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো, ঈমান আনা ও আকীদা ঠিক করা। এ কারণেই ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের প্রধান হচ্ছে, ঈমান-আকীদা।

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম সবকিছুর আগে ঈমান-আকীদা শিখেছেন। হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ، فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا.

'আমরা কিশোররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে কুরআন শেখার আগে ঈমান (যা জানা জরুরি) শিখেছি। অতঃপর কুরআন (অর্থসহ) শিখেছি। তখন আমাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।'[৬]

তাবারানীর বর্ণনার শেষাংশে এসেছে,

فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الإِيمَانِ.

'আজ তোমরা ঈমান শেখার আগে কুরআন শিখছ।'[৭]

আফসোস, মুসলিম উম্মাহ আজ সবকিছু শিখছে, কেবল ঈমানটাই শিখছে না!

---

৪. সূরা বাকারা, (২) : ১৭৭

৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৬১, সনদ সহীহ

৭. আল-মু'জামুল কাবীর, তাবারানী, হাদীস নং ১৬৭৮; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদীস নং ৫০

ঈমান-আকীদা ঠিক করা সর্বোত্তম আমল

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ.

'আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "কোন আমলটি উত্তম?" তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনা।"'[৮]

সুতরাং ঈমান-আকীদার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং হালাল-হারামের মাসআলা জানার আগে আকীদা জানা আবশ্যক।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন,

اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير.

'দ্বীন ও আকীদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন বিধি-বিধান ও হালাল-হারামের জ্ঞান অর্জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর বিপুল পরিমাণ ইলম অর্জনের চেয়ে স্রেফ কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, সেটুকু ইলম অর্জন করা বহু উত্তম।'

ইমাম আবু হানীফাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম ফিকহ (জ্ঞানশাস্ত্র) কোনটি? তিনি বললেন,

أن يتعلم الرجل الإيمان بالله تعالى والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأمة.

'ঈমান শেখা, শরীয়ত, সুন্নাত, হদ-কিসাস ও উম্মাহর ইমামদের মতামত ইত্যাদি জানা।'[৯]

ঈমান-আকীদার গুরুত্ব বোঝাতে এবং আমলের চেয়ে এর শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট করতে ইমাম আযম রাহ. একটি প্রায়োগিক উদাহরণ দিয়ে বলেন,

واعلم أن العمل تبع للعلم كما أن الأعضاء تبع للبصر، والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير، ومثل ذلك الزاد القليل الذي لا بد منه في المفازة مع الهداية بها أنفع من الجهالة مع الزاد الكثير، ولذلك قال الله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

'জেনে রাখো, শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন চোখের অনুকরণ করে, একইভাবে আমলও ইলমের অনুসরণ করে। কাজেই অজ্ঞতা নিয়ে অনেক আমলের পরিবর্তে ইলমের সাথে সামান্য আমলও অধিক উপকারী। এর উদাহরণ হলো, পথ চিনে স্বল্প

---

৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬

৯. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি আবু মুতী' বলখী (প্রচলিত আল-ফিকহুল আবসাত), আকীদা নং ৯-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৯৬, মাকতাবাতুল গানিম; আল-উসূলুল মুনীফাহ, বায়াযী ৫১-৫২, দারুস সালিহ

CamScanner

পাথেয় নিয়ে মরুভূমিতে সফর করার উপকারিতা, পথ না চিনে প্রচুর পাথেয় ও রসদ নিয়ে সফর করার চেয়ে অনেক বেশি। এ কারণেই ইরশাদ হয়েছে, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কখনো সমান হতে পারে না।'[১০]

আল্লামা আবু ইসহাক সাফফার বুখারী রাহ. (মৃ. ৫৩৪ হি.) বলেন,

وأولى العلوم العلم بالله عزّ وجلّ... وكان علم أصول الدين بالدليل المؤدي لليقين كنز العلوم ومعدنها ومثمر كل فائدة في الدين والدنيا والآخرة، ومن حرم هذا العلم كان مقصّرا في تحقيق معاني سائر العلوم في الفروع؛ إذ علم الفرع لا يتم إلا بعد علم الأصل، وروي عن ابن عمر أنّه قال: «كنّا نتعلم التوحيد قبل أن نتعلم القرآن، وأنتم الآن تتعلمون القرآن ثم تتعلمون التوحيد»...

ولقد ذكر أهل التفسير أنّ عدد آي القرآن ستة آلاف ومئتان وستة وثلاثون، وأنّ الأحكاميّة منها: نيف وخمسمائة، والباقي في أدلة التوحيد والأمثال والعبر والقصص والمواعظ، ومناظرات الكفار مع الرسل والأنبياء وحجاج الرسل معهم، حتى بلغوا بهم إلى أن بهتوا. فلمّا كان ذكر هذا الباب أكثر من أبواب الأحكامية: كان دليلا على أنّ هذا الباب أهم فيكون أفضل والله الموفق... فيجب تعلّم هذا العلم.. تحصينا لدينه عن اعتراض الشّبه المضلة، ولمعرفة الخروج عنها لو اعترضت، وحذار عن اعتقاد باطل عند الاستفصال أو عند الاستنصاف عن معرفة الله.

'আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান।... আকীদা ও দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান হলো সকল জ্ঞানের আধার ও ভান্ডার, দ্বীন-দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। যে ব্যক্তি এই ইলম থেকে বঞ্চিত হলো, সে অন্য শাখাগত সব ইলম থেকেই বঞ্চিত। কারণ, মৌলিকের ইলম ছাড়া শাখা-প্রশাখার ইলম হতে পারে না। ইবনে উমর রাযি. বলেন, "আমরা কুরআন শেখার আগে তাওহীদ শিখতাম। আর তোমরা এখন আগে কুরআন শেখো, এরপর তাওহীদ শেখো।"...

তাফসীরবিদদের মতে কুরআনের আয়াত-সংখ্যা ছয় হাজার দুইশ ছত্রিশটি। এর মাঝে আহকাম তথা হালাল-হারাম সম্পর্কিত আয়াত পাঁচশর বেশি। বাকি সবগুলো তাওহীদ, শিক্ষণীয় ঘটনা, কাফেরদের বিরুদ্ধে নবী-রাসূলদের ঈমানী সংগ্রাম ও মুনাযারা-বিতর্ক ঘিরে। এর দ্বারা বোঝা যায়, তাওহীদের ইলমই সর্বোত্তম ইলম।

তা ছাড়া নিজের দ্বীন রক্ষা ও বিভ্রান্তি-বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্যও এই ইলম অর্জন করা আবশ্যক।'[১১]

তাই ঈমান-আকীদার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং শৈশব থেকেই এর শিক্ষাদান শুরু করতে হবে।

---

১০. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম-এর সূত্রে মাজমূউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৫২; সূরা যুমার (৩৯) : ৯

১১. তালখীসুল আদিল্লাহ লি-কাওয়ায়িদিত তাওহীদ, সাফফার বুখারী, পৃষ্ঠা ১২৬-২৮

CS CamScanner

ইমাম গাযালী রাহ. 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' কিতাবে এবং ইবনে খালদুন রাহ. (মৃ. ৮০৮ হি.) তাঁর 'মুকাদ্দিমা'-তে বাচ্চাদের আকীদা ও কুরআন শেখানোর গুরুত্ব নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। আর আজ থেকে প্রায় ১১০০ বছর আগে ইমাম ইবনে আবী যায়দ কাইরাওয়ানী মালেকী রাহ. (মৃ. ৩৮৬ হি.) 'আর-রিসালা' কিতাবের শুরুতে বাচ্চাদের শেখানোর জন্য আকীদা লিখে গিয়েছেন।[১২]

ইমাম গাযালী রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) বলেন, 'আকীদা-সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি (প্রথম পরিচ্ছেদে), তা বাচ্চাদের শুরুতেই শিখিয়ে দেওয়া উচিত; যাতে সে এগুলো মুখস্থ করে নেয়। অতঃপর সে বড় হলে এগুলোর অর্থ একটু একটু করে বুঝবে। কাজেই প্রথমে মুখস্থ করবে, এরপর বুঝবে, অতঃপর বিশ্বাস ও সত্যায়ন করবে। কেননা, বাচ্চাদের কোনো প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস অর্জিত হয়।

মানুষের হৃদয়ের ওপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ হলো, তিনি শৈশবেই কোনো দলীল-প্রমাণ ছাড়াই বক্ষকে ঈমানের জন্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন।

আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ মানুষের আকীদা-শিক্ষার সূচনা হয় শোনা ও অনুসরণের মাধ্যমে। তবে যে আকীদা এভাবে অর্জিত হয়, তাতে দুর্বলতা থাকে। তাই কেউ যদি উক্ত আকীদার পরিপন্থী কিছু তার অন্তরে ঢেলে দেয়, তাহলে পূর্বের আকীদা দূর হয়ে যায়। এ জন্য বাচ্চা ও সাধারণ মানুষের অন্তরে আকীদাসমূহ ভালো করে গেঁথে দিতে হবে, যেন এগুলো দৃঢ়ভাবে বসে যায়।'

তিনি আরও বলেন, 'মজবুত ও দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেওয়ার অর্থ এ নয় যে, তাকে কালাম ও তর্কবিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে; বরং এর পদ্ধতি হলো, তাকে কুরআন তিলাওয়াত, তাফসীর ও হাদীস পড়া এবং এর মর্মার্থ বোঝার মাঝে ব্যস্ত রাখতে হবে। ইবাদত ও ওযীফা আদায়ে মশগুল রাখা। ফলে তার আকীদা-বিশ্বাস প্রতিনিয়ত দৃঢ় হতে থাকবে। কারণ, কুরআনে কারীমের প্রমাণসমূহ তার কানে পৌঁছাবে এবং এ সম্পর্কে হাদীসসমূহে প্রমাণ ও উপকারিতা দেখবে, ইবাদতের নূরে নূরান্বিত হবে এবং আল্লাহওয়ালাদের মজলিসে গমন ও তাঁদের সঙ্গে ওঠাবসার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে তাঁদের খুশু-খুযু, ভয় ও প্রশান্তি প্রত্যক্ষ করবে।

অতএব শৈশবে আকীদা শিক্ষাদান হলো অন্তরে বীজ বপনের ন্যায়। আর আলোচ্য বিষয়গুলো হলো পানি সিঞ্চন ও পরিচর্যার মতো। একপর্যায়ে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং

---

১২. কায়রাওয়ানী রাহ.-এর বন্ধু শায়খ আবু মাহফুয মুহরায ইবনে খালাফ মকতবের মুনশি ছিলেন। তার অনুরোধে ইমাম কায়রাওয়ানী রাহ. মকতবের শিশুদের ফরজ ইলম শেখানোর জন্য 'আর-রিসালা' কিতাবটি রচনা করেন। কিতাবের শুরুতে তিনি ইসলামী আকীদাগুলো উল্লেখ করেন। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. 'আর-রিসালা' থেকে আকীদা অংশটুকু আলাদাভাবে ছাপেন, যার নাম তিনি রেখেছেন,

العَقِيدَةُ الإِسْلَامِيَّةُ الَّتِي يَنْشَأُ عَلَيْهَا الصِّغَارُ

ইতিহাসে এমন অনেক কিতাবের নাম পাওয়া যাবে, যেগুলো মকতবে আকীদা শেখানোর উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে।

বৃক্ষ তরতর করে বাড়তে থাকে। এমন উৎকৃষ্ট ও মজবুত বৃক্ষে পরিণত হয় যে, এর শিকড় থাকে অনেক গভীরে এবং কাণ্ড পৌঁছে যায় আকাশে।'

কিছুদূর এগিয়ে বলেন,

ثم الصبي إذا وقع نَشْؤُه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم ينفتح له غيرها، ويَسلم في الآخرة باعتقاد أهل الحق.

'বাচ্চা (সঠিক) আকীদা-বিশ্বাসের ওপর বেড়ে ওঠার পর সে দুনিয়াদারীতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও ভিন্ন আকীদায় প্রভাবিত হবে না এবং আহলে হকের আকীদার কারণে আখিরাতে নিরাপদ থাকবে।'[১৩]

ঈমান-আকীদা সংরক্ষণ ফরজ

মুমিন হওয়ার পর ঈমান-আকীদা হেফাজত করা ফরজ এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস, কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরি। কারণ, অনেক বেশি আমলকারীও ঈমানবিহীন হতে পারে। হযরত আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ... يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

'আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ ও রোযা তোমাদের চেয়ে ভালো ও বেশি হবে। (কিন্তু) তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যায়।'[১৪]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাযি. বলেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" ٣٠٩٩٢، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٨٣٦٥، والحاكم ٨٣٦٥

---

১৩. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/৯৪; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ২/৬৪-৬৮

১৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৬৬; আরও দেখুন, ইকফারুল মুলহিদীন, কাশ্মীরী, পৃষ্ঠা ৫২; তালীফাতে উসমানী, শাব্বীর আহমদ উসমানী, পৃষ্ঠা ৫২৩

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: کہا گیا ہے کہ قادیانی بڑے نمازی ہیں، قرآن بہت پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوۃ دیتے ہیں، اگر اس پر بھی وہ مسلمان نہیں تو بڑی حسرت اور حیرت کا مقام ہے؟!
میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی ہی بد بخت قوم کا تذکرہ نبی کریم ﷺ نے صحیحین کی احادیث میں فرمایا ہے جو قرآن کی تلاوت بھی کرے گی اور بظاہر سچے مسلمانوں سے بھی زیادہ نمازیں پڑھے گی، اور روزے رکھے گی، مگر ان کا قرآن انکے حلقوم (حلق) سے آگے نہ بڑھے گا اور اسلام سے ایسی ہی نکل چکی ہو گی جیسے تیر شکار کا جسم چھید کر صاف نکل جاتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اگر میں نے ان کو پایا تو عاد وثمود کی طرح ان کو قتل کروں گا، حق تعالی شانہ اپنی پناہ میں رکھے اور اس دنیا سے ایمان پر اٹھالے کہ یہ مقام بڑے خوف وعبرت کا ہے۔ (الشہاب الرجم الخاطف المرتاب ٨١، تفضۂ تالیفات عثمانی)

وصَحّحه على شرط الشَّيْخَيْن، ولم يتعقبه الذهبي. وقال الطحاوي: وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ.

'এমন এক সময় আসবে, যখন লোকেরা একত্রিত হয়ে মসজিদে নামাজ আদায় করবে, অথচ তাদের মাঝে কেউ মুমিন থাকবে না!'

আরও ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

'সকালের মুমিন সন্ধ্যায় ঈমানহারা কিংবা সন্ধ্যার ঈমানদার সকালে ঈমানছাড়া। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থে নিজের দ্বীনকে ছেড়ে দেবে।'[১৫]

এ জন্য প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ইবনে আবিদীন শামী রাহ. (মৃ. ১২৫২ হি.) কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা একজন মুমিনের জন্য ফরজে আইন—এর তালিকায় ইউসুফ রূমীর (মৃ. ৯৮৬ হি.) 'তাবয়ীনুল মাহারিম' কিতাব থেকে উল্লেখ করে বলেন,

لَا شَكَّ فِي فَرْضِيَّةِ ...عِلْمِ الْأَلْفَاظِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْمُكَفِّرَةِ، وَلَعَمْرِي هَذَا مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ فِي هَذَا الزَّمَانِ؛ لِأَنَّكَ تَسْمَعُ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَّامِ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا يُكَفِّرُ، وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ.

'হারাম ও কুফরী শব্দ (তথা কোন কথা বা কাজ করলে ঈমান চলে যায়—এ) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। কসম—বর্তমান সময়ে যে সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য—তন্মধ্যে এটি অন্যতম। কারণ, অনেক মানুষ কুফরী কথা বলে, যা তাকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। অথচ এ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন!'

অতঃপর এর ভয়াবহতা বোঝাতে গিয়ে এমনও বলেছেন,

وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُجَدِّدَ الْجَاهِلُ إِيمَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ، وَيُجَدِّدَ نِكَاحَ امْرَأَتِهِ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، إِذِ الْخَطَأُ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ مِنَ النِّسَاءِ كَثِيرٌ.

'সতর্কতা হলো, সাধারণ ব্যক্তি (ও অনভিজ্ঞ আলেম) প্রতিদিন তার ঈমানকে নবায়ন করবে এবং প্রতি মাসে এক-দুবার দুজন সাক্ষীর সামনে বিবাহকে নবায়ন করবে। কেননা, পুরুষরা যদিও কিছুটা সতর্ক থাকে, কিন্তু মহিলাদের থেকে কুফরী কথা খুব বেশি পরিমাণ বের হয়।'[১৬]

এই ফরজের প্রতি আমরা চরম উদাসীন এবং এটি আমাদের মাঝে অবহেলিত 'ফরজে আইন'। এ বিষয়ে আমরা ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবসমূহে শুধু 'মুরতাদ' অধ্যায়

---

১৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮

১৬. ফাতাওয়া শামী, ১/১৩৯-৪০, ড. হুসামুদ্দীন ফারফুরের নুসখা। তবে যতটুকু মনে হচ্ছে, এটা ফতোয়া হিসেবে নয়; বরং সতর্কতামূলক কথা।

CamScanner

দেখলে এর গুরুত্ব বুঝে আসবে। সহজে দেখতে চাইলে বদরুর রশীদ হানাফীর (মৃ. ৭৬৮ হি.) 'আলফাযুল কুফর' ও মোল্লা আলী কারী (মৃ. ১০১৪ হি.) রাহ.-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে চোখ বুলাতে পারি এবং ইবনে হাজার হাইতামী শাফেয়ীর (মৃ. ৯৭৪ হি.) 'আল-ই'লাম বি-কাওয়াতিয়িল ইসলাম' পড়তে পারি।

আর সাধারণরা শুধু কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রাহ.-এর 'মালাবুদ্দা মিনহু' (দশম অধ্যায়, কুফরী কালাম অধ্যায়ের আলোচনা, পৃষ্ঠা ২৪৭-২৭০, মাওলানা আনোয়ার হুসাইনের অনুবাদ) পড়ে নিতে পারি।[১৭]

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) আজ থেকে ৮০ বছর পূর্বে আধুনিক শিক্ষার কারণে ঈমান হারানোর মতো ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরে মানুষকে সতর্ক করে লেখেন,

اس زمانہ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لڑکا مسلمان ہے یا کافر۔

اب وہ زمانہ ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ داماد صاحب مسلمان ہیں یا کافر بجائے اس کے کہ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ نیکو کار ہے یا بدکار کیونکہ مسلمان عورت سے نکاح کے واسطے شرط ہے مسلمان ہونا۔

'এই যুগে পাত্রের ঈমান-কুফরের বিষয়েও খোঁজ নেওয়া জরুরি। বর্তমানে এমন এক সময় চলছে যে, (বিয়ে-শাদীতে) হবু বর দ্বীনদার নাকি বদকার তা দেখার আগে, বরং সে ইসলামের গণ্ডির ভেতরে আছে কি নেই, সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ, মুসলমান কনের সাথে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছেলের ঈমান থাকা শর্ত।'

অতঃপর থানভী রাহ. বলেন,

مسلمان عورت اور کافر مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ آج کل جن لڑکوں کو بیٹیاں دی جاتی ہیں بعض لوگ ان میں سے جدید تعلیم کے اثر سے ایسے آزاد منش ہیں کہ ان کو دین ایمان سے کچھ بھی تعلق نہیں رہا۔ (صرف نام کے مسلمان ہیں) زبان سے کلمات کفر بک جاتے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں کرتے اور پھر ان ہی سے ایک مسلمان لڑکی کا نکاح پڑھوایا جاتا ہے۔ اور سب گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ ایک مسنون طریقہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سنت کے لیے موقوف علیہ (شرط) ہے ایمان، افسوس کہ نوشہ صاحب جانے کتنی دفعہ اس سے خارج ہو چکے ہیں۔

'মুসলিম নারী ও কুফরে লিপ্ত পুরুষের মাঝে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে যাদের হাতে কন্যা সোপর্দ করা হচ্ছে, সেসব পাত্রের একটি অংশের আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে দ্বীন ও ঈমানের সাথে কোনো রকম সম্পর্কই অবশিষ্ট নেই (শুধু নামেই তারা মুসলমান রয়ে গেছে)।

---

১৭. যদিও সবগুলোই ঈমান ভঙ্গের কারণ হওয়া নিয়ে কথা রয়েছে। তবে সতর্কতামূলক বেঁচে থাকা চাই।

CamScanner

এদের মুখ দিয়ে কুফরী কথাবার্তা বের হয় এবং ধর্মীয় বিষয়াদিকে এরা বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না। অথচ এরপরও এমন ছেলের সাথেই মুসলিম নারীদের বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে!

এদিকে পরিবারের লোকজন বিয়ের 'সুন্নাত' পালন করতে পেরে খুশি প্রকাশ করছে। অথচ এই বৈবাহিক সুন্নাতের শুদ্ধতা নির্ভর করে ঈমানের শুদ্ধতার ওপর। অথচ যার সাথে বিয়ে পড়ানো হচ্ছে, সেই পাত্র কতবার ঈমান ভেঙে ইসলাম থেকে খারেজ হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।'[১৮]

বলাবাহুল্য, এখানে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বরের কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় মেয়ের খবর নেওয়াও জরুরি।

এভাবে প্রায় ১০০ বছর পূর্বে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ.-ও (মৃ. ১৩৫৩ হি.) আরও ভয়ংকর কথা বলেছেন, যার বাস্তবতা এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তিনি বলতেন,

آج کل کے جو نو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو ہم اس بنا پر مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا کفر معلوم نہیں۔

'বর্তমান নবীন জেনারেল শিক্ষিতদের (অন্তরে লুক্কায়িত আকীদাগত) কুফর আমাদের জানা না থাকার (ও তা প্রকাশিত না হওয়ার) কারণে আমরা তাদেরকে মুসলমান বলি!'[১৯]

মনে রাখতে হবে, ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় আর ঈমান একত্র হতে পারে না। যেভাবে ওযু-নামাজ ভঙ্গের কারণ পাওয়া যাওয়া আর ওযু-নামাজ ঠিক থাকা একসাথে হতে পারে না। কিন্তু আমরা ওযু-নামাজেরটা বুঝি, ঈমানেরটা বুঝি না। ফলে ওযু-নামাজের বিষয়ে যতটা সচেষ্ট থাকি, ঈমান-আকীদার বিষয়ে ততই অবহেলা করি!

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমরা ওযু ভঙ্গের কারণ শিখি, অনেকেই নামাজ নষ্ট হওয়ার কারণও জানি। কিন্তু ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় শিখি না, কোন কথা বললে, কী কাজ করলে, কেমন বিশ্বাস রাখলে ঈমান চলে যায়, তা জানি না এবং জানার চেষ্টাও করি না।

এভাবে আমাদের মাহফিল ও সম্মেলনগুলোতে ঈমান-আকীদার বিষয়বস্তু গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং জুমআর দিন মিম্বার থেকেও এ সম্পর্কে আওয়াজ যথাযথ পর্যায়ে উচ্চারিত হয় না বা হতে দেওয়া হয় না। এ ছাড়া রচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধেও এ-জাতীয় আলোচনা কমই চোখে পড়ে কিংবা খুব কম গুরুত্ব পায়। যার ভয়াবহ পরিণতি আজ

১৮. ইসলামী শাদী, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯
১৯. এ কথা মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ তাঁর পিতা মুফতী শফী রাহ.-এর কাছে নকল করতে শুনেছেন। দ্র. আল-বালাগ, নভেম্বর ২০২২ সংখ্যা

CamScanner

আমরা প্রত্যক্ষ করছি। বর্তমানে এর চিত্র একেবারেই সুস্পষ্ট। এমনকি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী ও তাহাজ্জুদ আদায়ের দাবিকারীর আচরণ-উচ্চারণেও এমন কিছু প্রকাশ পাচ্ছে, যা সর্বসম্মত আকীদা-বিরোধী ও সরাসরি ঈমান বিনষ্টকারী।

এই চিত্র পরিবর্তন করার দায়িত্ব আমাদের; নতুবা এই দেশে নামে মুসলমান ঠিকই থাকবে, নামাজ, তাহাজ্জুদ ও কুরআন তিলাওয়াতকারীও পাওয়া যাবে, মসজিদ-মাদরাসা ও মাহফিলে দান করার জন্য অনেকেই এগিয়ে আসবে, এমনকি মাদরাসা-খানকায় ধরনা দেওয়া এমপি-মন্ত্রীরও দেখা মিলবে, কিন্তু তাদের ভেতর ঈমান থাকবে না।

কোনো ভালো কাজই ঈমানের সমতুল্য হতে পারে না

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ

'তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে সেই ব্যক্তির (কার্যাবলির) সমান মনে করো, যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে? আল্লাহর কাছে এরা সমতুল্য নয়।'[২০]

শানে নুযুল

মক্কার অনেক মুশরিক গর্ব সহকারে মুসলমানদের বলত, মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর ওপর অন্য কারও আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত আব্বাস রাযি. যখন বদর যুদ্ধে বন্দি হন এবং তাঁর মুসলিম-আত্মীয়রা তাকে বাতিল ধর্মে বহাল থাকায় বিদ্রুপের সঙ্গে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত হতে বঞ্চিত রয়েছেন?

উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা ঈমান ও হিজরতকে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করেছ। কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল হারামের হেফাজত ও হাজীদের পানি সরবরাহের কাজ করে থাকি, তাই আমাদের সমান অন্য কারও আমল হতে পারে না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়।[২১]

এ আয়াতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত নেক কাজ সম-মর্যাদার হয় না।

---

২০. সূরা তাওবা, (৯) : ১৯

২১. তাফসীর ইবনে কাসীর

কোনো ব্যক্তি যদি ফরজ কাজসমূহ আদায় না করে নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকে, তবে এটা কোনো নেক কাজ হিসেবেই গণ্য হবে না। নিশ্চয়ই হাজীদেরকে পানি পান করানো একটি মহৎ কাজ, কিন্তু মর্যাদা হিসেবে তা নফলই। অনুরূপ মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধানও অবস্থাভেদে ফরজে কিফায়া কিংবা একটি নফল ইবাদত।

পক্ষান্তরে ঈমান তো মানুষের মুক্তির জন্য বুনিয়াদি শর্ত। আর জিহাদ কখনো ফরজে আইন এবং কখনো ফরজে কিফায়া। প্রথমোক্ত কাজ দুটির তুলনায় এ দুটোর মর্যাদা অনেক ওপরে। সুতরাং ঈমান ব্যতিরেকে কেবল এ-জাতীয় সেবার কারণে কেউ কোনো মুমিনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না।[২২]

কাজেই রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের-দশের সেবা করলেও ঈমান ব্যতিরেকে কেবল এ-জাতীয় সেবার কারণে কোনো মুমিনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না। এবং ঈমান বিধ্বংসী কার্যকলাপ, হারাম কাজ ও উপার্জন থেকে দূরে না থেকে বেশি নফল ইবাদতকারী ও তাহাজ্জুদগুযারী কখনো হারাম ও ফরজ কাজসমূহের প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারী মুমিনের সমতুল্য হতে পারে না।

আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য ঈমান-আকীদা ঠিক থাকা শর্ত

আমাদের সমাজে হয়তো নামে মুসলমান কেউ কেউ নামাজ-হজ ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি পালন করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন আয়াতে কারীমায় আমলের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিদানের জন্য ঈমান-আকীদা ঠিক থাকা পূর্বশর্ত বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

'পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে কেউ নেক আমল করলে, (শর্ত হলো) যদি ঈমানদার হয়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।'[২৩]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

'যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে এবং সেই জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, (শর্ত হলো) যদি সে মুমিন হয়, তবে এরূপ চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।'[২৪]

২২. দ্র. তাওযীহুল কুরআন, তাকী উসমানী, ১/৫২৮
২৩. সূরা নিসা, (৪) : ১২৪; আরও দেখুন, সূরা নাহল, (১৬) : ৯৭
২৪. সূরা বনী ইসরাঈল, (১৭) : ১৯

CamScanner

এ আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, সমস্ত আমলের রূহ ও ভিত্তি হলো ঈমান-আকীদা ঠিক থাকা।

ঈমান ছাড়া আমলের কোনো প্রতিদান নেই আখিরাতে

ঈমানবিহীন একজন মানুষের ভালো আমলের উদাহরণ হলো, রূহবিহীন শরীরের মতো। দুনিয়াতে যেমন রূহবিহীন শরীরের কোনো মূল্য নেই, তদ্রূপ ঈমান-আকীদার বিশুদ্ধতা ছাড়া আখিরাতে ভালো কাজ ও আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিদান নেই।

তাই কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমান ছাড়া আখিরাতে আমলের কোনো প্রতিদান নেই; বরং বিভিন্ন উপমা ও উদাহরণ টেনে বিষয়টি সূর্যের আলোর ন্যায় পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

'তারা (ঈমানবিহীন ব্যক্তিরা দুনিয়ায়) যা কিছু আমল করেছে, আমি তার ফয়সালা করতে আসব এবং সেগুলো শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (-এর মতো মূল্যহীন) করে দেবো।'[২৫]

অর্থাৎ তারা যে সকল কাজকে পুণ্য মনে করত, আখিরাতে তা ধুলোবালির মতো মিথ্যা মনে হবে। আখিরাতে তার বিনিময়ে কিছুই পাবে না। কেননা, আখিরাতে কোনো কাজ গৃহীত হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত, যা তাদের ছিল না। তাই সেখানে এসব কোনো কাজে আসবে না।

সুন্দর একটা উদাহরণ টেনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ۚ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ

'যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে (তাদের উপমা এই যে,) তাদের কর্ম **সেই ছাইয়ের মতো**, প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে তীব্র বাতাস যা উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা যা কিছু উপার্জন করে, তার কিছুই তাদের হস্তগত হবে না। এটাই চরম বিভ্রান্তি।'[২৬]

সহীহ হাদীসে এসেছে, আনাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

২৫. সূরা ফুরকান, (২৫) : ২৩
২৬. সূরা ইবরাহীম, (১৪) : ১৮

CamScanner

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا.

'(আল্লাহ তাআলার রীতি হলো) কাফের দুনিয়ায় ভালো কাজ করে থাকলে, (যেমন : সেবা, আর্ত ও পীড়িতদের সাহায্য করা ইত্যাদি) তিনি এগুলোর প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। আখিরাতে তার কোনো পুরস্কার তারা পাবে না।'[২৭]

কেননা, সেখানে পুরস্কার লাভের জন্য ঈমান শর্ত। সুতরাং এসব কাজ আখিরাতে তাদের কোনো কাজে আসবে না। তাই এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে—ঝড়ো হাওয়া যেমন ছাই উড়িয়ে নিয়ে যায়, তারপর তার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, সে রকমই কাফেরদের কুফর তাদের সৎকর্মসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ফলে তার কোনো উপকার তারা আখিরাতে লাভ করবে না।

আরেকটি উদাহরণ দিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

'তারা এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত এ রকম, যেমন হিমশীতল বায়ু এমন একদল লোকের শস্যক্ষেত্রে আঘাত হানে ও তা ধ্বংস করে দেয়, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। বস্তুত আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছে।'[২৮]

অর্থাৎ আখিরাতে কাফেরদের দানও তদ্রূপ বিফল হয়ে যাবে। কেননা, কুফর দান কবুল হওয়ার বিরোধী। তথাপি 'জালেম কওমের শস্যক্ষেত্র' বলার কারণ হলো, মুসলমানদের কোনো পার্থিব ক্ষতি হলে আখিরাতে সে তার বিনিময়ে নেকি অর্জন করবে। অথচ কাফেরদের ভাগ্যে তা জুটবে না।[২৯]

সুতরাং তাদের সেবামূলক কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত হলো শস্যক্ষেত্র, আর তাদের কুফরী কাজের দৃষ্টান্ত হিমশীতল ঝড়ো হাওয়া। সেই ঝড়ো হাওয়া যেমন মনোরম শস্যক্ষেত্রকে তছনছ করে দেয়, তেমনই তাদের কুফরও তাদের সেবামূলক কার্যক্রম ধ্বংস করে দেয়।

আরও একটি উপমা দেখুন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا

'যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা-সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি

২৭. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১২২৬৪, সনদ সহীহ
২৮. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১১৭
২৯. বয়ানুল কুরআন, থানভী

মনে করে। অবশেষে সে যখন সেখানে যায়, তখন কিছুই পায় না।'[৩০]

মরুভূমিতে যে বালুরাশি চিকচিক করে, দূর থেকে তাকে মনে হয় পানি। আসলে তা পানি নয়, মরীচিকা। সফরকালে মুসাফিরগণ ভ্রমবশত সেটাকে পানি মনে করে বসে। কিন্তু বাস্তবে তা কিছুই নয়। ঠিক এ রকমই কাফের ও ঈমানবিহীন ব্যক্তিরা যে ইবাদত ও সৎকর্ম করে আর ভাবে বেশ নেকি কামাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের কিছুই কামাই হয় না, তা মরীচিকার মতোই ফাঁকি।

সুতরাং তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে সম্পূর্ণরূপে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেছে। এভাবে তারা দেখতে পাবে তাদের কর্ম তাদের কোনো উপকারে আসেনি; বরং ক্ষতিরই কারণ হয়েছে।

উল্লেখ্য, মানুষ যেহেতু দু-ধরনের : মুমিন-মুসলিম ও বেঈমান-কাফের। এর বাহিরে আর কোনো প্রকার নেই। কাজেই মুমিন-মুসলিম ছাড়া সকল কাফের-বেঈমান, নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিষ্টান ও ধর্মহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য। যদিও মুসলিম নামধারী হোক না কেন, যেমন : কাদিয়ানী সম্প্রদায়।

ঈমান বড়ই মূল্যবান, আমল ছাড়া শুধু ঈমানের মূল্য আছে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً.

'জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পরে আল্লাহ তাআলা (ফেরেশতাদের) বলবেন, যাদের অন্তরে একটা সরিষা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো। তারপর তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এমন অবস্থায় যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। এরপর তাদের "হায়াতের নদীতে" ফেলা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর পাশে ঘাসের বীজ গজিয়ে ওঠে। তুমি কি দেখতে পাওনা সেগুলো কেমন হলুদ রঙের হয় ও ঘন হয়ে গজায়?'[৩১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ

---

৩০. সূরা নূর, (২৪) : ৩৯
৩১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪

الْحَيَاةِ... فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ...এরপর আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে এমন একদল লোক বের করে আনবেন, যারা কখনো কোনো সৎকর্ম করেনি এবং আগুনে জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছে।

পরে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশমুখের "নাহরুল হায়াতে" বা "হায়াতের নদীতে" ফেলে দেওয়া হবে।... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরপর তারা নহর থেকে মুক্তার মতো ঝকঝকে অবস্থায় উঠে আসবে এবং তাদের গ্রীবাদেশে মোহরাঙ্কিত থাকবে, যা দেখে জান্নাতীগণ তাদের চিনতে পারবেন। এরা হলো উতাকাউল্লাহ তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা সৎ আমল ব্যতীতই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন।'[৩২]

অন্য হাদীসে আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ، يُصِيبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ.

'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে (এর ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে যাবে), এটা একদিন তার উপকারে আসবে (অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করবে)। তবে এর আগে (আমল না করার কারণে) শাস্তি ভোগ করবে।'[৩৩]

ঈমানের দৃষ্টান্ত যেহেতু ১, ২ সংখ্যার মতো, আর আমল শূন্যের মতো। যদি কোথাও শুধু সংখ্যা থাকে এবং সাথে কোনো শূন্য না-ও থাকে, তারপরও সংখ্যার মূল্য থাকে। কিন্তু সংখ্যা ছাড়া যদি হাজারো শূন্য লেখা হয়, এর কোনো মূল্য নেই।

অনুরূপ কারও ঈমান-আকীদা যদি সঠিক ও বিশুদ্ধ থাকে, আর সাথে একটি আমলও যদি তার না থাকে, তাহলে সংখ্যার মতো এর মূল্য থাকে এবং মূল্যায়ন করা হবে। ফলে ইনশাআল্লাহ, সে একদিন জান্নাতে যাবে। কিন্তু সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমান-আকীদা পোষণ না করে যদি হাজারো আমল করে, তাহলে এর কোনো মূল্য নেই এবং সে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না।

এভাবে কোনো সংখ্যার সাথে যদি শূন্য যোগ করা হয়, তাহলে সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি পায়। যেমন ১+০+০, দশ ও একশ হয়; তদ্রূপ বিশুদ্ধ ঈমান-আকীদার সাথে যদি আমল যোগ হয়, তাহলে ঈমান-আকীদার মূল্য বৃদ্ধি পায়।

---

৩২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩

৩৩. মুসনাদে বাযযার, হাদীস নং ৮২৯২, শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস নং ৯৭, সনদ সহীহ

CamScanner

গুনাহগার হলেও ঈমানের মূল্য ও প্রতিদান আছে

আবু যর রাযি. বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» ثَلَاثًا.

'আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তিনি বললেন, যেকোনো বান্দা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং এ বিশ্বাসের ওপর মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আমি আরজ করলাম, যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে, তবুও? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। আমি আবার আরজ করলাম, যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে, তবুও? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও সে যিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে। এভাবে তিনবার বললেন।'[৩৪]

হযরত উমর রাযি. বলেন,

أَنَّ رَجُلاً كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ... وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ.

'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবদুল্লাহ নামের একজন ব্যক্তিকে মদপানের কারণে (বেশ কয়েকবার) শাস্তি দেওয়া হয়েছিল (তবুও তিনি মদ ছাড়তে পারেননি)। একবার শাস্তি দেওয়া শেষে একজন তাকে বলল, "হে আল্লাহ! তার ওপর লানত বর্ষণ করুন। আর কতবার তাকে (নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এখানে) আনা হবে?"

লানতের কথা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানতকারীকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, তাকে লানত দিয়ো না। আল্লাহর কসম! সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।'[৩৫]

সুতরাং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসার গুণটি যেকোনো মুসলিমের অন্তরে থাকতে পারে, সে যত বড় গুনাহগারই হোক না কেন। যে মদ খায় বা অন্য কোনো গুনাহে লিপ্ত, সেও রাসূলের মহব্বতের দাবি করতে পারে। তবে হ্যাঁ, এটার কারণে

---

৩৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৪

৩৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৮০

CamScanner

তার মদ খাওয়া বা গুনাহটা বৈধ হবে না। মদ খাওয়ার অপরাধে যে শাস্তি পাওয়ার, সেটা সে পাবে।

এখানে কেউ বলতে পারে না যে, সেই সাহাবী কীসের আল্লাহ ও রাসূলকে ভালোবাসে? কারণ, যিনি আল্লাহ ও রাসূলের নিষেধ মেনে চলেন না, তিনি আবার কীসের আল্লাহ ও রাসূলপ্রেমী? যিনি মদ খান, তিনি কী করে আল্লাহ ও রাসূলকে ভালোবাসতে পারেন?

কাজেই কোনো ফাসেক, গায়ক, নায়ক, ক্রিকেটার বা সাধারণ মানুষ নবীপ্রেমের দাবি করলে অথবা ইসলাম-ঈমান বা নবীপ্রেমের পক্ষে কোনো প্রতিবাদে যোগ দিলে তার নামাজ না পড়া, দাড়ি না রাখা বিষয়গুলো সেই মুহূর্তে টেনে এনে তার নবীপ্রেমকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।

ঈমান ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِن.

'আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন ও ঈমানদার ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'[৩৬]

চূড়ান্ত সফলতার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল থাকতে হবে

ইরশাদ হয়েছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমাদের এ অবস্থায়ই যেন মৃত্যু আসে যে, তোমরা মুসলিম।'[৩৭]

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ

'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ! অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে (এবং বলবে) যে, তোমরা কোনো ভয় কোরো না এবং কোনো কিছুর জন্য চিন্তিত হয়ো না; আর আনন্দিত হয়ে যাও সেই জান্নাতের জন্য, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হতো।'[৩৮]

---

৩৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬০৬ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৪২

৩৭. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১০২

৩৮. সূরা হা-মীম আস-সিজদাহ (ফুছছিলাত), (৪১) : ৩০; আরও দেখুন, সূরা আহকাফ (৪৬) : ১৩-১৪

ঈমানবিহীন মৃত্যুর ঠিকানা চিরস্থায়ী জাহান্নাম

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۚ

'যারা কাফের—হোক আহলে কিতাব কিংবা মুশরিক—নিশ্চয় ওরা জাহান্নামের আগুনে যাবে, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ওরাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব।'[৩৯]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

'নিশ্চয় যারা কুফর করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের প্রতি আল্লাহর, ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানুষের লানত। তারা সে লানতের মধ্যে থাকবে চিরকাল। তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।'[৪০]

কুফর-শিরক গুনাহের কোনো ক্ষমা নেই

কুফর সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا

'যারা কুফর করেছে ও সীমালঙ্ঘন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না জাহান্নামের পথ ব্যতীত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং তা আল্লাহর পক্ষে সহজ।'[৪১]

শিরক সম্পর্কে এসেছে,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيدًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর নিচের যেকোনো গুনাহ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, সে (সঠিক পথ থেকে) বহু দূরে সরে যায়।'[৪২]

অর্থাৎ কুফর ও শিরক অপেক্ষা নিচের গুনাহ, যা ঈমান ভঙ্গকারী নয়, তা আল্লাহ তাআলা যারটা চান বিনা তাওবায় কেবল নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু

---

৩৯. সূরা বায়্যিনাহ, (৯৮) : ৬
৪০. সূরা বাকারা, (২) : ১৬১-১৬২
৪১. সূরা নিসা, (৪) : ১৬৮-১৬৯
৪২. সূরা নিসা, (৪) : ১১৬ ও ৪৮

কুফর-শিরক ও ঈমান ভঙ্গকারী গুনাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা হতে পারে না, যতক্ষণ না মৃত্যুর আগে খাঁটি মনে তাওবা করে পুনরায় ইসলাম, ঈমান ও তাওহীদ কবুল করে নেবে।

বলাবাহুল্য, অনেকে শুধু শিরক সম্পর্কে আয়াতটি বলেন, কিন্তু কুফর সম্পর্কে আয়াতটি তেমন বলেন না। অথচ কুফর-শিরক উভয়ের পরিণতি একই। আর কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্যের আলোচনা সামনে আসবে।

আমাদের সৃষ্টি অনর্থক নয়

আল্লাহ তাআলা এ জগৎ ও আমাদেরকে অনর্থক-অহেতুক ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেননি। তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিতে ইরশাদ করেন,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?'[৪৩]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

'আমি আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই অযথা-অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণামাত্র।'[৪৪]

সুতরাং তাঁর কাছে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর এ জগতের প্রতিটি কাজের হিসাব-নিকাশ হবে এবং এর প্রতিফল ভোগ করতে হবে। কাজেই এখানে যা ইচ্ছা তা করা যাবে না।

আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।'[৪৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

---

৪৩. সূরা মুমিনূন, (২৩) : ১১৫
৪৪. সূরা ছোয়াদ, (৩৮) : ২৭ ও সূরা দুখান, (৪৪) : ৩৮-৩৯
৪৫. সূরা যারিয়াত, (৫১) : ৫৬

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

'তিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন—তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম।'[৪৬]

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

'নিশ্চয় পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে, আমি সেগুলো পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি। যাতে লোকদের পরীক্ষা করি, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।'[৪৭]

এ দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। দুনিয়ার সৌন্দর্যে মাতোয়ারা হয়ে কে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায়, আর কে আল্লাহ তাআলার হুকুমমতে চলে নিজের জন্য আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয় করে। তারপর একদিন আসবে, যখন তাকে তার ভালো-মন্দ কাজ অনুসারে ফলাফল দেওয়া হবে।

এ জগতে পুণ্য ও পাপ উভয়টা করার সুযোগ আছে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ

'আমি তাকে (মানুষকে) দুটো পথই দেখিয়েছি।'[৪৮]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا

'অতঃপর তার জন্য যা পাপ এবং তার জন্য যা পরহেযগারী, তার ভেতর সেই বিষয়ক জ্ঞানোন্মেষ ঘটিয়েছেন। সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। আর ব্যর্থকাম হবে সে-ই, যে তাকে (গুনাহের মধ্যে) ধসিয়ে দেবে।'[৪৯]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে ভালো ও মন্দ দুই পথই দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, নিজ ইচ্ছায় চাইলে ভালো পথ অবলম্বন করতে পারে এবং চাইলে মন্দ পথেও যেতে পারে। তবে ভালো পথে চললে পুরস্কার পাবে আর মন্দ পথে চললে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

পৃথিবীতে দু-রকমের লোক পাওয়া যাবে

এ দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র এবং পুণ্য ও পাপ উভয়টা করার সুযোগ দেওয়া

---

৪৬. সূরা মুলক, (৬৭) : ২

৪৭. সূরা কাহাফ, (১৮) : ৭

৪৮. সূরা বালাদ, (৯১) : ১০

৪৯. সূরা শামস, (৯১) : ৮-১০

হয়েছে, তাই এখানে দু-রকমের লোকই পাওয়া যাবে। একদল মুমিন-কৃতকার্য, আরেকদল কাফের-অকৃতকার্য।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

'আমি তাকে (মানুষকে) পথ দেখিয়েছি, এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হবে অথবা অকৃতজ্ঞ।'[৫০]

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।'[৫১]

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ

'আল্লাহ চাইলে সমস্ত লোককে একই দল বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন।'[৫২]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক একই দ্বীনের অনুসারী বানিয়ে দিতেন এবং মুসলিম বানাতে পারতেন। কিন্তু দুনিয়ায় যেহেতু মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য তাদেরকে পরীক্ষা করা, তাই এরূপ জবরদস্তি করা হয় না।

কেননা, পরীক্ষার দাবি হলো, মানুষকে দিয়ে জোরপূর্বক কিছু না করানো; বরং সে বিনা চাপে স্বেচ্ছায় বুঝে-শুনে ও নিজ বোধ-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে নিখিলবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলির মধ্যে চিন্তা করবে এবং তার ফলে খুশিমনে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে।

নবীগণকে পাঠানো হয় সেসব নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আর আসমানী কিতাব নাযিল করা হয় সে পরীক্ষাকে সহজ করার লক্ষ্যে।

আর এ পরীক্ষার ওপরই আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তি নির্ভর করে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কাউকে জোরপূর্বক মুসলিম বানান না।

পরিপূর্ণ সফলতার জন্য ঈমানের সাথে আমলও জরুরি

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۚ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن

৫০. সূরা দাহর, (৭৬) : ৩
৫১. সূরা তাগাবুন, (৬২) : ২; সূরা ইউনুস, (১০) : ৪০
৫২. সূরা শূরা, (৪২) : ৭-৮

تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ

'যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে তাদের পুরস্কার হলো চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার নিচে নহর প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এসব তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।'[৫৩]

وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى

'যে ব্যক্তি তাঁর নিকট মুমিন হয়ে আসবে এবং সে সৎকর্মও করে থাকবে, এরূপ লোকদের জন্যই রয়েছে সমুচ্চ মর্যাদা।'[৫৪]

وَالْعَصْرِ. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'মানুষ অবশ্যই মহাক্ষতিগ্রস্ত। তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে, নেক আমল করে এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় ও সবরের উপদেশ দেয়।'[৫৫]

কালের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যারা ঈমান ও নেক আমল বা সৎকর্ম থেকে বঞ্চিত থাকে, তারা মহাক্ষতিগ্রস্ত। কেননা, এ রকম বহু জাতিকে দুনিয়াতেই আসমানী আযাবের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা ছাড়া প্রত্যেক যুগে আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর প্রেরিত নবীগণ মানুষকে সতর্ক করেছেন যে, যদি ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন না করা হয়, তবে আখিরাতের কঠিন শাস্তি মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে।

৫৩. সূরা বায়্যিনাহ, (৯৮) : ৭-৮
৫৪. সূরা ত্বোয়াহা, (২০) : ৭৫
৫৫. সূরা আছর, (১০৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঈমান পরিচিতি ও মুমিন হওয়ার জন্য শর্তসমূহ

পরিপূর্ণ ঈমান হচ্ছে সাতটি বিষয় পালন ও বাস্তবায়নের নাম :

১. মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও সত্যায়ন করতে হবে।

২. ওই সকল বিষয় বিশ্বাস করতে হবে, যা ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

৩. অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোর নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যা ও রূপ-পদ্ধতিসহ বিশ্বাস করতে হবে।

৪. এমন প্রমাণিত বিষয়গুলোর মৌখিকভাবে সাক্ষ্য-স্বীকারোক্তি প্রদান করা।

৫. এমন বিষয়গুলোর আনুগত্য অবধারিত বা পালনীয় হিসেবে মেনে নিতে হবে।

৬. ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য সকল ধর্ম-কর্ম, মতবাদ ও আদর্শ থেকে বিমুখতা ও সম্পর্কহীনতা আবশ্যকীয়।

৭. এরপর শরীয়তের করণীয়-বর্জনীয় মতে আমল করা।

এর নামই হচ্ছে বিশুদ্ধ ঈমান ও পরিপূর্ণ ঈমান।

সুতরাং মুমিন হওয়ার জন্য প্রথম ছয়টি বিষয় আবশ্যকীয়, আর সাত নম্বরটি পাওয়া গেলে পরিপূর্ণ মুমিন ও প্রকৃত মুসলিম হওয়া যাবে।

এবার প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা তুলে ধরা হচ্ছে :

প্রথম বিষয় : মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা

মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও সত্যায়নের অর্থ হচ্ছে, ঈমান-ইসলামের অকাট্য বিষয়সমূহে মজবুত স্পষ্ট বিশ্বাস ও দৃঢ়তা থাকতে হবে। এতে কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয়, দ্বিধা, দোদুল্যমানতা, সিদ্ধান্তহীনতা, অস্পষ্টতা ও অপছন্দতা থাকতে পারবে না।

আকীদার ইমাম আবুল মুঈন নাসাফী মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৫০৮ হি.) লেখেন,

ثم التصديق ينافي التكذيب والتردد، لما في التردد من التوقف، والمتوقف لا يكون مصدّقا، وكذا المكذّب. ثم التصديق بحدّه إذا وجد بأن كان متعرّيا عما ينافيه من التكذيب والتردد، كان الذات الذي قام به هذا التصديق مصدّقا.

'সত্যায়ন বা বিশ্বাস হলো, মিথ্যা এবং দ্বিধা-সিদ্ধান্তহীনতার বিপরীত। কেননা, দ্বিধা-সিদ্ধান্তহীনতায় ঝুলে থাকা হয়। আর ঝুলে থাকা ব্যক্তি এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারী সত্যায়নকারী বা বিশ্বাসী নয়। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং দ্বিধা-সিদ্ধান্তহীনতা থেকে মুক্ত থেকে সত্যায়ন করবে, সে বিশ্বাসী (মুমিন) হিসেবে সাব্যস্ত হবে।'[৫৬]

আল্লাহ তাআলা মুমিনের পরিচয় তুলে ধরে ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

'তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনল, আর সন্দেহ পোষণ করল না এবং জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করল, তারাই সত্যবাদী মুমিন।'[৫৭]

এক লম্বা হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আমি আল্লাহর রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করছি। আর যে ব্যক্তি এ দুটি বিষয় (লা-ইলাহা...) কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয় ছাড়া গ্রহণ করে মারা যাবে, সে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৫৮]

পক্ষান্তরে সন্দেহ-সংশয় হচ্ছে মুনাফিকের লক্ষণ। আর মুনাফিক হলো কাফেরেরই এক প্রকার। এ কাফের-মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ

'তাদের অন্তর সন্দেহে নিপতিত। কাজেই তারা আপন সন্দেহের ভেতর দোদুল্যমান।'[৫৯]

আরও বলেন,

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ

---

৫৬. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ, ১/২৫
৫৭. সূরা হুজরাত, (৪৯) : ১৫
৫৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭
৫৯. সূরা তাওবা, (৯) : ৪৫

CamScanner

'এরা মাঝখানে দোদুল্যমান, এদিকেও নয় ওদিকেও নয়।'[৬০]

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাহনূন রাহ. (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেন,

مَنْ شَكَّ فِي حَرْفٍ مِمَّا جاء به محمد ﷺ عَنِ اللهِ فَهُوَ كَافِرٌ جَاحِدٌ.

'রাসূলের আনীত (সন্দেহাতীত) কোনো বিষয়ে সন্দেহ পোষণকারী কাফের।'[৬১]

আল্লামা ইবনে হাযম যাহিরী রাহ. (মৃ. ৪৫৬ হি.) এ বিষয়ে ঐকমত্য নকল করে লেখেন,

وَاتَّفَقُوا أن... مَنْ شكَّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَمَاتَ على ذَلِك فإنه كَافِر مُشْرِك مخلد فِي النَّار أبدا.

'এ কথার ওপর সকলেই একমত যে, কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামের কোনো (অকাট্য) বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করাবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে কাফের-মুশরিক ও চিরকাল জাহান্নামী।'[৬২]

সুতরাং ঈমান-বিশ্বাসে কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয়, দ্বিধা-সিদ্ধান্তহীনতা ও দোদুল্যমানতা থাকতে পারবে না।

বিশ্বাস-সত্যায়নের ভিত্তি বিজ্ঞান, যৌক্তিকতা ও বিবেককে বানানো যাবে না

ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার, কুরআন-হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও সর্বসম্মত ইসলামের কোনো বিষয় অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক নয় এবং ইসলামে বিবেক-বিরুদ্ধ কোনো কথা নেই। কেননা, ওহীর জ্ঞানের সাথে এসবের কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সাংঘর্ষিক অবস্থান হতেই পারে না।[৬৩]

এরপরও ঈমান-ইসলামের সকল বিষয়ে প্রথমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর সর্বোচ্চ আস্থা-বিশ্বাস রেখেই ঈমান আনতে হবে, মেনে নিতে হবে ও গ্রহণ করতে হবে। এরপর যদি বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির মাধ্যমে এগুলোর যৌক্তিকতা উন্মোচিত হয়, তখন মনে করতে হবে যে, এটা বিজ্ঞানের সক্ষমতা ও সফলতা। অর্থাৎ বিজ্ঞান এখানে সফল হয়েছে যে, ইসলামী বিধানের যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছে।

---

৬০. সূরা নিসা, (৪) : ১৪৩

৬১. আশ-শিফা, কাযী ইয়ায, ২/৫১৩; তাফসীরে মাতুরীদী, ৭/৫৮৩

৬২. মারাতিবুল ইজমা', পৃষ্ঠা ২৭৩

৬৩. তবে ইসলামে বিবেকের উর্ধ্বের কথা আছে। আর যেটাকে বিবেক-বিরুদ্ধ মনে করা হচ্ছে কিংবা ওহীর জ্ঞানের সাথে এসবের সাংঘর্ষিক অবস্থান পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা হয়তো কুরআন-হাদীসেরই কথা নয়। কিংবা কুরআন-হাদীসে আছে, কিন্তু বুঝতে ভুল হয়েছে। ফলে বিবেক-বিরুদ্ধ ও সাংঘর্ষিক অবস্থান মনে হয়েছে। অথবা কুরআন-হাদীসের বিপরীতে যেটাকে বিবেক ও বিজ্ঞান মনে করছি, সেটা আসলে স্বীকৃত বিবেক ও বিজ্ঞান নয়। এ বিষয়ে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে অনেকে আলোচনা করেছেন। সবচেয়ে সুন্দর ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. الانتباهات المفيدة কিতাবে।

আর যেখানে যৌক্তিকতা খুঁজে পায়নি বা উদ্ঘাটিত হয়নি, সেখানে মনে করতে হবে, বিজ্ঞান এখানে ব্যর্থ। অর্থাৎ বিজ্ঞান এখনো এই বিষয়ে অক্ষম, তাই এখনো তা ধরতে পারেনি।

সুতরাং কখনো যদি কোনো বিধান বিজ্ঞানের বিপরীত মনে হয়, তখন এই বিশ্বাস আমাকে রাখতে হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেছেন, তা-ই চিরন্তন সত্য ও যুক্তিযুক্ত। আর বিজ্ঞান এখনো সেই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি বা সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি বিধায় এর যৌক্তিকতা খুঁজে পায়নি এবং প্রকাশ করতে পারেনি। আর যেখানে পারে, তা বিজ্ঞানের সক্ষমতার কারণেই পারে। এটিই হতে হবে একজন মুমিনের বিশ্বাসের মাপকাঠি।

এর উদাহরণ হচ্ছে, যেমন কোনো ব্যক্তির রোগ হয়েছে, কিন্তু দেশের ডাক্তার ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মেশিন দিয়ে অনেক চেষ্টা করেও সে ব্যক্তির কী রোগ হয়েছে, তা ধরতে পারেনি ও নির্ণয় করতে পারেনি। কিন্তু কিছুদিন পর বিদেশে গিয়ে দেখা গেল, ওই ব্যক্তির আসল রোগটি কী, তা ধরা পড়ল। তো এখানে আমাদের ধারণা বা বিশ্বাস কীরূপ হবে?

অবশ্যই এ কথা বলতে বাধ্য হব যে, প্রথমবার দেশের ডাক্তার এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রগুলো যেহেতু রোগটি নির্ণয় করতে পারেনি, কাজেই সেগুলো ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং তাদের অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয়বার বিদেশে যখন রোগটি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে, তো সেগুলোর সক্ষমতা ও সফলতা প্রকাশ পেয়েছে।

আর এখানে যেমন আমরা বিশ্বাস করি, উক্ত ব্যক্তির যে রোগ ছিল তা সর্বোপরি সত্য। তদ্রূপ ঈমান-ইসলামের বিষয়গুলোও চিরন্তন সত্য ও যুক্তিযুক্ত। যদি বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি এগুলোর যৌক্তিকতা ধরতে পারে বা প্রকাশ করতে পারে, তবে সেটি তার সক্ষমতা ও সফলতা। আর যদি না পারে, তবে সেটি তার অক্ষমতা বা ব্যর্থতা।

সুতরাং মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও সত্যায়নের আরও অর্থ হচ্ছে, ঈমান-ইসলামের অকাট্য বিষয়সমূহ আমার বুঝে আসুক বা না আসুক, আমার জ্ঞান-বুদ্ধিতে ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, আমার কাছে যৌক্তিক মনে হোক বা না হোক, বিজ্ঞানসম্মত হোক বা না হোক, আমার কাছে ভালো লাগুক বা না লাগুক, মনঃপূত হোক বা না হোক, উপকারিতা পরিলক্ষিত হোক বা না হোক, যা-ই হোক না কেন, যেমনই হোক না কেন, বিষয়গুলোর ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সর্বোচ্চ আস্থা-বিশ্বাস রেখে ঈমান আনতে হবে ও মেনে নিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

CamScanner

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'(হে নবী!) আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে। এরপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়।'[৬৪]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী রাহ. (মৃ. ৩৭০ হি.), ফখরুদ্দীন রাযী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৬০৬ হি.) ও ইবনে আদিল হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৭৭৫ হি.) লেখেন,

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْ أَوَامِرِ اللهِ تَعَالَى أَوْ أَوَامِرِ رَسُولِهِ ﷺ فَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْإِسْلَامِ. سَوَاءٌ رَدَّهُ مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِيهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقَبُولِ وَالِامْتِنَاعِ مِنَ التَّسْلِيمِ. وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَّةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي حُكْمِهِمْ بِارْتِدَادِ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى حَكَمَ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَضَاءَهُ وَحُكْمَهُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ.

'আয়াতটির ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, কেউ যদি আল্লাহ বা রাসূলের কোনো বিধান প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাবে। চাই তা সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক, কিংবা মেনে না নিয়ে প্রত্যাখ্যান করুক—এ সবই সমান।

এই আয়াত (আবু বকর রাযি.-এর যুগে) যাকাত আদায় অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে মুরতাদ হওয়ার সিদ্ধান্ত আরোপ করে তাদের হত্যা ও শিশুদের বন্দি করার পক্ষে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান গ্রহণ করাটা সঠিক ছিল বলে সাব্যস্ত করে। জাসসাস রাহ. এর কারণ হিসেবে বলেন, কেননা আল্লাহ তাআলা এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা রাসূলের হুকুম ও ফয়সালা মেনে নেবে না, তারা ঈমানদার নয়।'[৬৫]

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) আরও সুস্পষ্ট করে এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,

تحکیم، عدم حرج اور تسلیم کے مراتب تین ہیں: اعتقاد سے اور زبان سے اور عمل سے۔

اعتقاد سے یہ کہ قانون شریعت کو حق اور موضوع التحکیم جانتا ہے اور اس میں مرتبہ عقل میں ضیق نہیں، اور اس مرتبہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور زبان سے یہ کہ ان امور کا اقرار کرتا ہوں کہ حق اسی طرح ہے اور عمل سے یہ مقدمہ لے بھی جاتا ہے اور طبعی ضیق بھی نہیں اور اس فیصلہ کے موافق کارروائی بھی کر لی۔

৬৪. সূরা নিসা, (৪) : ৬৫

৬৫. আহকামুল কুরআন, ২/২৬৮; মাফাতীহুল গায়ব বা আত-তাফসীরুল কাবীর, ১০/১২৪ ও আল-লুবাব ফী উলূমিল কিতাব, ৬/৪৫৬, দুই-একটি শব্দ ব্যতীত সকলের শব্দ এক।

سو اول مرتبہ تصدیق و ایمان کا ہے اس کا نہ ہونا عند اللہ کفر ہے۔۔۔ اور دوسرا مرتبہ اقرار کا ہے اس کا نہ ہونا عند الناس کفر ہے، تیسرا مرتبہ تقوی وصلاح ہے اس کا نہ ہونا فسق ہے اور طبعی تنگی معاف ہے۔

'এখানে তিনটা বিষয় : আকীদা-বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও আমলে বাস্তবায়ন। ইসলামী বিধি-বিধানকে কোনো দ্বিধা ছাড়া সত্য ও সর্বোচ্চ আইন হিসেবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা এবং মৌখিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা উভয়টা ঈমানের অংশ; এ দুটোর কোনো একটা বাদ দেওয়া কুফর। আর আমলে বাস্তবায়ন না করা ফাসেকী।'[৬৬]

তা ছাড়া আয়াতটির শেষাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রাহ. (মৃ. ৬৭১ হি.)-সহ অনেকে লিখেছেন,

(وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) أَيْ: وَيُسَلِّمُوا لِحُكْمِكَ تَسْلِيمًا لَا يُدْخِلُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ شَكًّا.

'আয়াতটির শেষাংশ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরীয়তের বিধান এমনভাবে মেনে নেওয়া, যাতে নিজেদের অন্তরে কোনো ধরনের সংশয়-সন্দেহ না থাকে।'[৬৭]

বিশিষ্ট তাবেয়ী জাফর সাদেক রাহ. (মৃ. ১৪৮ হি.) আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন,

لو أن قوما عبدوا الله تعالى وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت، ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله ﷺ: ألا صنع خلاف ما صنع؟ أو وجدوا في أنفسهم حرجا: لكانوا مشركين. ثم تلا هذه الآية.

'যদি কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর ইবাদত করে, নামাজ আদায় করে, রোযা পালন করে, যাকাত প্রদান করে এবং হজে গমন করে, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত কোনো একটি বিধানের ব্যাপারে এই কথা বলে যে, "তিনি এ কাজের বিপরীতটা করলেন না কেন?" অথবা তা মেনে নিতে অন্তরে কোনো দ্বিধা রাখে, তাহলে তারা কাফের-মুশরিক সাব্যস্ত হবে। এরপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।'[৬৮]

নামাজের মধ্যে আমি শারীরিক ব্যায়াম বা আত্মিক উপকারিতা দেখে দৃঢ় বিশ্বাস করলাম। কিন্তু যাকাতের শতকরা আড়াই পার্সেন্ট দিয়ে দেওয়ার কথা আমার বুঝে আসে না বিধায় ভালোভাবে বিশ্বাস করলাম না। চুরি-ডাকাতি ও মদ-নেশার খারাপি স্পষ্ট বিধায় আমি হারাম জানলাম। কিন্তু সুদের ইন্টারেস্ট, কলমের খোঁচায় দুর্নীতি ও প্রাণী/মানবভাস্কর্যের সমস্যা বুঝে আসে না বিধায় হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলাম।

---

৬৬. বয়ানুল কুরআন থেকে সারাংশ, ১/৫৫৯
৬৭. তাফসীরে কুরতুবী, ৫/২৬৯
৬৮. রুহুল মাআনী, ৩/৬৯

এভাবে নারীদেরকে পর্দা ও প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বের না হওয়া, একসাথে একাধিক বিবাহ না করার আদেশ এবং মীরাস সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিষেধের অসুবিধা বুঝে আসে না বিধায় হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হলাম বা দোদুল্যমানতায় থাকলাম—এটার নাম ঈমান নয়; বরং শরীয়তের সকল অকাট্য বিধান ও করণীয়-বর্জনীয় মনে কোনো দ্বিধা ছাড়া বিশ্বাস করা, অবনত মস্তকে মেনে নেওয়া এবং স্বীকৃতি প্রদানের নাম ঈমান।

ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।'[৬৯]

এ আয়াত শরীয়তের এ মৌলিক মূলনীতি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কোনো বিষয়ে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ বা নিষেধ থাকে, তাহলে মুমিন নর-নারীর জন্য এর বিপরীত কোনো ধরনের মতামত বা যুক্তি খাটানোর অধিকার থাকে না।

সুতরাং কোনো ঈমানদারের জন্য ইসলামের কোনো আদেশ-নিষেধের বিপক্ষে যুক্তির পেছনে পড়ার অনুমতি নেই এবং নিজ দল ও নেতা-নেত্রী কী বলল, তা দেখার কোনো সুযোগ নেই।

এখন কিছু লোক ঈমান-ইসলামের বিধানাবলি বিশ্বাস করে, যখন তা নিজ দলের পক্ষে যায় অথবা যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাথে মেলে। অথবা বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এর যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় কিংবা বোধগম্য হয়।

এটা কখনোই একজন ঈমানদারের কাজ হতে পারে না। এভাবে মুমিন হওয়া যাবে না। এতে ঈমানের দৌলত নসীব হবে না।

অদৃশ্য-অদেখা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—এমন সকল বিষয় ও বস্তুর ওপর ঈমান আনতে হবে

ঈমানের মূল ভিত্তিই হচ্ছে গায়ব তথা অদৃশ্য-অদেখা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—এমন বিষয় ও বস্তুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। তাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও সত্যায়নের আরও অর্থ হচ্ছে, ঈমান-আকীদার বিষয়গুলো আমার দৃশ্যমান হোক বা গায়ব হোক, পঞ্চইন্দ্রিয় তথা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক দিয়ে অনুভব করতে পারি বা না

৬৯. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩৬

পারি—যেমনই হোক না কেন, তা বিশ্বাস ও সত্যায়ন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

'যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেই ভয় করে, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহাপুরস্কার।'[৭০]

কিছু লোক বলে, যা দেখি তা মানি ও বিশ্বাস করি। আর আল্লাহকে যেহেতু দেখা যায় না, কাজেই তা মানা ও বিশ্বাস করা যাবে না।

অথচ তারা কত অদেখা জিনিস মানে এবং অদৃশ্য বস্তু বিশ্বাস করে। যেমন : নিজের আত্মাকে কখনো দেখেনি, এরপরও তা মানে। নিজে জারজ সন্তান না হয়ে স্বীয় পিতার মাধ্যমে তার জন্মলাভের সত্যতা দেখার সুযোগ পায়নি, অথচ তাও বিশ্বাস করে। খাদ্যের মিষ্টতা-তিক্ততা কিংবা মিষ্টির স্বাদ আস্বাদন এবং শরীরের ব্যথা অনুভব করলেও কাউকে দেখাতে পারে না, তা সত্ত্বেও এগুলো স্বীকার করে।

যা হোক, মুমিন হতে হলে ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত অদৃশ্য-অদেখা সকল বিষয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—এমন সব বস্তুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

'যারা অদৃশ্য-অদেখা বিষয়ের ওপর ঈমান আনয়ন করে...।'[৭১]

অর্থাৎ কুরআন মাজীদের হেদায়েত দ্বারা যারা উপকৃত হয়, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গুণ এই যে, তারা গায়ব তথা মানুষের দৃষ্টি ও চাক্ষুষ দেখার অগোচরের বিষয়াবলির ওপর ঈমান রাখে। যেমন : আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, রাসূলের সত্যায়ন, ফেরেশতা, জিন, শয়তান, কিয়ামত ও জান্নাত-জাহান্নামের ওপর ঈমান আনা। এভাবে ঈমান-সংক্রান্ত অসংখ্য বিষয় গায়বের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতটির সারমর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা যা কিছু কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন কিংবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন, সেসবের প্রতি তারা ঈমান ও বিশ্বাস রাখে, যদিও তা দৃষ্টিগোচর না হয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়।

সারকথা, ঈমান-ইসলামের অকাট্য বিষয়গুলো যেমনই হোক না কেন, এ সবই মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। এ ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারবে না।

---

৭০. সূরা মুলক, (৬৭) : ১২

৭১. সূরা বাকারা, (২) : ৩

ইমাম আবু বকর কাসানী রাহ. (মৃ. ৫৮৭ হি.) লেখেন,

ولا خلاف أن التصديق بالقلب ركن للإيمان حتى لا يصير العبد مؤمنا بدونه، وإن أقر بلسانه.

'এ বিষয়ে কারও মতভেদ নেই যে, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা ঈমানের রুকন (তথা অপরিহার্য শর্ত), যা ছাড়া বান্দা (আল্লাহর নিকট) মুমিন হতে পারে না। যদিও মুখে স্বীকৃতি প্রদান করে।'[৭২]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,

والإيمان لغة: التصديق، وشرعا: تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه. وهذا القدر متفق عليه.

'শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান হলো, যা কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন, সেসব বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করা। আর এটা সর্বসম্মত বিষয়।'[৭৩]

তাসদীক তথা বিশ্বাস-সত্যায়ন ও মা'রিফাত তথা জানা-চেনার মাঝে পার্থক্য

একটা হলো, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে কেবল চেনা-জানা ও জ্ঞান থাকা, আরেকটা হলো, চেনা-জানা ও জ্ঞান অর্জনের পর তা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে বিশ্বাস করা ও সত্যায়ন করা।

উভয়টার মধ্যে পার্থক্য হলো, কোনো বিষয় সম্পর্কে চেনা-জানা ও জ্ঞান অর্জিত হওয়া ইখতিয়ার ও ইচ্ছা ছাড়াও হতে পারে, যেমন : হঠাৎ কোনো কিছু দেখে বা শুনে। কিন্তু বিশ্বাস ও সত্যায়ন ইখতিয়ার ও ইচ্ছা ছাড়া হয় না। তাই ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে কেবল চেনা-জানা ও জ্ঞান থাকলে হবে না। এ কারণেই ইহুদীদের সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

'যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে (রাসূলকে এতটা ভালোভাবে) চেনে-জানে, যেমন করে চেনে-জানে নিজেদের সন্তানদের।'[৭৪]

অর্থাৎ অমুসলিমরাও রাসূল ও তাঁর নবুওয়াতের যথার্থতা সম্পর্কে এমন সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন জানে তাদের নিজ নিজ সন্তানদের।

অন্যত্র এসেছে,

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۫ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

৭২. আল-মু'তামাদ মিনাল মু'তাকাদ, পৃষ্ঠা ৬৯
৭৩. ফাতহুল বারী, ১/৪৬
৭৪. সূরা বাকারা, (২) : ১৪৬

CamScanner

'যখন তাদের কাছে সেই জিনিস এলো, যাকে তারা চিনতে পেরেছিল, তখন তাকে অস্বীকার করে বসল। সুতরাং এমন কাফেরদের প্রতি আল্লাহর লানত।'[৭৫]

কাজেই ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে কেবল জ্ঞান ও চেনা-জানা থাকলে মুমিন হতে পারবে না; বরং এর সাথে সাথে বিশ্বাস ও সত্যায়ন থাকতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয় : ওই সকল বিষয় বিশ্বাস করতে হবে, যা ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত

মুমিন হওয়ার জন্য দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও সত্যায়ন করতে হবে ওই সকল বিষয়, যা ইসলামে অকাট্যভাবে ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত।

আকীদা-বিশেষজ্ঞ আল্লামা আযুদুদ্দীন ইজী রাহ. (মৃ. ৭৫৬ হি.) লেখেন,

وأما في الشرع فهو – عندنا وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ – التصديق للرسول فيما عُلِمَ مجيئُهُ به ضرورة، فتفصيلا فيما عُلِمَ تفصيلا، وإجمالا فيما عُلِمَ إجمالا.

'আমাদের ও অধিকাংশ ইমামের মতানুসারে শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান হচ্ছে, সেসব বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করা, যা তাঁর নিয়ে আসা (তথা তাঁর আনীত) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অকাট্যভাবে ও সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে। যে বিষয়গুলো বিস্তারিত জানা গেছে, সেগুলো বিস্তারিতভাবে বিশ্বাস করা আর যে বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে জানা গেছে, তা সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বাস করা।'[৭৬]

পরিভাষায় এগুলোকে 'কাতইয়াত', 'জরুরিয়াতে দ্বীন'[৭৭] ও 'অকাট্য ইজমা' বলে।

---

৭৫. সূরা বাকারা, (২) : ৮৯

৭৬. শারহুল মাওয়াকিফ, ৮/৩২২-২৩; জাওয়াহিরুল কালাম, পৃষ্ঠা ১১২ ও শারহুল আকায়িদ, পৃষ্ঠা ২০৪

৭৭. 'কাতইয়াত' ও 'মুতাওয়াতির' ইসলামের সেসব বিষয়কে বলে, যা অকাট্যভাবে যুগপরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আর 'জরুরিয়াতে দ্বীন' বলা হয়, যা অকাট্যভাবে যুগপরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং উম্মাহর সাধারণ দ্বীনদার শ্রেণিও যেসব বিষয়কে ইসলামের অংশ হিসেবে জানে। অর্থাৎ অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে সর্বসাধারণের প্রত্যেক শ্রেণির কাছে তার জ্ঞান পৌঁছে যাওয়া। তবে প্রত্যেক সদস্যের তা অবগত হওয়া জরুরি নয়।

কাজেই সর্বসাধারণের ওই শ্রেণির অবগত হওয়ার দরকার নেই, যারা দ্বীন ও শরীয়তের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখে না; বরং সর্বসাধারণের মধ্য থেকে শুধু ওই শ্রেণি পর্যন্ত তার জ্ঞান পৌঁছে যাওয়া জরুরি, যারা দ্বীনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে; তারা উলামায়ে কেরামের দলভুক্ত হোক বা না হোক।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, জরুরিয়াতে দ্বীনের ভিত্তি হচ্ছে প্রসিদ্ধির ওপর। সুতরাং কখনো এমনও হতে পারে, একটি বিষয় কোনো সম্প্রদায়ের সবার কাছে প্রসিদ্ধ; কিন্তু আরেক সম্প্রদায়ের কাছে তা শুধু জ্ঞানীদের মধ্যেই পরিচিত। আবার এমনও হতে পারে, একটি বিষয় পূর্বের শতাব্দীগুলোতে সর্বজনবিদিত ছিল; কিন্তু এই শতাব্দীতে এসে তার চর্চা ও প্রসিদ্ধি কমে যাওয়ায় তা আর সর্বজনবিদিত থাকেনি। সুতরাং কোন বিষয়টি জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হবে, তা নির্ধারণের জন্য প্রাচীন গ্রন্থাবলির সাথে সাথে সমাজ ও পরিবেশ-পরিস্থিতিও বিবেচনায় নিতে হবে।

সারাংশ : অকাট্য বিধান ও জরুরিয়াতে দ্বীনের মধ্যে পার্থক্য হলো, জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর জ্ঞান ব্যাপক হবে এবং আলেমদের পাশাপাশি মুসলিম জনসাধারণও সে ব্যাপারে অবগত থাকবে। কাজেই জরুরিয়াতে

CamScanner

অর্থাৎ যে সকল বিষয় কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীস (অসংখ্য সূত্র, যাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না) দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত অথবা ইসলামের অংশ হওয়াটা প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত কিংবা ইমামগণের ঐকমত্যপূর্ণ, এগুলো সবই বিশ্বাস করতে হবে।

আল্লামা আবুশ শাকুর সালিমী রাহ. (মৃ. ৪৬০ হিজরীর পর) লেখেন,

قال أهل السنة والجماعة: شرائط الإيمان ما يجب الإيمان به ولا يصح بدونه، ويكفر بالإنكار والرد، وهو كل ما ثبت بالنص أو بالخبر المتواتر أو بإجماع الأمة: فإنه يوجب القبول والاعتقاد به.

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মতে ঈমানের (মুমিন হওয়ার) জন্য শর্ত হলো সেসব বিষয়, যেগুলোর ওপর ঈমান আনা আবশ্যক, যা ছাড়া ঈমান বিশুদ্ধ হয় না এবং যা অস্বীকার করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে, ওই সকল বিষয়, যা নস (অকাট্য ও সুস্পষ্ট) বা মুতাওয়াতির হাদীস (অকাট্যভাবে প্রমাণিত সূত্র) কিংবা উম্মাহর ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। সুতরাং তা গ্রহণ করা এবং বিশ্বাস করা অপরিহার্য।'[৭৮]

আর অকাট্যভাবে ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত বিষয় আকীদা-সংক্রান্ত হোক, যেমন : ঈমানের আরকানসহ ইসলাম ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী যত মৌলিক আকীদা ও মূলনীতি রয়েছে অথবা আমল-সংশ্লিষ্ট হোক, যেমন : নামাজ-রোযা, হজ-যাকাত ইত্যাদি।

সুতরাং ইসলামে প্রমাণিত আকীদা-সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর যেভাবে ঈমান আনতে হবে, তেমনইভাবে আমল-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপরও ঈমান আনতে হবে।

দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিধান অকাট্য। কিন্তু প্রতিটি অকাট্য বিধান জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে অনেক ফকীহ ও আকীদা-বিশেষজ্ঞ আলেমের ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, অকাট্য বিধান ও জরুরিয়াতে দ্বীন শব্দ দুটি সমার্থক।

উল্লেখ্য, 'জরুরিয়াত' শব্দ দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, এগুলো আমল করা আবশ্যক, যেমনটা কেউ কেউ ভুলবশত ধারণা করে। কখনো এমন হয়, একটা বিষয়ের মুস্তাহাব বা বৈধ হওয়ার ব্যাপারটি জরুরিয়াতে দ্বীন হয়ে থাকে। অথচ তা আমল করা অপরিহার্য নয়। সবিস্তারে জানতে দেখুন, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ.-এর মূল্যবান 'ইকফারুল মুলহিদীন' গ্রন্থটি।

৭৮. আত-তামহীদ, পৃষ্ঠা ১০৭। তিনি এতে আরও বলেন,

وكل ما ثبت بالخبر الواحد ولم يتفق الأمة على قبوله: فإنه لا يكون شرطا لصحة الايمان، وكل ماثبت بالخبر الواحد واتفقت الأمة على قبوله من غير تاويل: فإنه يكون من شرائط الإيمان، كالصراط والميزان والمعراج الى السماء. ومثل هذا ثبت بالخبر الواحد ولكن الصحابة والفقهاء اتفقوا على صحة ذلك وقبولها، فحل محل الإجماع، فإنه يوجب الإيمان به.

'যে সমস্ত বিষয় খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত (তথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়), কিন্তু উম্মাহ এগুলোর ব্যাপারে ঐকমত্য হতে পারেনি, তা ঈমানের শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর যে সকল বিষয় খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত এবং কোনো রকম তাবীল (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) ছাড়াই উম্মাহ ঐকমত্যভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে, তা ঈমান শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : পুলসিরাত, মীযান, আকাশে মেরাজ ইত্যাদি খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু সাহাবা ও ফুকাহায়ে কেরাম তা সহীহ ও কবুল হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করার কারণে ইজমার অন্তর্ভুক্ত এবং এর ওপর ঈমান আনা অপরিহার্য।'

CamScanner

অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও জরুরিয়াতে দ্বীনের সংখ্যার তালিকা

অধিকাংশ মানুষ দু-চারটি দৃষ্টান্ত দেখে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও জরুরিয়াতে দ্বীনের সংখ্যা খুবই কম মনে করে থাকে। তাই ধারণা লাভের জন্য এর একটি তালিকা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অনিবার্য ও অপরিহার্য। তাঁর শুরু নেই, শেষও নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, সহযোগী নেই, বিরোধী নেই, বিকল্প ও স্থলাভিষিক্ত নেই। তিনি অসমকক্ষ, অতুলনীয়, অসদৃশ, তাঁর মতো কিছুই নেই। তিনি দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আকার-আকৃতি, সীমা, গণ্ডি ও দিকসমূহ থেকে পবিত্র। তিনি স্থান ও কালের উর্ধ্বে। তাঁকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ধরা যায় না। তিনি হুলুল (প্রবিষ্ট ও অবতারিত) হন না। তিনি অমুখাপেক্ষী, সবাই ও সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারও থেকে জন্ম লাভ করেননি, তাঁর থেকেও কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। তিনি সৃষ্টির সকল গুণাবলি ও অবস্থা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

যা কিছু দেখি বা না দেখি আল্লাহ ছাড়া সবই সৃষ্ট ও নশ্বর; তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, বিধানদাতা ও সকল ক্ষমতার মালিক। তিনিই সর্বজ্ঞ (আলীম), সর্বশ্রোতা (সামী'), সর্বদ্রষ্টা (বাসীর), মৃতকে জীবিতকারী, পূর্ণ নিয়ন্ত্রক, রিযিকদাতা, সন্তানদাতা, লাভ-ক্ষতির মালিক, আলিমুল গায়ব এবং তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। এভাবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত আল্লাহ তাআলার যত গুণাবলি রয়েছে সবই বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর গুণসমূহ চিরন্তন (কাদীম) মনে করা।

তিনিই একমাত্র ইলাহ তথা ইবাদতের উপযুক্ত। তাঁকেই ভয় করা এবং তাঁর রহমত থেকে নৈরাশ না হওয়া।

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, কিরামান কাতিবীনের অস্তিত্ব, জিন-জাতির অস্তিত্ব, সকল নাযিলকৃত কিতাব সত্য, কুরআন কালামুল্লাহ, কুরআন চিরন্তন, কুরআন অসৃষ্ট ও সন্দেহের অবকাশমুক্ত এবং কুরআন-হাদীস হুজ্জত তথা গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য।

সমস্ত নবী-রাসূলের সত্যায়ন, নবুওয়াত স্রষ্টাপ্রদত্ত, খতমে নবুওয়াত (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী), অকাট্যভাবে প্রমাণিত তাঁর নাম ও গুণাবলিসমূহ, নুযুলে ঈসা (ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ), ইসরা (মক্কা মুকাররমা থেকে বাইতুল মাকদিস), তাকদীর, আখিরাত, দৈহিক পুনরুত্থান, কবরের আযাব, পুরস্কার ও শাস্তি, কিয়ামতের অবস্থার অকাট্য বিবরণসমূহ, জান্নাতীদের আল্লাহর দর্শন লাভ, শাফাআতে কুবরা, হাউযে কাউসার, জান্নাত-জাহান্নামের অস্তিত্ব, হিসাব, মীযান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর সাক্ষ্যপ্রদান, আমলনামা প্রকাশ, আমলনামা ডান-বাম হাতে পাওয়া, অকাট্যভাবে প্রমাণিত জান্নাত-জাহান্নামের নিয়ামত ও শাস্তির বিবরণগুলো, মুমিনগণ চিরস্থায়ী জান্নাতী, কাফেররা চিরস্থায়ী

CamScanner

জাহান্নামী, হযরত আবু বকর ও উমর রাযি.-এর খেলাফত, আয়েশা রাযি.-এর পবিত্রতা ও আহলে বাইতের ভালোবাসা লালন করা।

এভাবে আল্লাহ, কুরআন, রাসূল ও ইসলামের শিআর-প্রতীকসমূহের অবমাননা ও মুহাজির-আনসার সাহাবায়ে কেরামের মানহানি এবং জরুরিয়াতে দ্বীন তথা সর্বজনবিদিত অকাট্য দ্বীনী বিষয়সমূহের কোনো একটি অস্বীকার, সন্দেহ পোষণ, অপব্যাখ্যা, অপছন্দ, অবজ্ঞা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কুফর ও অবিশ্বাস করার নামান্তর।

আর ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত মেনে নেওয়া এবং কাফেরদের কাফের মনে করা ও তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা।

অনুরূপ অকাট্যভাবে প্রমাণিত আমল-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ওপরও ঈমান আনতে হবে। যেমন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রাকাত-সংখ্যা, সিজদার সংখ্যা, রমজানের রোযা, যাকাত, যাকাতের পরিমাণ, যাকাত প্রদানের আটটি খাত, যাকাত অনাদায়ের শাস্তি, হজ, আরাফায় অবস্থান, তাওয়াফের সংখ্যা, ওমরা, জুমআ, দুই ঈদ, তারাবীহ, কুরবানী, দাড়ির প্রামাণিকতা, কিবলা, ফরজ ওযু, তায়াম্মুম, অকাট্যভাবে প্রমাণিত ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ, ফরজ গোসল, মোজার ওপর মাসেহের বৈধতা, ব্যবসার বৈধতা, বিবাহ, পুরুষের জন্য চারটা পর্যন্ত বিবাহের বৈধতা, ওয়াদা রক্ষা, সাদকা, গরীব-মিসকীনের হক, আত্মীয়-স্বজনের হক, নারীদের ফরজ পর্দা, নারী-পুরুষ উভয়ের দৃষ্টির হেফাজত, উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ভাইয়ের অংশ বোনের দ্বিগুণ, আল্লাহর নামে কসম, কসমের কাফফারা, ফরজ জিহাদ, জিযিয়া (কর) গ্রহণ, মুরতাদকে হত্যা করা, হত্যার বদলে হত্যা বা দিয়াত (মুক্তিপণ), চোরের হাত কর্তন, সন্ত্রাসীদের শাস্তি, অবিবাহিত ব্যভিচারের শাস্তি একশ চাবুক ও বিবাহিত ব্যভিচারের শাস্তি রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা—এগুলো সবই বিশ্বাস করতে হবে।

এভাবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হারামসমূহকে হালাল মনে না করা। যেমন : সুদ, মদ, জুয়া, যিনা, সমকামিতা, খুন, আত্মহত্যা, আত্মসাৎ, জুলুম, প্রতারণা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য, চুরি, ডাকাতি, মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, গায়রুল্লাহর নামে জবেহকৃত পশু, এতীমের সম্পদ, মা-বাবার অবাধ্যতা, অপচয়, গুনাহের কাজে সহযোগিতা, গীবত, পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড়, প্রাণী ও মানবভাস্কর্য, মুশরিকদের সাথে বিবাহ, মা, বোন, কন্যা ও মাহরামদের সাথে বিবাহ, স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর হায়েয-নেফাস অবস্থায় ও রমজানে দিনের বেলায় সহবাস করা এবং ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য বিধানে বিচার ও রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি হারাম হওয়া।

উল্লেখ্য, ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও জরুরিয়াতে দ্বীনের বিষয় ফরজ-ওয়াজিব

ছাড়াও হতে পারে। যেমন : মিসওয়াক, আজান, তারাবীহ ও নামাজের জামাআত ইত্যাদি ফরজ-ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত। কিন্তু এগুলো বিশ্বাস করা ঈমানের জন্য শর্ত ও জরুরি, অস্বীকার করা কুফর।[৭৯]

বলাবাহুল্য, উল্লিখিত বিষয়সহ আরও যা রয়েছে, এগুলো সবই জনসাধারণের প্রত্যেকের জানা থাকা অপরিহার্য নয়; বরং ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও জরুরিয়াতে দ্বীনের সব বিষয়ের ওপর ইজমালী (সংক্ষিপ্তভাবে) ঈমান আনলে যথেষ্ট হবে। এরপর যখন যে বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তখন উক্ত বিষয় জেনে সে-মতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য ও ঈমানের জন্য শর্ত।

আবদুল আযীয বুখারী হানাফী রাহ. (মৃ. ৭৩০ হি.) বলেন,

أَتُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَادِرٌ عَالِمٌ حَيٌّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مُرِيدٌ خَالِقٌ إِلَى آخِرِ أَوْصَافِهِ الَّتِي يَجِبُ ذِكْرُهَا فِي الْإِيمَانِ، أَوْ يُقَالُ: أَتُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ حَقٌّ، فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، حُكِمَ بِصِحَّةِ إِسْلَامِهِ وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْوَصْفِ. قَالُوا: وَهَذَا إِذَا وَافَقَ هَذَا الِاسْتِفْهَامَ مَا فِي قَلْبِهِ وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَا يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ اعْتَقَدَهُ فَلَا يُفِيدُ هَذَا الِاسْتِيصَافُ إِلَّا بِتَبْدِيلِ ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ.

'যদি কাউকে বলা হয়, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ তাআলা এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বজ্ঞানী, তিন সর্বশ্রোতা, তিনি সর্বদ্রষ্টা, তিনি সবকিছুর ইচ্ছা ও সৃষ্টিকারী ইত্যাদি...? অথবা বলা হয়, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ সকল পূর্ণ গুণের অধিকারী, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন সব সত্য? প্রশ্নের জবাবে যদি সে 'হ্যাঁ' বলে, তার ঈমানকে বিশুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। এসব সাক্ষ্যের হাকীকত বা তফসীলী (বিস্তারিত) আলোচনা তার কাছে চাওয়া হবে না।

তবে এটা স্বাভাবিক অবস্থায়। কাজেই সে ব্যক্তি যদি ইসলামবিরোধী কোনো আকীদা লালন করে, তবে তার জন্য শুধু 'হ্যাঁ' বলা যথেষ্ট হবে না; বরং সেই আকীদা পরিবর্তন করা জরুরি হবে।'[৮০]

জরুরি জ্ঞাতব্য

অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে সকল বিষয়ের আলোচনা বিস্তারিতভাবে এসেছে, তা বিস্তারিতভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, নামাজের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হলে নামাজ-সংশ্লিষ্ট যা কিছু অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তার সবই বিশ্বাস করতে হবে।

---

৭৯. আরও দেখুন, আল-ফাতাওয়াল হাদীসিয়া, ইবনে হাজার হাইতামী, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০০; আকীদায়ে নুযুলে মাসীহ, ইউসুফ বানূরী, পৃষ্ঠা ২৪-২৫

৮০. কাশফুল আসরার, ২/৫৮৭

আর যা সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি, তা যতটুকু বর্ণিত হয়েছে ততটুকু বিশ্বাস করলে হবে। যেমন : নবীগণের সংখ্যা ও নাম বিষয়ে এবং ফেরেশতা, কিয়ামত ও জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে অকাট্যভাবে যতটুকু প্রমাণিত, ততটুকু বিশ্বাস করলে হবে।[৮১]

'মূল ঈমান' বাড়েও না, কমেও না; তবে ঈমানের গুণগত অবস্থা বাড়ে-কমে

'মূল ঈমান' তথা উল্লিখিত তালিকার সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে সবাই সমান। ফেরেশতা, নবী, সাহাবী, তাবেয়ী, ইমাম, আলেম, সাধারণ সকলকেই উল্লিখিত সব বিষয়ের ওপর ঈমান আনতে হবে। এদিক থেকে কোনো বেশ-কম নেই। তাই এদিক থেকে ঈমান বাড়া বা কমার সুযোগ নেই। কাজেই ঈমান আনার দিক থেকে সকলের ঈমান এক; তা বাড়েও না, কমেও না।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন,

إن الإيمان غير العمل، فإيماننا مثل إيمانهم؛ لأنا صدَّقْنا من بوحدانية الرب وربوبيته وقدرته، وبما جاء من عنده بمثل ما أقرَّتْ به الملائكةُ، وصدَّقَتْ به الأنبياءُ والرسل. فمن هاهنا زعمْنا أن إيماننا مثل إيمان الملائكة؛ لأننا آمنا بكل شيء آمنَتْ به الملائكةُ مما عاينَتْه الملائكةُ من عجائب آيات الله ولم نُعايِنه نحن.

'আমল ঈমানের অংশ নয়। আমাদের ঈমান ফেরেশতাদের ঈমানের মতো। কারণ, আল্লাহর তাওহীদ, রুবূবিয়্যাত, কুদরতসহ তাঁর পক্ষ থেকে আসা যে সকল বিষয়ের ওপর ফেরেশতারা ঈমান এনেছেন, আমরাও ঠিক সেসব বিষয়েই ঈমান এনেছি। নবী-রাসূলগণও ঠিক সেসব বিষয়ই সত্যায়ন করেছেন। এ কারণেই আমরা বলেছি, আমাদের ঈমান ফেরেশতাদের ঈমানের মতো। কারণ, তারা যেসব বিষয় দেখে ঈমান এনেছেন, আমরা সেসব বিষয় না দেখেও ঈমান এনেছি।'[৮২]

তবে ঈমানের গুণগত অবস্থা সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন কারণে বাড়ে ও কমে। যেমন : গুনাহ করলে কমে; আবার আল্লাহ তাআলার কুদরত দেখলে বা শুনলে, অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে, তাকওয়া, আমল ইত্যাদির কারণে বাড়ে। তাই গুণগত অবস্থার দিক থেকে সকল মানুষের মধ্যে নবীগণের ঈমান সবচেয়ে বেশি।[৮৩]

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর বিখ্যাত 'আকীদা' গ্রন্থে বলেন,

وَالإِيمَانُ وَاحِدٌ، وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى، وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى، وَمُلَازَمَةِ الأَوْلَى.

---

৮১. শারহুল মাকাসিদ, তাফতাযানী, ৫/১৭৭
৮২. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম-এর সূত্রে মাজমূউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৬৬; আরও দেখুন, ইনআমুল বারী, তাকী উসমানী, ১/৩১৮
৮৩. দ্র. সূরা বাকারা, (২) : ২৬০; সূরা আনফাল, (৮) : ২; আত-তামহীদ, আবুশ শাকুর সালিমী, পৃষ্ঠা ১০৯-১১১

CamScanner

ঈমান এক (জিনিসের নাম, তথা অকাট্য সব বিষয়ের ওপর ঈমান আনা)। আর মূল ঈমানের ক্ষেত্রে সকল ঈমানদার সমান। তবে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং সর্বদা উত্তম আমলের মাধ্যমে মুমিনদের মাঝে মর্যাদার বেশ-কম ও পার্থক্য হয়।'

সারকথা, মূল ঈমানে কারও জন্যই বেশ-কম করার সুযোগ নেই। তাই এদিক থেকে সকলের ঈমান এক—বাড়েও না, কমেও না। তবে ঈমানের গুণগত অবস্থা পরিবর্তন হয় বিভিন্ন কারণে। তাই এদিক থেকে কারও ঈমান বাড়ে বা কমে।

ইসলামে প্রমাণিত সকল বিষয় ঈমানের জন্য শর্ত না হলেও বিশ্বাস করা ওয়াজিব

ওপরে ঈমানের সংজ্ঞায় উল্লেখ হয়েছে যে, ইসলামে যে সকল বিষয় অকাট্যভাবে ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত, তা সত্যায়ন করা ও বিশ্বাস করা ঈমানের জন্য শর্ত, যা ছাড়া মুমিন হওয়া যাবে না।

এখন জানার বিষয় হলো, যে সকল বিষয় অকাট্যভাবে ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়, তবে বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত—এগুলোর হুকুম কী?

ইসলামে বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত বিষয়গুলো যদিও সত্যায়ন করা ও বিশ্বাস করা ঈমানের জন্য শর্ত নয়, এরপরও একজন মুমিনের জন্য সেগুলো বিশ্বাস করা ওয়াজিব ও জরুরি।

প্রখ্যাত মুহাক্কিক ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) লেখেন,

متعلق الإيمان: ما جاء به محمد رسول الله ﷺ، فيجب التصديق بكل ما جاء به من اعتقادي وعملي، وأعني: اعتقاد حقية العملي. وتفاصيل هذين كثير... فاكتفي بالإجمال، وهو: أن يقر بأن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، عن مطابقة جنانه واستسلامه...

وما لم يجيء هذا المجيء، بل نقل آحادا... يكفَّر الشاهد بإنكاره سؤال الملكين وإيجاب صدقة الفطر، ويفسَّق الغائب به ويضلَّل..؛ لأنه لمَّا لم يسمعه من فيه: لم يكن ثبوته من النبي ﷺ قطعا، فلم يكن إنكاره تكذيبا له؛ بل للرواة، أو تغليطا لهم، وهو فسق وضلالة؛ اللهم إلا أن رده استخفافا؛ إذ كان إنما قاله النبي ﷺ، فيكفر.

'যা কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন, তার সবই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাঁর আনীত সকল বিষয়—আকীদাগত ও আমল-সংশ্লিষ্ট সবই বিশ্বাস করা ওয়াজিব। আর আমল-সংশ্লিষ্ট থেকে উদ্দেশ্য হলো, তা সত্য হওয়া বিশ্বাস করা।

উভয় বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ অনেক বেশি। তাই সংক্ষিপ্তভাবে এতটুকু যথেষ্ট যে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-এর স্বীকৃতি প্রদান করা এবং

CamScanner

(মৌখিক স্বীকৃতির সাথে) অন্তরের বিশ্বাস মিল থাকা ও আত্মসমর্পণ করা। (তথা ইসলামের আনুগত্য অবধারিত মেনে নেওয়া)।

এরপর কিছুদূর এগিয়ে বলেন, যে সকল বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়, বরং সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, যেমন : কবরে (মুনকার-নাকীর) দুই ফেরেশতার প্রশ্ন এবং সাদকায়ে ফিতরা ওয়াজিব হওয়া—এমন বিষয় রাসূল থেকে প্রত্যক্ষকারী (সরাসরি জেনেছেন এমন) ব্যক্তি অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

আর অপ্রত্যক্ষকারী (সরাসরি না জানা) ব্যক্তি অস্বীকার করলে তাকে ফাসেক ও গোমরাহ বলা হবে। কেননা, সে সরাসরি রাসূলের মুখ থেকে শোনেনি। তাই তার নিকট এটা রাসূল থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়।

সুতরাং তার এ-জাতীয় বিষয় অস্বীকার করাটা রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর নয়; বরং বর্ণনাকারীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা ভুলের শিকার হয়েছে মনে করা। কাজেই এটা ফাসেকী ও গোমরাহী।

তবে হ্যাঁ, এ-জাতীয় বিষয় যদি রাসূলের বক্তব্য হওয়ার কারণে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা করে অস্বীকৃতি করা হয়, তখন কাফের হয়ে যাবে।'[৮৪]

মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন,

حضور اقدس ﷺ جن چیزوں کو لے کر آئے ہیں ان میں بہت سی ایسی بھی ہیں جن کو آپ کا لے کر آنا دلائل ظنیہ سے ثابت ہے، یعنی اخبار آحاد کے ذریعہ۔ ان کو یہاں داخل کرنا مقصود نہیں، کیونکہ ان چیزوں پر ایمان لانا ایمان کی شرائط میں سے نہیں ہے، اگرچہ واجب ہیں، اور ان پر عمل بھی واجب ہے لیکن شرائط ایمان میں سے نہیں ہیں۔ وقال ایضا: ایک مسلمان کو خبر واحد پر بھی اطمینان اور عمل کرنا چاہئے اور اسے ماننا چاہئے، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔

সারাংশ : 'যে সকল বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়, সেগুলো বিশ্বাস করা ঈমানের জন্য শর্ত নয়, তবে সেগুলো বিশ্বাস করা ও আমল করা ওয়াজিব।'[৮৫]

আর অকাট্যভাবে অপ্রমাণিত বিষয়গুলো বিশ্বাস করা যদিও ঈমানের জন্য শর্ত নয়, কিন্তু তা বিশ্বাস করা ও আমল করা যেহেতু ওয়াজিব, তাই কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যে ঈমান আনার বিষয়ে বলা হয়েছে, 'যা কিছু আল্লাহর প্রেরিত, নবীর আনীত বা তাঁর ওপর নাযিলকৃত কিংবা ইসলামে বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত, তার সবই সত্যায়ন ও বিশ্বাস করা।' এবং ইমামগণও সুস্পষ্টভাবে ঈমানের সংজ্ঞায় এমন বলেছেন, যেমন ওপরে হাফেজ ইবনে হাজার রাহ. ও ইবনুল হুমাম রাহ.-এর বক্তব্যে তা উল্লেখ

---

৮৪. আল-মুসায়ারাহ (খাতিমা), পৃষ্ঠা ২১১

৮৫. ইনআমুল বারী, তাকী উসমানী, ১/২১৩ ও ২১৬, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ

হয়েছে। আরও কিছু বক্তব্য নকল করছি। এরপর কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য থেকে ঈমান আনার বিষয় তুলে ধরা হবে।

ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর (মৃ. ১৫০ হি.) বক্তব্যে এসেছে,

من صدق بالله وبما جاء من عند الله بقلبه ولسانه: فهو عند الله وعند الناس مؤمن.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে, তার সবই অন্তর ও মুখের দ্বারা বিশ্বাস করে, সে আল্লাহর নিকট এবং মানুষের নিকট মুমিন।'[৮৬]

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর বিখ্যাত 'আকীদা' গ্রন্থে বলেন,

وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ. وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ، وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ.

'ঈমান হলো মৌখিক স্বীকারোক্তি দেওয়া এবং আন্তরিক বিশ্বাস করা। আর (এর বিবরণ হচ্ছে,) আল্লাহ তাআলা কুরআনে যা কিছু নাযিল করেছেন এবং শরীয়ত ও এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার সবই সত্য।'

তিনি আরও বলেন,

وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ.

'আহলে কিবলাদের (আমাদের কিবলায় যারা নামাজ পড়ে) আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন-মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করব, যতক্ষণ পর্যন্ত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত সকল বিধি-বিধান স্বীকার করবে এবং তাঁর প্রতিটি কথা ও সংবাদকে বিশ্বাস করবে।'

ইমাম আবুল মুঈন নাসাফী রাহ. (মৃ. ৫০৮ হি.) লেখেন,

وهو أن يصدق الرسول ﷺ فيما جاء به من عند الله تعالى.

'ঈমান হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা বিশ্বাস করা।'[৮৭] এমন বক্তব্য 'আকায়িদে নাসাফী'-সহ অনেক কিতাবে আছে।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রাহ. (মৃ. ৩২৪ হি.) বলেন,

---

৮৬. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৬৪

৮৭. আত-তামহীদ লি-কাওয়াদিত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ৩৭৮

واجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، وما ثبت به النقل من سائر سنته.

'এ বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণিত সকল বিষয়ে বিশ্বাস পোষণ করা।'[৮৮]

এভাবে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যেও সকল বিষয় বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

'রাসূল তার ওপর তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। তারা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছেন। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না (যে, কারও প্রতি ঈমান আনব আর কারও প্রতি আনব না)। এবং তারা বলে, আমরা (আল্লাহ ও রাসূলের বিধানসমূহ মনোযোগ সহকারে) শুনেছি এবং তা (খুশিমনে) কবুল বা পালন করছি।'[৮৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ

'আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা বিশ্বাস করে—আর তা-ই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য—আল্লাহ তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন।'[৯০]

সহীহ হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ...

'আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

৮৮. রিসালাতুন ইলা আহলিছ-ছাগরি বিবাবিল আবওয়াব, ৪৩ নং ইজমা
৮৯. সূরা বাকারা, (২) : ২৮৫
৯০. সূরা মুহাম্মাদ, (৪৭) : ২

CamScanner

আমি লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত এবং আমার প্রতি ও আমি যা (আকীদা ও আমল) নিয়ে এসেছি, এগুলোর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত।'[৯১]

প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত জিহাদ কেন?

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য না দেওয়া এবং রাসূলের প্রতি ঈমান না আনার অর্থ হচ্ছে, কুফর-শিরক করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহ করা। আর এ বিদ্রোহের একমাত্র শাস্তি কতল বা মৃত্যুদণ্ড, যা এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

যেভাবে আমাদের দেশসহ অর্ধশতাধিক দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, তেমনই ইসলামী রাষ্ট্রেও ইসলামদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

আশ্চর্য হলো, ইসলাম ধর্মে ইসলামদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান কেন রাখা হলো, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। অথচ বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কেন, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠে না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সিংহাসন উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে কেউ ধরা পড়লে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তখন কোনো বুদ্ধিজীবী বা সুশীল সমাজ নাক গলায় না; কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিদ্রোহীদের ওপর যদি মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করা হয়, তখন বলে ওঠে, এ শাস্তি অমানবিক! এটা হওয়া উচিত নয়!

এখানে এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে রাখা উচিত যে, শরীয়তে জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়; বরং দুনিয়া ও রাষ্ট্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আইন-কানুন মেনে নিতে বাধ্য করা। এ কারণেই সাধারণ অবস্থায় কেউ যদি কুফরেই অবিচল থাকতে চায়, তবে সে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজারূপে ইসলামী আইন-কানুন মেনে থাকতে চাইলে সামান্য জিযিয়া (যুদ্ধকর) দিয়ে থাকতে পারবে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও জান-মালের নিরাপত্তার বিধান থাকবে।

তা ছাড়া জিহাদের উদ্দেশ্য যদি কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হতো, তাহলে কাফেরদের নারী, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও জিহাদের বিধান থাকত। অথচ এদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান নেই।[৯২]

কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচার জন্য তিনটি উপায় আছে—হয় ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়তো জিযিয়া কর দিয়ে থাকতে হবে, অথবা ইসলামী রাষ্ট্র ত্যাগ করে

---

৯১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১

৯২. দেখুন, সূরা তাওবা, (৯) : ২৯ ও সূরা বাকারা, (২) : ১৯৩ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মাতুরীদী, ৫/৩৩৮; বয়ানুল কুরআন; মাআরিফুল কুরআন ও তাওযীহুল কুরআন

CamScanner

অন্যত্র চলে যেতে হবে।

তবে জাযীরাতুল আরবের অধিবাসী যারা, তাদের জন্য জিযিয়ার বিধান নেই। হয় ইসলাম গ্রহণ, নয়তো অন্যত্র প্রস্থান। কেননা, ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বিশেষ বাহিনী বা অনুমতিপ্রাপ্তরা ছাড়া অন্য কেউ বসবাস বা প্রবেশ করতে পারে না। জাযীরাতুল আরব হচ্ছে ইসলামের ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, তাই এখানে মুসলিম ছাড়া অন্য কেউ বসবাস ও প্রবেশ করতে পারে না।

উল্লেখ্য, জাযীরাতুল আরব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কা, মদীনা ও ইয়ামামা-জেদ্দার আশপাশের এলাকা।[৯৩]

অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ؛ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

'আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সে সত্তার কসম যাঁর কব্জায় মুহাম্মাদের প্রাণ, এ উম্মতের যে কেউ আমার আহ্বান শুনেছে, সে ইহুদী হোক আর খ্রিষ্টান হোক, অথচ আমি যেই দ্বীন (আকীদা ও আমল) নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, এর ওপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।'[৯৪]

সুতরাং আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য এক দ্বীন ও শরীয়ত নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। আর তাঁর আনীত দ্বীন ও শরীয়তের অকাট্য সব বিষয়ের ওপর ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক প্রভৃতি যত দল ও জাতি আছে, সকলের জন্যই ঈমান আনা ও বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। এ ছাড়া জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় নেই।

তৃতীয় বিষয় : অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোর নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যা ও রূপ-পদ্ধতিসহ বিশ্বাস করতে হবে

মুমিন হওয়ার জন্য তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোর নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যা ও রূপ-পদ্ধতিসহ বিশ্বাস করা।

ইসলাম ও শরীয়ত যেমন বেশ কিছু অকাট্য আকীদা-আমল দিয়েছে, তেমনই এগুলোর অর্থ-ব্যাখ্যা ও পালনের রূপ-পদ্ধতি কী হবে, তাও অকাট্যভাবে জানিয়ে

---

৯৩. দ্র. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ৬/১৭১
৯৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩

দিয়েছে, যা প্রজন্মপরম্পরায় প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। এমন অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিতের বিপরীত ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা-পদ্ধতি বা বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা করা কুফরের আলামত।

কাজেই ঈমান-আকীদার বিষয়গুলোকে এর অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যা ও পালনের রূপ-পদ্ধতিসহ বিশ্বাস করতে হবে। এগুলোর প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যা পাশ কেটে নতুন কোনো মর্ম গ্রহণ করলে অথবা এগুলো পালনের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি বাদ দিয়ে ভিন্ন কোনো পন্থা অবলম্বন করলে মুমিন হওয়া যাবে না বা ঈমান থাকবে না।

যেমন : কেউ যদি নামাজের প্রতি বিশ্বাস রাখে, কিন্তু কুরআন-হাদীসে এর নির্ধারিত যে অর্থ-ব্যাখ্যা রয়েছে তা গ্রহণ না করে বলে, নামাজ অর্থ মা'রিফাত বা অন্তরে আল্লাহর স্মরণ। অথবা নামাজ আদায়ের অকাট্যভাবে যে রূপ-পদ্ধতি বর্ণিত ও প্রজন্মপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত, তা পালন না করে নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করে, যেমন : হিজবুত তাওহীদের মিলিটিরিয়ান ট্রেনিংয়ের মতো বিকৃত নামাজ, কিংবা আহলে কুরআন নামধারী হাদীস অস্বীকারকারীদের অভিনব পদ্ধতির নামাজ, অথবা সজল রোশন নামক কুরআনিস্টের (?) মতে চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম সালাতের অর্থ হচ্ছে, 'সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিধি-নিষেধ ছায়ার মতো অনুসরণ করা'!

এভাবে কেউ পর্দা ফরজ বিশ্বাস করে, কিন্তু পর্দার যে পদ্ধতি অকাট্যভাবে বর্ণিত ও ধারাবাহিক কর্মধারা প্রমাণিত, তা বিশ্বাস করে না, বরং ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা করে; অথবা বলে, 'মনের পর্দা আসল পর্দা'! এগুলো যদি কেউ প্রকৃত ইসলামের নামে বলে বা করে, তাহলে সে মুমিন নয়।

অনুরূপ কেউ সুদ হারাম জানে ঠিকই, কিন্তু বর্তমান ব্যাংকের ইন্টারেস্ট, মুনাফা, লাভ, ইউজারি, ফিনান্সিয়াল চার্জ, কস্ট অব ফান্ড (তহবিলের ব্যয়), কস্ট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (প্রশাসনিক খরচ) ইত্যাদি কুরআন-হাদীসে বর্ণিত রিবা (সুদ) এক নয় বলে। অথবা বলল, সুদ যদি ঋণগ্রহীতার ওপর জুলুম হয় তবে তা হারাম, আর ঋণগ্রহীতা সার্বিক সেবায় সন্তুষ্ট হলে হারাম নয়, তাহলে সে ঈমান হারিয়ে কুফরে প্রবেশ করবে।[৯৫]

---

৯৫. সজল রোশন নামক আমেরিকা বসবসকারী এক কুরআনিস্ট (?) তথা হাদীস অস্বীকারকারী তার 'রিলিজিয়াস মাইন্ডসেট' বইয়ে ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছে, 'আল্লাহ... ব্যাংককে বলছে, যাতে মানুষের জন্য কষ্টকর হয় এমন উচ্চহারে, জবরদস্তিমূলক সুদ না নেয়।... সুদকে রি-ডিফাইন করার সময় এসেছে। ব্যাংক মানেই সুদ আর সুদ মানেই হারাম নয়।' শেষে লিখেছে, 'সুদ যদি ঋণগ্রহীতার ওপর জুলুম হয় তবে তা হারাম। ঋণগ্রহীতা যদি সার্বিক সেবায় সন্তুষ্ট হয় তবে তা হারাম নয়।'

উল্লেখ্য, তার উক্ত বইয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিধান, যেমন : নামাজ, পর্দা, হারাম, অ্যালকোহল, জিহাদ ইত্যাদি নিয়ে এমন অপব্যাখ্যা ভরপুর, যা নিশ্চিত কুফরী।

এভাবে সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয় সংসদে 'সুদ ও রিবা' এক জিনিস নয় বলে বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ইসলামে রিবা নিষিদ্ধ। কিন্তু রিবা ও সুদ এক নয়। রিবা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে। এখানে

কিংবা বলল, প্রাচীন যুগের শরীয়ত এ আধুনিক যুগে অচল বা সংস্কার প্রয়োজন। অথবা বলল, শরীয়ত হুজুর ও আলেমদের জন্য, সবার জন্য নয় বা সাধারণদের জন্য নয়। কেউ এ-জাতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে ঈমানদার বলে গণ্য হবে না।

তদ্রূপ কেউ যদি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মতো বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন্নাবিয়্যীন তথা শরীয়তবাহী শেষ নবী। আর মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও নবী, তবে উম্মতী নবী, শরীয়তবিহীন নবী বা অনুত্তম নবী কিংবা যিল্লী-বুরুযী-প্রতিচ্ছবী নবী, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

কিংবা কেউ যদি আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস রাখে, কিন্তু তাঁকে অন্য বস্তুর মতো দেহ বা আকৃতিবিশিষ্ট মনে করে, তাহলে সে ঈমানদার হতে পারবে না।[৯৬]

কোনো মানবিকতা নেই। সুদ হচ্ছে কস্ট অব ফান্ড বা কস্ট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ধর্ম নিয়ে যাঁরা বেশি কথা বলেন, তাঁরা সুদ আর রিবাকে এক করে ফেলেন।' (প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)
অথচ সুদ ও রিবার প্রসিদ্ধ আয়াত: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।' -সূরা বাকারা, (২) : ২৭৫
এই আয়াতে কম-বেশি ও জুলুম-সন্তুষ্টের কোনো পার্থক্য ছাড়া সকল রিবা বা সুদকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রিবার সর্বজনবিদিত ও মুতাওয়ারাছ (অনুসৃত) অর্থ রিবা-সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের তরজমা থেকেই স্পষ্ট। আর তা এই যে, ঋণের বিপরীতে মূলধনের অতিরিক্ত কোনো কিছুর শর্তারোপ করাই হলো রিবার চুক্তি আর অতিরিক্তটা হচ্ছে রিবা। এতে ঋণের ধরন ও শর্তকৃত অর্থ কম-বেশি হওয়ার কোনো পার্থক্য নেই। অসংখ্য সহীহ হাদীস ও আছারে কম-বেশি, চক্রবৃদ্ধি-সরল নির্বিশেষে সব রকম রিবা বা সুদকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং কম এবং বেশি পরিমাণের সাথে রিবা হওয়া না হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই; বরং ঋণের অতিরিক্ত যা-ই কিছু হোক, তা রিবার অন্তর্ভুক্ত। চাই তা ইন্টারেস্ট, মুনাফা, লাভ, ইউজারি, ফিনান্সিয়াল চার্জ, কস্ট অব ফান্ড, কস্ট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অথবা সুদ—যে নামেই ডাকা হোক।
ভাষার ভিন্নতা কিংবা পরিভাষার বিভিন্নতার অপব্যবহার করে হারামকে হালাল সাব্যস্ত করা যায় না। এমন হীলা-বাহানা শুধু সুদে কেন, বরং খমর আর বর্তমানের মদ তো এক নয়, হিজাব আর পর্দা তো এক নয়... ইত্যাদি বলা যেতে পারে। এতে নামে ভিন্নতা এলেও বিধান কখনো ভিন্ন হবে না।
আচ্ছা, সুদ যদি কস্ট (খরচ) হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাংকগুলো কি কখনো লাভ করে না? খরচ পরিমাণ টাকাই কি তবে ব্যাংকগুলো ঋণগ্রহীতা থেকে উঠিয়ে থাকে? আর যারা বলে থাকে যে, সুদ রিবার মতো অমানবিক নয়; বরং তা মানবিক ও উপকারী। অথচ প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি-মাত্রই জানেন যে, সুদ তথা রিবা তখন যেভাবে অমানবিক ছিল এখনো সেভাবেই জুলুম ও অমানবিক। সে যুগেও তা সম্পদকে এককেন্দ্রিক বা কিছু লোককেন্দ্রিক করে ফেলার জন্য দায়ী ছিল। বর্তমান সুদীব্যবস্থাও একই দোষে অভিযুক্ত।
ব্রিটেনের অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনালের কয়েক বছর আগের এক সমীক্ষা এ কথার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। যাতে বলা হয়েছে, পুরো পৃথিবীর ৯৯% সম্পদ ভোগ করছে মাত্র ১% মানুষ। পক্ষান্তরে ৯৯% লোকের জন্য থাকছে মাত্র ১% সম্পদ। এটি সুদভিত্তিক অমানবিকতারই একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।
তা ছাড়া আল্লাহ তাআলার হারামকৃত কোনো বিষয় যদি কারও দৃষ্টিতে অমানবিক না-ও হয়, তবুও তা শুধু এ জন্যই হারাম হবে যে, আল্লাহ তাআলা তা হারাম করেছেন। মুমিনের দৃষ্টিতে ঈমানই সবার আগে। ইসলামী বিধিনিষেধই তার কাছে বৈধ-অবৈধের মানদণ্ড।
তাই আমরা মুসলমানদের জন্য স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, ইসলামে হারামকৃত বিষয়গুলোর মধ্যে সুদ নিকৃষ্টতম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় সুদগ্রহীতা, দাতা, এর লেখক ও সাক্ষীগণ সবাই অভিশপ্ত। (মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯৮) অতএব এ ধরনের কথায় বিভ্রান্তিতে না পড়ে নিজেদের ঈমান-আমলের হেফাজত করা সবারই কর্তব্য। আরও দেখুন, মাসিক আলকাউসার, এপ্রিল ২০১৫।
৯৬. শেষ বিষয়দ্বয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে ঈমান ভঙ্গের কারণে আসবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বাঁকা পথ অবলম্বন করে (আয়াত না মানা বা অপব্যাখ্যা করা), তারা আমার কাছে গোপন নয়। যাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে সে উত্তম, না যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে নির্ভয়ে-নিরাপদে? তোমরা যা ইচ্ছা করো, নিশ্চয় তোমরা যা করো, তিনি তা দেখেন।'[৯৭]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম তাবারী রাহ. (মৃ. ৩১০ হি.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থ 'জামিউল বয়ানে' বলেন,

وقال آخرون: أريد به الخبر عن تبديلهم معاني كتاب الله... عن ابن عباس قال: هو أن يوضع الكلام على غير موضعه... ويكون تحريفا لها وتغييرا لمعانيها.

সারাংশ : 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-সহ অনেকে বলেছেন, "আয়াতসমূহের ব্যাপারে বাঁকা পথ অবলম্বনকারী" থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা আল্লাহর কালামকে অপাত্রে প্রয়োগ করে। অর্থাৎ কুরআনের ভিন্ন অর্থ বলে ও অপব্যাখ্যা করে।'[৯৮]

ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন,

فإن قال: أؤمن بالآية ولا أؤمن بتأويلها وتفسيرها. قال: هو كافر، لأن من القرآن ما هو تنزيله تأويله، فإن جحد بها: فقد كفر.

'কেউ যদি বলে আমি আয়াত বিশ্বাস করি, তবে এর ব্যাখ্যা বিশ্বাস করি না, তাহলে সে কাফের। কারণ, কুরআন ব্যাখ্যাসহ নাযিল হয়েছে। কাজেই তা যে অস্বীকার করবে, নিশ্চিত সে কাফের হয়ে যাবে।'[৯৯]

কাযী ইয়ায রাহ. (মৃ. ৫৪৪ হি.) লেখেন,

مَنْ أَنْكَرَ الْجَنَّةَ، أَوِ النَّارَ، أَوِ الْبَعْثَ، أَوِ الْحِسَابَ، أَوِ الْقِيَامَةَ: فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعٍ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى صِحَّةِ نَقْلِهِ مُتَوَاتِرًا. وَكَذَلِكَ مَنِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، مَعْنًى غَيْرُ ظَاهِرِهِ، وَإِنَّهَا لَذَّاتٌ رُوحَانِيَّةٌ، وَمَعَانٍ بَاطِنَةٌ كَقَوْلِ النَّصَارَى، وَالْفَلَاسِفَةِ.

'কেউ যদি জান্নাত, জাহান্নাম, উত্থান, হিসাব বা কিয়ামত—এগুলোর কোনো একটা

---

৯৭. সূরা হা-মীম আস-সিজদাহ, (৪১) : ৪০

৯৮. আয়াতটির ব্যাখ্যায় দেখুন, তাফসীরে তাবারী; ইবনে কাসীর ও রুহুল মাআনী।

৯৯. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি আবু মুতী' (প্রচলিত আল-ফিকহুল আবসাত), আকীদা নং ৩৮-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩২৪

অস্বীকার করে, তাহলে সে সর্বসম্মতভাবে কাফের। কারণ, এগুলো নস দ্বারা ও উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

অনুরূপ ওই ব্যক্তিও কাফের, যে এগুলো স্বীকার করে, কিন্তু জান্নাত-জাহান্নাম ও সাওয়াব-শাস্তির বাহ্যিক অর্থের বিপরীত ব্যাখ্যা করে। যেমন : জান্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আত্মিক স্বাদ এবং বাতিনী অর্থ, যা খ্রিষ্টান ও দার্শনিকরা বলে থাকে।'[১০০]

এ বিষয়ে মূলনীতি উল্লেখ করে তাফতাযানী রাহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেন,

(وَالنُّصُوْصُ) مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (تُحْمَلُ عَلَى ظَوَاهِرِهَا) مَا لَمْ يَصْرِفْ عَنْهَا دَلِيْلٌ قَطْعِيٌّ... (وَالْعُدُوْلُ عَنْهَا) أَيْ: عَنِ الظَّوَاهِرِ (إِلَى مَعَانٍ يَدَّعِيهَا أَهْلُ الْبَاطِنِ)... (إِلْحَادٌ) أَيْ: مَيْلٌ وَعُدُوْلٌ عَنِ الإِسْلَامِ، وَاتِّصَالٌ وَالْتِصَاقٌ بِكُفْرٍ؛ لِكَوْنِهِ تَكْذِيبًا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا عُلِمَ مَجِيْئُهُ بِهِ بِالضَّرُوْرَةِ.

'কুরআন-সুন্নাহর নুসুসে (টেক্সট) তার বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করা হবে, যতক্ষণ না কোনো অকাট্য দলীল তাকে বাহ্যিক অর্থ থেকে ফেরাবে। সুতরাং বাহ্যিক অর্থ ছেড়ে শব্দকে এমন অর্থের দিকে ফেরানো, যা বাতিনীরা দাবি করে, তা ইলহাদ। আর ইলহাদ হচ্ছে, ইসলাম থেকে সরে যাওয়া এবং কুফরের সঙ্গে সংযুক্ত ও তার গুণে গুণান্বিত হওয়া। কারণ, এর দ্বারা নবীকে এমন বিষয়ে অস্বীকার করা হয়, যা তাঁর থেকে অকাট্যভাবে ও নিশ্চিতভাবে জানা গেছে।'[১০১]

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. (মৃ. ১৩৫২ হি.) বলেন,

أن التصرف في ضروريات الدين، والتأويل فيها، وتحويلها إلى غير ما كانت عليه، وإخراجها عن صورة ما تواترت عليه: كفر، فإن ما تواتر لفظا أو معنى، وكان مكشوف المراد: فقد تواتر مراده، فتأويله رد للشريعة القطعية، وهو كفر بواح، وإن لم يكذب صاحب الشرع.

'জরুরিয়াতে দ্বীনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা, এতে ভিন্ন ব্যাখ্যা করা, অকাট্যভাবে চলে আসা এর স্বরূপ থেকে বের করে ভিন্ন রূপে পরিবর্তিত করা কুফর। কারণ, যা শাব্দিক বা অর্থগতভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মপরম্পরায় অকাট্যভাবে চলে এসেছে এবং যার অর্থও সুস্পষ্ট, তার উদ্দিষ্ট মর্মও অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সুতরাং এর ভিন্ন ব্যাখ্যা করা অকাট্য শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর, যা সুস্পষ্ট কুফর। যদিও সে প্রত্যক্ষভাবে শরীয়ত-প্রণেতাকে অস্বীকার করেনি।'[১০২]

সুতরাং কোনো নসের (আয়াত-হাদীসের) অর্থ যদি সুনির্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সর্বস্তরের দ্বীনদার শ্রেণির মধ্যে অবিচ্ছিন্নতার সঙ্গে চলে

---

১০০. আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, ২/৬১৫
১০১. শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২০৪
১০২. দেখুন, ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা ১২৮; আরও দেখুন, ইমদাদুল ফাতাওয়া, থানভী, ১২/৩৬৫; জাওয়াহিরুল ফিকহ, মুফতী শফী, ১/৩২০-৩২৮

আসার কারণে সর্বসম্মতভাবে অকাট্য হয়, তাহলে সেই অর্থ পরিত্যাগ করে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা প্রকারান্তরে তা অস্বীকারের নামান্তর এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করার কারণে জাহান্নামী।

ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۚ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

'কারও নিকট সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করলে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেবো, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।'[১০৩]

এখানে 'সাবীলুল মুমিনীন' তথা 'মুমিনদের পথ' মানে কুরআন-সুন্নাহর শব্দ-ব্যাখ্যা ও বিধানাবলির পথ-পদ্ধতি বিষয়ে উম্মতের সর্বসম্মত অবস্থান।

উক্ত আয়াতে কারীমায় 'রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলে' এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল। এর সাথে 'মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চললে' বাক্যটি যোগ করার কী প্রয়োজন দেখা দিল? কেননা, ইসলামী শরীয়ত তা-ই, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের কাছে এসেছে। কাজেই দ্বীন-ইসলাম তা-ই, যা রাসূল বলেছেন বা করেছেন। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে জাহান্নামী হওয়ার কারণ হতে পারে।

কিন্তু আল্লাহ যে বললেন, মুমিনদের পথের উল্টা পথে চললে জাহান্নামী হতে হবে। এমন কেন বললেন? এর কারণসমূহের মধ্যে একটি হলো, উভয় বাক্যের মাঝে ব্যাখ্যাবাচক যোগসূত্র রয়েছে। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর শব্দ-ব্যাখ্যা ও বিধানাবলির পথ-পদ্ধতি বিষয়ে উম্মতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অবস্থান। আর এটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় এবং কেউ যেন এটাকে ভ্রান্ত বা অগ্রহণযোগ্য মনে না করে, সে জন্য আল্লাহ তাআলা দ্বিতীয় বাক্যটি সংযোগ করে দিয়েছেন।

সুতরাং উম্মতের সর্বসম্মত এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অবস্থান পরিহার করার অর্থ হলো, সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হওয়া, যা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

কাযী ইয়ায মালেকী রাহ. (মৃ. ৫৪৪ হি.) লেখেন,

نَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ كُلِّ مَنْ كَذَّبَ وَأَنْكَرَ قَاعِدَةً مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ، وَمَا عُرِفَ يَقِينًا بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ مِنْ فعل الرسول ﷺ وَوَقَعَ الْإِجْمَاعُ الْمُتَّصِلُ عَلَيْهِ، كَمَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الصلوات الخمس، وعدد رَكَعَاتِهَا وَسَجَدَاتِهَا وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ الصَّلَاةَ عَلَى الْجُمْلَةِ، وَكَوْنُهَا خَمْسًا وَعَلَى هَذِهِ

১০৩. সূরা নিসা, (৪) : ১১৫

الصِّفَاتِ وَالشُّرُوطِ لا أَعْلَمُهُ، إِذْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ فِي الْقُرْآنِ نَصٌّ جَلِيٌّ، وَالْخَبَرُ بِهِ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ خبر واحد. وكذلك اجمع عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ قَالَ مِنَ الْخَوَارِجِ: إِنَّ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ.

'আমরা প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে সুনিশ্চিত কাফের মনে করি, যে শরীয়তের কোনো মূলনীতি, অথবা রাসূল থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত ও সর্বসম্মত কোনো কাজ অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করে।

যেমন : কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আবশ্যকতা এবং তার রাকাত ও সিজদা-সংখ্যা অস্বীকার করে বলল, আল্লাহ তাঁর কিতাবে আমাদের ওপর শুধু নামাজ ফরজ করেছেন; কিন্তু নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত হতে হবে এবং এসব গুণ ও শর্তবিশিষ্ট হতে হবে, এমন কিছু আমার জানা নেই (যেগুলো বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে, ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবে রয়েছে)। কারণ, এ বিষয়ে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে কিছু নেই এবং রাসূল থেকে তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়।

এভাবে যে সকল খারেজী শুধু দিনের দুই প্রান্তে নামাজের কথা বলে, তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফের।'[১০৪]

চতুর্থ বিষয় : মৌখিকভাবে সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি প্রদান

ঈমানের চতুর্থ বিষয় হচ্ছে, অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোর মৌখিকভাবে সাক্ষ্য দেওয়া এবং স্বীকারোক্তি প্রদান করা। হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে, এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।...'[১০৫]

কুরআনে কারীমে এসেছে,

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'আল্লাহ স্বয়ং এবং ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানীগণও এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নন। তাঁর ক্ষমতা পরিপূর্ণ এবং

১০৪. আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, ২/৬১২
১০৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮

হিকমতও পরিপূর্ণ।'[১০৬]

ইমাম আবু হানীফা রাহ. 'আল-ওসিয়্যাহ'-তে ও ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর বিখ্যাত 'আকীদা' গ্রন্থে লেখেন,

وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ.

'ঈমান হলো মৌখিক স্বীকারোক্তি দেওয়া এবং আন্তরিক বিশ্বাস করা।'

ইমাম আবুল মুঈন নাসাফী রাহ. (মৃ. ৫০৮ হি.) লেখেন,

الإيمان: هو الإقرار باللسان، والتصديق بالقلب عند أكثر أهل السنة والجماعة.

'অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহর মতে ঈমান হলো, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আন্তরিক বিশ্বাস।'[১০৭]

তিনি অন্য কিতাবে লেখেন,

وهو أن يصدق الرسول فيما جاء به من عند الله تعالى، فمن أتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار يحتاج إليه ليقف عليه الخلق فيجروا عليه أحكام الإسلام. هذا هو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله، وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله، وهو أصح الروايتين عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله.

'ঈমান হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা বিশ্বাস করা। যে ব্যক্তি এমন বিশ্বাস পোষণ করবে, সে আল্লাহর কাছে মুমিন বলে বিবেচিত হবে। আর মৌখিক স্বীকারোক্তি দেওয়া এ কারণে প্রয়োজন যে, মানুষ যাতে তার ঈমানের ব্যাপারে অবগত হয়ে তার ওপর ইসলামের বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে পারে। এটিই ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে বর্ণিত। আর আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ.-ও এই মত পোষণ করেছেন এবং আবুল হাসান আশআরী রাহ. থেকে বর্ণিত দুটি মতের মধ্যে এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত।'[১০৮]

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) বলেন,

واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أن يعتقد أنه متى طولب به أتى به، فإن طولب به فلم يقر فهو كفر عناد، وهذا ما قالوا: إن ترك العناد شرط، وفسروه به.

'মৌখিক স্বীকারোক্তিকে যারা (ঈমানের সংজ্ঞায়) অন্তর্ভুক্ত করেননি, তারা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, যখন তার কাছে ঈমানের মৌখিক স্বীকারোক্তি তলব করা

---

১০৬. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৮
১০৭. বাহরুল কালাম, পৃষ্ঠা ১৪৯
১০৮. আত-তামহিদ লি কাওয়াদিত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ৩৭৮

হবে, তখন সে স্বীকারোক্তি প্রদান করবে। যদি তার কাছে মৌখিক স্বীকারোক্তি তলব করা সত্ত্বেও সে প্রদান না করে, তাহলে তা কুফরে ইনাদ হবে।

আর তারা (ফকীহগণ) যে বলেছেন, ঈমানের একটি শর্ত হলো "ইনাদ" পরিহার করা, এর ব্যাখ্যা তারা এটাই করেছেন। অর্থাৎ মৌখিক স্বীকারোক্তি তলব করা হলে তা প্রদান করা।'[১০৯]

সুতরাং এ জগতে মুসলিম হিসেবে কারও বিবেচিত হতে অপরিহার্য শর্ত হলো, প্রয়োজনের সময় তাকে মৌখিক স্বীকারোক্তি দিতে হবে।

অন্তরের বিশ্বাস ছাড়া শুধু মুখে সাক্ষ্য দিলে বা দাবি করলেই ঈমানদার হওয়া যায় না

কুরআনে কারীমে এসেছে,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

'বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বলুন, তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বলো, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। (কারণ,) ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।'[১১০]

অর্থাৎ গ্রাম্য কিছু লোক মৌখিকভাবে কালেমা পড়েই নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করছিল, অথচ তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, কেবল মুসলিমদের মতো অধিকার লাভ করা। এ আয়াতে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সাচ্চা মুসলিম হওয়ার জন্য কেবল মুখে কালেমা পড়ে নেওয়া যথেষ্ট নয়; বরং মনেপ্রাণে বিষয়গুলো বিশ্বাস করতে হবে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ

'হে রাসূল! যারা কুফরের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, তারা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। অর্থাৎ সেই সব লোক, যারা মুখে তো বলে ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি।'[১১১]

এ জন্যই হাদীসে অন্তরকে আসল ও মূল বলা হয়েছে। নুমান ইবনে বশীর রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ

১০৯. আল-মুসায়ারাহ (খাতিমা), পৃষ্ঠা ২৭৯
১১০. সূরা হুজুরাত, (৪৯) : ১৪
১১১. সূরা মায়েদা, (৫) : ৪১

الْقَلْبُ.

'জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি মাংশখণ্ড আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। আর জেনে রাখো, সেই মাংসখণ্ডটি হলো কলব বা অন্তর।'[১১২]

ইমাম আবু বকর কাসানী রাহ. (মৃ. ৫৮৭ হি.) লেখেন,

ولا خلاف أن التصديق بالقلب ركن للإيمان حتى لا يصير العبد مؤمنا بدونه، وإن أقر بلسانه.

'মুখে স্বীকৃতি প্রদান করলেও মনেপ্রাণে বিশ্বাস ছাড়া বান্দা মুমিন হতে পারে না। কারণ, এটা ঈমানের এমন রুকন, যা নিয়ে কারও দ্বিমত নেই।'[১১৩]

অন্তরের বিশ্বাস ও বক্তব্য-বিবৃতি এবং কলম দ্বারা আকুতি-সম্মতি প্রকাশ্য-গোপনে সর্বত্র একই হতে হবে

মুআয রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

'যে কেউ অন্তরের সত্যবাদিতার সাথে এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।'[১১৪]

অন্য হাদীসে আরও সুস্পষ্টভাবে এসেছে,

وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا، يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ. أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يتعقبه الذهبي.

'আমার সুপারিশ হবে ওই ব্যক্তির জন্য, যে ইখলাসের সাথে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সাথে তার অন্তর তার মুখকে সত্যায়ন করে এবং তার মুখ তার অন্তরকে সত্যায়ন করে।'[১১৫]

পক্ষান্তরে প্রকাশ্যে মৌখিক সাক্ষ্য, সম্মতি ও স্বীকৃতির সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস মিল না থাকে, তাহলে কুরআনের ভাষায় একে 'নেফাক' বলে। নেফাক কুফরের একটা প্রকার এবং নেফাককে কুফর হতেও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্বন্ধে বলেন,

---

১১২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯৯; ফাতহুল বারী, ইবনে রজব হাম্বলী, ১/২২৯
১১৩. আল-মু'তামাদ মিনাল মু'তাকাদ, পৃষ্ঠা ৬৯
১১৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৮; মুসলিম, হাদীস নং ৩২
১১৫. মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ২৩৩, সনদ সহীহ

إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ

'যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'[১১৬]

ইমাম আবু হানীফা রাহ. আয়াতটির ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেন,

والإقرار وحده لا يكون إيمانا، لأنه لو كان إيمانا: لكان المنافقون كلهم مؤمنين.

'শুধু মৌখিক স্বীকৃতির নাম ঈমান নয়। কারণ, তা যদি ঈমান হতো তাহলে সকল মুনাফিক মুমিন হতো।'[১১৭]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ

'তারা (মুনাফিকরা) তাদের মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। তারা যা কিছু লুকায়, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।'[১১৮]

অন্যত্র এসেছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

'কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি। অথচ (প্রকৃতপক্ষে) তারা ঈমানদার নয়।'[১১৯]

ইমাম আবু মনসুর মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.) এই আয়াত উল্লেখ করে বলেন,

نفى أن يكون الذين قالوا بألسنتهم إيمانا، إذا خالفت قلوبهم ذلك.

'যারা অন্তরে বিশ্বাস না রেখে মৌখিকভাবে ঈমানের দাবি করেছিল, আল্লাহ তাআলা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।'[১২০]

এভাবে মুনাফিকরা প্রকাশ্যে নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করত; কিন্তু আন্তরিকভাবে তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি।

---

১১৬. সূরা মুনাফিকূন, (৬৩) : ১
১১৭. আল-ওসিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১২৩
১১৮. আলে ইমরান, (৩) : ১৬৭
১১৯. সূরা বাকারা, (২) : ৮
১২০. কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ২৬৯; বাহরুল কালাম, নাসাফী, পৃষ্ঠা ১৫৩

শানে নুযুল

হযরত আলী রাযি. মুনাফিক-সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথিদের বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং মুনাফিকি পরিত্যাগ করো। বাহ্যত মুসলমান আর অন্তরে কুফর, এটা অত্যন্ত জঘন্য।

উত্তরে সে বলল, আপনি আমাদের প্রতি এমন ধারণা পোষণ করেন! আমরা তো মুসলমান, আমরা তো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখি। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে এ আয়াত নাযিল করেন।[১২১]

তাদের আরেকটি রূপ ও চিত্র হচ্ছে, তারা প্রকাশ্যে ও স্বদেশে মুসলমানদের সাথে এক রকম লিখে ও বক্তব্য-বিবৃতি দেয়, আর গোপনে বা বিদেশে ভিন্ন রকম বলে ও কলম চালায়। এদের উক্ত চিত্র কুরআনে কারীমে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

'আর এরা যখন ঈমানদারদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদেরই সঙ্গে আছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র।'[১২২]

অনেক বেশি আমলকারীও ঈমানবিহীন হতে পারে

আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ... يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

'আমার উম্মত থেকে এমন একদল লোক বের হবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তোমাদের কিরাত তাদের কিরাতের সামনে কিছুই নয়, তোমাদের নামাজ তাদের নামাজের তুলনায় কিছুই নয় এবং তোমাদের রোযা তাদের রোযার তুলনায় কিছুই নয় (অর্থাৎ তোমাদের চেয়ে ভালো ও বেশি হবে)...। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যায়।'[১২৩]

প্রিয় পাঠক, বর্তমানে এর চিত্র একেবারেই সুস্পষ্ট। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও তাহাজ্জুদ আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াতের দাবিকারীর আচরণ-উচ্চারণে, বক্তব্য-বিবৃতিতে ও কলমের কালিতে এমন কিছু প্রকাশ পাচ্ছে, যা সর্বসম্মত আকীদা-বিরোধী ও সরাসরি ঈমান বিনষ্টকারী।

---

১২১. বয়ানুল কুরআন।

১২২. সূরা বাকারা, (২) : ১৪

১২৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৬৬

পঞ্চম বিষয় : আনুগত্য অবধারিত বা পালনীয় হিসেবে মেনে নেওয়া

মুমিন হওয়ার জন্য শুধু ইসলাম ও নবীর সত্যতা সম্পর্কে জানা এবং তা সঠিক ব্যাখ্যাসহ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস পোষণ ও মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করলে হবে না; বরং এগুলোর সাথে ইসলামের বিধানাবলির প্রতি আনুগত্য করা নিজের ওপর অবধারিত এবং পালনীয় হিসেবে মেনে নেওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। যাকে 'ইলতিযামুত তা'আহ' বা 'ইলতিযামুল ইনকিয়াদ' বলা হয়। এটা ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়।

কাজেই ইসলামের বিধানাবলির প্রতি আনুগত্য এবং তা পালনীয় হিসেবে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করা না হলে মুমিন হওয়া যাবে না।

তবে কেউ পালনীয় হিসেবে মেনে নেওয়ার পর যদি সে অনুযায়ী আমল না করে, তাহলে ফাসেক ও গুনাহগার হলেও ঈমানহারা হবে না।

হাদীসে এসেছে,

وَكَتَبَ قَيْصَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنِّي مُسْلِمٌ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ: «كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَهُوَ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ»، وَقَسَمَ الدَّنَانِيرَ.

'রোম-সম্রাট হিরকিল (হিরাক্লিয়াস) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিজেকে মুসলিম দাবি করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর দুশমন সে মিথ্যা বলেছে। (প্রকৃতপক্ষে) সে মুসলিম নয়; বরং খ্রিষ্টান রয়ে গেছে।'[১২৪]

তাকে মুসলিম না বলার কারণ হচ্ছে, ইসলামের বিধানাবলির প্রতি আনুগত্য নিজের ওপর অবধারিত হওয়ার এবং তা পালনীয় হিসেবে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি তার ছিল না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সে মুমিন-মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি।

এভাবে আবু তালেব রাসূলের শানে ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে প্রশংসা ও স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা আবৃত্তি করা সত্ত্বেও তাকে মুমিন হিসেবে গণ্য করা হয়নি। যেমন : তিনি বলেছেন,

ودعوتَني وزعمتُ أنَّكَ صادِق — وصدقتَ فيه وكنتَ ثَمَّ أمينا
وعرفتُ دينَك لا محالةَ أنه — من خيرِ أديانِ البَرِيَّةِ دينا
لولا الملامةُ أو حَذَار مَسَبَّةٍ — لوجدتَّني سمحا بذاك مُبينا

'তুমি আমাকে (ইসলামের) দাওয়াত দিয়েছ। আর আমি মনে করি যে, তুমি সত্যবাদী।

১২৪. সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৪৫০, সনদ সহীহ

তুমি এতে সত্য বলেছ এবং এতে তুমি আমানতদার।
আর আমি জানি, তোমার ধর্ম পৃথিবীর সর্বোত্তম দ্বীন।

তিরস্কার বা সমালোচনার আশঙ্কা যদি না হতো, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে এর পূর্ণ আনুগত্যকারীরূপে পেতে।'

একই কারণে বিভিন্ন সময় অমুসলিমরা ইসলাম ধর্ম ও রাসূলের প্রশংসা করা সত্ত্বেও তাদেরকে মুমিন হিসেবে গণ্য করা হয়নি।[১২৫]

সুতরাং যে সকল সেকুলার ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসীরা অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি, সমাজ, বিচার, রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থায় ইসলামী বিধি-বিধানকে কোনো দ্বিধা ছাড়া সর্বোচ্চ আইন হিসেবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রদান করে তা আনুগত্য করা নিজেদের ওপর অবধারিত এবং পালনীয় হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না, তারা নিজেদের কীভাবে মুমিন হিসেবে গণ্য করে!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'(হে নবী!) আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে। এরপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং (আকল ও অন্তর দিয়ে) পালনীয় হিসেবে তা মেনে নেয়।'[১২৬]

এ আয়াতের তাফসীরে হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. (মৃ. ৩৭০ হি.), শাফেয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত মুফাসসির ফখরুদ্দীন রাযী রাহ. (মৃ. ৬০৬ হি.) ও হাম্বলীদের ইবনে আদিল রাহ. (মৃ. ৭৭৫ হি.) লেখেন,

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْ أَوَامِرِ اللهِ تَعَالَى أَوْ أَوَامِرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، سَوَاءٌ رَدَّهُ مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِيهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقَبُولِ وَالِامْتِنَاعِ مِنَ التَّسْلِيمِ.

'এই আয়াতের ভাষ্য হলো, যে কেউ আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের কোনো বিধান প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাবে। সন্দেহবশত তা প্রত্যাখ্যান করুক, কিংবা মেনে না নিয়ে ও আত্মসমর্পণ না করে (তথা বিধান অনুযায়ী চলা আবশ্যক ও আনুগত্য

---

১২৫. ফাতহুল বারী, ৮/৯৫; ফয়যুল বারী, ১/১২৫-২৬; ইনআমুল বারী, ১/৩০৩-৪; আহসানুল ফাতাওয়া, ১/৬০-৬৫

১২৬. সূরা নিসা, (৪) : ৬৫

করা অবধারিত মনে না করে) প্রত্যাখ্যান করুক—এ সবই সমান।'[১২৭]

আর হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) বলেছেন, 'ইসলামী বিধি-বিধানকে কোনো দ্বিধা ছাড়া সত্য ও সুপ্রিম আইন হিসেবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা এবং মৌখিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা উভয়টা ঈমানের অংশ; এ দুইটার কোনো একটা বাদ দেওয়া কুফর। তবে দুইটাই থাকার পর আমলে বাস্তবায়ন না করলে ফাসেক হবে।'[১২৮]

কাজেই বাংলাদেশ সংবিধানের ৭ (১) অনুচ্ছেদে যে, 'এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।'—বক্তব্যটি কোনো ঈমানদার পালনীয় হিসেবে মেনে নিতে পারে না।

কারণ, অন্য কোনো আইনের মধ্যে কুরআনের আইনও অন্তর্ভুক্ত। তবে হ্যাঁ, কুরআনের আইনকে যদি অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, তাহলে সমস্যা নেই। কিন্তু বাস্তবতা ও বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতা বলছে ভিন্ন কথা।

আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রাহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেন,

وَلَيْسَتْ حَقِيقَةُ التَّصْدِيْقِ أَنْ تَقَعَ فِي الْقَلْبِ نِسْبَةُ الصِّدْقِ إِلَى الْخَبَرِ، أَوْ الْمُخْبِرِ مِنْ غَيْرِ إِذْعَان وَقَبُوْل؛ بَلْ هُوَ إِذْعَانٌ وَقَبُوْل ذَلِكَ، بِحَيْثُ يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْم التَّسْلِيْم، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الإِمَام الْغَزَّالِي. وَبِالْجُمْلَة: اَلْمَعْنَى الَّذِيْ يُعَبَّر عَنْهُ بِالْفَارِسِيَّة بـ«گرويدن».

'বিশ্বাস করার বাস্তবতা এটা নয় যে, তা গ্রহণ ও আনুগত্য ব্যতীত শুধু অন্তরে সংবাদ (কুরআন-সুন্নাহ) বা সংবাদদাতাকে (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল) সত্য হিসেবে বিশ্বাস করা হবে; বরং সত্যায়ন হলো, সত্যায়িত বিষয়ের আনুগত্য করা এবং তা এমনভাবে গ্রহণ করে নেওয়া, যার ব্যাপারে "আত্মসমর্পণ" বা "মেনে নেওয়া" শব্দ বলা যায়, যেমনটা ইমাম গাযালী রাহ. স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

সারকথা, সত্যায়নের অর্থ হলো, ফারসি ভাষার گرویدن শব্দের অনুরূপ।'[১২৯]

উল্লেখ্য, ফারসিতে گرویدن শব্দের অর্থ হলো 'ফরমাঁবরদার' তথা আনুগত্যকারী, 'মুতী' তথা অনুগত।

আবু হানীফা রাহ.-এর নামে প্রচলিত 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে আছে,

والإسلام: هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى.

---

১২৭. আহকামুল কুরআন, ২/২৬৮; মাফাতীহুল গায়ব বা আত-তাফসীরুল কাবীর, ১০/১২৪ ও আল-লুবাব ফী উলূমিল কিতাব, ৬/৪৫৬

১২৮. বয়ানুল কুরআন থেকে সারাংশ, ১/৫৫৯

১২৯. শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২০৪

CamScanner

'ইসলাম মানেই হলো আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করা ও আনুগত্য করা (তথা আকল ও অন্তর দিয়ে মেনে নেওয়া)।'[১৩০]

ষষ্ঠ বিষয় : ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য সকল ধর্ম-কর্ম, মতবাদ ও আদর্শ থেকে বিমুখতা ও সম্পর্কহীনতা আবশ্যকীয়

ঈমান শুধু গ্রহণের নাম নয়, সাথে বর্জনও করতে হয়। হক ও সত্যকে গ্রহণ এবং বাতিল ও মিথ্যাকে বর্জনের নাম ঈমান। কারণ, কোনো কিছু গ্রহণ ও মেনে নিতে হলে তার বিপরীত বিষয় বর্জন ও অস্বীকার করতে হয়। অন্যথায় তা হবে স্ববিরোধিতা, যা কোনো সুস্থ বিবেক গ্রহণ করতে পারে না।

সুতরাং ঈমানদার হতে হলে তাওহীদ-ঈমান গ্রহণের পাশাপাশি যাবতীয় শিরক-কুফর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা অপরিহার্য এবং ইসলাম-বিরোধী সকল ধর্ম-কর্ম, মতবাদ ও আদর্শ থেকে বিমুখতা ও সম্পর্কহীনতা প্রদর্শন করা এবং এগুলো অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা আবশ্যকীয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ

'নিঃসন্দেহে সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এরপর যে ব্যক্তি তাগূতকে (তথা ইসলামের বিপরীত অন্য সব ধর্ম, মতবাদ ও আদর্শকে) অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে নিশ্চিত এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।'[১৩১]

ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. (মৃ. ১৮৯ হি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

روي عن الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أنه ذكر مسألة في كتاب المنتقى أن الرجل إذا قال: لا إله إلا الله ولم يتبرأ عن الكفر فإنه يكون منافقا، لأن التبرئ عن الكفر شرط لصحة الإيمان بدليل قوله تعالى: فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

'কেউ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে, অথচ কুফর থেকে সম্পর্কহীনতা প্রদর্শন করে না, তাহলে সে মুনাফিক। কেননা, ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কুফর থেকে সম্পর্কহীন হওয়া আবশ্যক। দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি তাগূতকে (কুফর) অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে নিশ্চিত

---

১৩০. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ৩৮-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৭৫

১৩১. সূরা বাকারা, (২) : ২৫৬

এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল।"'[১৩২]

উক্ত আয়াতের মতো আমাদের ঈমানের কালেমার মধ্যেও দুটি অংশ :

১. 'লা-ইলাহা' তথা আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন-ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম, বাতিল মতবাদ ও আদর্শকে অস্বীকার করা।

২. 'ইল্লাল্লাহ' তথা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর দ্বীন-ইসলামকেই বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

প্রখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) 'শারহু মাআনীল আসার' গ্রন্থে باب ما يكون الرجل به مسلما (মানুষ যেভাবে মুসলিম হবে) শিরোনামে লম্বা আলোচনা করেছেন। তিনি এটার ইতি টেনেছেন এভাবে,

ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَتَخَلَّ مِمَّا سِوَى الْإِسْلَامِ، لَمْ يعْلَمْ بِذَلِكَ دُخُوله فِي الْإِسْلَامِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

'এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য সব ধর্ম ও মতবাদ পরিত্যাগ না করে, তাহলে সে ইসলামে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিমাহুমুল্লাহর অভিমত।'[১৩৩]

হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ বাজালী রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন,

تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُصَلِّي الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِ، وَتَبَرَّأُ مِنَ الْكَافِرِ. رواه أحمد، وقال المحققون: حديث صحيح.

'তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে সামান্য শিরকও করবে না, ফরজ নামাজ আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করবে এবং কাফের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।'[১৩৪]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ.

'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। কারণ, তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া

১৩২. আত-তামহীদ, আবুশ শাকুর সালিমী, পৃষ্ঠা ১০৮; সূরা বাকারা, (২) : ২৫৬
১৩৩. দ্র. শারহু মাআনীল আসার ৩/২১৩-২১৬, ৫১৩০ নং হাদীসের অধীনে
১৩৪. মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৯১৫৩, সহীহ হাদীস

যাদের উপাসনা করো তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকীদা-বিশ্বাস) অস্বীকার করি। তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।'[১৩৫]

সহীহ হাদীসে এসেছে, ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন,

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ...

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি জিনিসের ওপর ইসলামের ভিত্তি। আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সবকিছু অস্বীকার করা...।'[১৩৬]

অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ: حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যতকিছুর ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করবে, তার মাল ও রক্ত হারাম তথা নিরাপদ।'[১৩৭]

ইমাম বুখারী রাহ. (মৃ. ২৫৬ হি.) 'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থে একজন মুমিনের জন্য কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় অপছন্দ করাটা ঈমানের অঙ্গ উল্লেখ করে এ হাদীস বর্ণনা করেন যে,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ.

'আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে :

১. যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়।

২. যে একমাত্র আল্লাহর জন্যই কোনো বান্দাকে মহব্বত করে।

৩. এবং যাকে আল্লাহ তাআলা কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অতঃপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে।'[১৩৮]

---

১৩৫. সূরা মুমতাহিনা, (৬০) : ৪
১৩৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬
১৩৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩
১৩৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১

সারকথা, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য ধর্ম-কর্ম, বাতিল মতবাদ ও আদর্শের প্রতি আকর্ষণ ও মুগ্ধতা থাকলে কিংবা ধর্মহীনতা গ্রহণ করলে মুমিন হওয়া যাবে না। কারণ, এগুলো সবই কুফর। সুতরাং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সব ক্ষেত্রে একমাত্র ইসলাম গ্রহণ আর ইসলাম ছাড়া অন্য সব বর্জন—এ দুইটা বিষয় একই সাথে অবলম্বন করলেই কেবল ঈমান অস্তিত্ব লাভ করবে।

কেননা, ইসলামবিরোধী বা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য ধর্ম ও বাতিল মতবাদ ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়। তো ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় আর ঈমান একত্র হতে পারে না। যেভাবে ওযু-নামাজ ভঙ্গের কারণ পাওয়া যাওয়া আর ওযু-নামাজ ঠিক থাকা একসাথে হতে পারে না। কিন্তু আমরা ওযু-নামাজেরটা বুঝি, ঈমানেরটা বুঝি না। ফলে ওযু-নামাজের বিষয়ে যতটা সচেষ্ট থাকি, ঈমানের বিষয়ে ততই অবহেলা করি!

ইমাম ইবনুল মুনযির রাহ. (মৃ. ৩১৯ হি.) বলেন,

وأجمع أهل العلم على أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن كل ما جَاءَ به مُحَمَّد حق، ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام، وهو بالغ صحيح العقل: أنه مسلم.

'আহলে ইলমের সর্বসম্মত বক্তব্য হচ্ছে, একজন সাবালক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন কাফের যদি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সব সত্য, আর ইসলাম ধর্মের বিপরীত যত ধর্ম আছে সবগুলো থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহলে সে মুসলিম।'[১৩৯]

আল্লামা হাসকাফী রাহ. (মৃ. ১১৮৮ হি.) লেখেন,

(وَإِسْلَامُهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ عَنْ الْأَدْيَانِ) سِوَى الْإِسْلَامِ (أَوْ عَمَّا انْتَقَلَ إلَيْهِ) بَعْدَ نُطْقِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ؛ وَلَوْ أَتَى بِهِمَا عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَا لَمْ يَتَبَرَّأْ، بَزَّازِيَّةٌ.

'তার (মুরতাদ ব্যক্তির) ইসলাম গ্রহণের পন্থা হলো, সে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার পর ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম থেকে কিংবা ইসলাম ছেড়ে যে ধর্মে সে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তার থেকে বিমুখ হবে ও সম্পর্ক ছিন্ন করবে। স্বাভাবিকভাবে যদি সে শুধু তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না সম্পর্ক ছিন্ন করবে।'[১৪০]

ইসলাম অন্য সব ধর্ম থেকে বিমুখ হওয়া ও সম্পর্ক ছিন্ন করাকে এতই গুরুত্ব দিয়েছে যে, কেউ যদি বিধর্মীদের বিশেষ প্রতীক বা কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তাহলে সে কাফের সাব্যস্ত হবে।

১৩৯. আল-ইকনা', ইবনুল মুনযির, ২/৫৮৮; আল-ইকনা' ফী মাসায়িলিল ইজমা', ইবনুল কাত্তান, ১/৩৪
১৪০. ফাতাওয়া শামী, বাবুল মুরতাদ; এই বক্তব্য 'আল-হিদায়া' (২/৪৩৪-৩৫)-সহ অনেক কিতাবে রয়েছে।

CamScanner

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ মাওসিলী রাহ. (মৃ. ৬৮৩ হি.) লেখেন,

ان الإتيان بخاصية الكفر يدل على الكفر، فإن من سجد لصنم أو تزيا بزنار أو لبس قلنسوة المجوس: يحكم بكفره.

'কুফরের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা কুফরের ওপর প্রমাণ বহন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মূর্তিকে সিজদা করবে, বিধর্মীদের (ধর্মীয় পরিচায়ক) বিশেষ ফিতা বা বেল্ট ব্যবহার করবে কিংবা অগ্নিপূজারিদের টুপি পরিধান করবে, তাকে কাফের বলা হবে।'[১৪১]

আল্লামা তাফতাযানী রাহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) ঈমানের আলোচনায় লেখেন,

فَلَوْ حَصَلَ هَذَا الْمَعْنَى لِبَعْضِ الْكُفَّارِ: كَانَ إِطْلَاقُ اِسْمِ الْكَافِرِ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ أَمَارَاتِ التَّكْذِيبِ وَالإِنْكَارِ، كَمَا إِذَا فَرَضْنَا: أَنَّ أَحَدًا صَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَلَّمَهُ وَأَقَرَّ بِهِ وَعَمِلَ، وَمَعَ ذَلِكَ شَدَّ الزُّنَّارَ بِالاخْتِيَارِ، أَوْ سَجَدَ لِلصَّنَمِ بِالاخْتِيَارِ: نَجْعَلُهُ كَافِرًا؛ لِمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَامَةَ التَّكْذِيبِ وَالإِنْكَارِ.

'এই (ঈমানের) বৈশিষ্ট্য যদি কোনো কাফেরের অর্জিত হয়, তাহলে তার ওপর "কাফের" শব্দ প্রয়োগ করা হবে এই বিবেচনায় যে, তার মধ্যে নাকচ ও অস্বীকারের প্রতীক রয়েছে। যেমন ধরুন, কেউ নবীর আনীত সবকিছু সত্যায়ন করল, স্বীকারোক্তিও দিল এবং তা অনুযায়ী আমলও করল; কিন্তু এর সাথে সে ইচ্ছাকৃতভাবে (বিধর্মীদের ধর্মীয় বিশেষ প্রতীক) বেল্ট বাঁধল বা স্বেচ্ছায় মূর্তিকে সিজদা করল, তাহলে আমরা তাকে কাফের বলে গণ্য করব। কারণ, নবী এগুলোকে নাকচ ও অস্বীকারের প্রতীক সাব্যস্ত করেছেন।'[১৪২]

তিনি এর আগের আলোচনায় বলেন,

وَلَانِزَاعَ فِيْ أَنَّ مِنَ الْمَعَاصِيْ مَا جَعَلَهُ الشَّارِعُ أَمَارَةً لِلتَّكْذِيبِ، وَعُلِمَ كَوْنُهُ كَذَلِكَ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، كَسُجُوْدِ الصَّنَمِ، وَإِلْقَاءِ الْمُصْحَفِ فِي الْقَاذُوْرَاتِ، وَالتَّلَفُّظِ بِكَلِمَاتِ الْكُفْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا ثَبَتَ بِالأَدِلَّةِ أَنَّهُ كُفْرٌ. وَبِهَذَا يَنْحَلُّ مَا يُقَالُ: إِنَّ الإِيْمَانَ إِذَا كَانَ عِبَارَةً عَنِ التَّصْدِيْقِ وَالإِقْرَارِ، يَنْبَغِيْ أَنْ لَا يَصِيْرَ الْمُؤْمِنُ الْمُقِرُّ الْمُصَدِّقُ كَافِرًا بِشَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الْكُفْرِ وَأَلْفَاظِهِ، مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ التَّكْذِيْبُ أَوِ الشَّكُّ.

'এ বিষয়ে মতভেদ নেই যে, কিছু গুনাহকে শরীয়ত কুফরের আলামত আখ্যা দিয়েছে এবং তা কুফর হওয়া শরয়ী দলীল দ্বারাও প্রমাণিত, যেমন : মূর্তিকে সিজদা করা, কুরআনকে ময়লায় নিক্ষেপ করা, কুফরী কালেমা উচ্চারণ করা বা এ-জাতীয় যে

১৪১. আল-ইখতিয়ার লি-তা'লীল মুখতার, ৪/১৫০; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১/৪৬
১৪২. শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২০৫

সকল বিষয় কুফর হওয়া দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

সুতরাং ঈমান যদিও সত্যায়ন ও স্বীকৃতির নাম, কিন্তু সত্যায়নকারী ও স্বীকৃতি প্রদানকারীর কাছ থেকে যদি কোনো কুফরী কাজ বা কথা প্রকাশ পায়, তাহলে সে কাফের বলে গণ্য হবে। যদিও সে অবিশ্বাস না করে বা সন্দেহ পোষণ না করে।'

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) বলেন,

اعتبر في ترتيب لازم الفعل وجود أمورٍ، عدمُها مترتِّب ضده كتعظيم الله تعالى وأنبيائه وكتبه وبيته، وترك السجود للصنم ونحوه، والانقياد وهو الاستسلام إلى قبول أوامره ونواهيه الذي هو معنى الإسلام. وقد اتفق أهل الحق، وهم فريقا الأشاعرة والحنفية على أنه لا إيمان بلا إسلام، وعكسه، فيمكن اعتبار هذه الأمور أجزاء لمفهوم الإيمان، فيكون انتفاء ذلك اللازم عند انتفائها لانتفاء الإيمان، وإن وُجِد التصديق.

'কারও ওপর ঈমানের অপরিহার্য বিধি-বিধান আরোপ করতে কিছু বিষয় বিদ্যমান থাকতে হবে, যা না থাকলে ঈমানের বিপরীত বিষয় (তথা কুফর) সাব্যস্ত হবে। যেমন : আল্লাহ তাআলা, তাঁর নবীগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর ঘরকে সম্মান করা, মূর্তি ও এ-জাতীয় জিনিসের সিজদা বর্জন করা এবং আনুগত্য করা তথা আল্লাহর আদেশ-নিষেধসমূহ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিজেকে সঁপে দেওয়া ইত্যাদি।

হকপন্থী উভয় দল—আশআরী ও হানাফীগণ (মাতুরীদী) ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ঈমান ও ইসলাম একটি ছাড়া অপরটি সাব্যস্ত হয় না। অতএব উল্লিখিত বিষয়সমূহকেও ঈমানের অংশ (বা জরুরি বিষয়) হিসেবে বিবেচনা করা দরকার।

সুতরাং কারও বিশ্বাস পাওয়া যাওয়ার পরও উল্লিখিত বিষয়সমূহ অবিদ্যমান থাকার কারণে ঈমান নেই সাব্যস্ত হবে। (কারণ, উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিদ্যমান থাকা ঈমানের জন্য অপরিহার্য।)'[১৪৩]

ঈমানের জন্য উল্লিখিত বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত থাকা শর্ত কেন?

কুরআনের ঘোষণামতে পৃথিবীর সকল মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত : হয়তো মুমিন, নয়তো কাফের।[১৪৪]

কাজেই ঈমান ও কুফর পরস্পর বিপরীত বিষয়। আর এমন দুটি বিষয় যেভাবে কারও মধ্যে একসঙ্গে একত্রিত হওয়া অসম্ভব, সেভাবে কেউ উভয়টা থেকে মুক্ত হওয়াও অসম্ভব।

সুতরাং ঈমান বিবেচ্য হতে সেসব বিষয় থেকে মুক্ত থাকা শর্ত, যা কুফরের প্রতীক,

১৪৩. আল-মুসায়ারাহ (খাতিমা), পৃষ্ঠা ২৭৯; আত-তামহীদ, আবুশ শাকুর সালিমী, পৃষ্ঠা ১০৮
১৪৪. সূরা তাগাবুন, (৬৪) : ২

চিহ্ন বা নিদর্শন বহন করে। আকীদা ও ফিকহের অনেক ইমামের বক্তব্যেই একত্রে বা বিক্ষিপ্তভাবে এ শর্তগুলোর আলোচনা এসেছে।

সপ্তম বিষয় : শরীয়তের করণীয়-বর্জনীয় মতে আমল করা

মুমিন হওয়ার জন্য উল্লিখিত অপরিহার্য শর্ত ও বিষয়গুলো করার পর শরীয়তের করণীয়-বর্জনীয় মতে আমল করা। এর নামই হচ্ছে, পরিপূর্ণ ঈমান ও প্রকৃত ইসলাম।

সুতরাং মুমিন হতে হলে প্রথম ছয়টি বিষয় আবশ্যকীয়, আর সাত নম্বরটি হলো পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য। আর পরিপূর্ণ মুমিনকে প্রকৃত মুসলিম বলা হয়। কেননা, ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে, আত্মসমর্পণ করা এবং অনুগত ও তাবেদার হওয়া। আল্লাহপ্রদত্ত এ ধর্মকে 'ইসলাম' নামে অভিহিত করার কারণ হলো, এ ধর্মের অনুসারী ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার কাছে সমর্পণ করে ও তাঁর যাবতীয় আদেশ শিরোধার্য করে। তাই এর অনুসারীকে মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী বলে। কাজেই ঈমানের স্থান অন্তর, আর ইসলামের স্থান অন্তরসহ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

আমল ঈমানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত কি না

মুহাদ্দিসীন আমলকে ঈমানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে আশআরী-মাতুরীদী ও ফুকাহায়ে কেরাম করেন না। কারণ, তারা বলেন, 'আমল' হলো ঈমানকে পূর্ণাঙ্গরূপ দানকারী বিষয়, যাকে 'ইসলাম' বলা হয়। 'ঈমান' আর 'ইসলাম'-এর মাঝে পার্থক্য হলো, ঈমান ছাড়া ইসলাম গ্রহণযোগ্যই হয় না, আর ইসলাম ছাড়া ঈমান পূর্ণতা পায় না।

মুহাদ্দিস এবং মুতাকাল্লিমীন বা আশআরী-মাতুরীদী ও ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে এই মতানৈক্য মূলত সে সময়ের অবস্থার প্রেক্ষিতে হয়েছে। ফুকাহা-মুতাকাল্লিমীনের বিপরীতে ছিল খারেজী সম্প্রদায়। ফলে তারা খারেজীদের ফিতনা রোধ করতে আমলকে ঈমানের অংশ বলতেন না। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিসীনের বিপরীতে সে সময় ছিল মুরজিয়ারা। তাই মুহাদ্দিসীন মুরজিয়াদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমলকে ঈমানের অংশ বলতেন।

ইমাম কাশ্মীরী রাহ. (মৃ. ১৩৫৩ হি.) এ বিষয়টা চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, 'সালাফের মতে ঈমান হচ্ছে তিনটি বিষয়ের সমষ্টি : ১. বিশ্বাস, ২. স্বীকারোক্তি, ৩. আমল।

প্রথম দুই বিষয় নিয়ে আলোচনা গেছে। আর আমল ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ কি না, এ ব্যাপারে চারটি মত পাওয়া যায় :

প্রথম ও দ্বিতীয় মত হলো, খারেজী ও মুতাযিলাদের সম্প্রদায়ের মতে আমল ঈমানের

অংশ। উভয় দলের মতে আমল পরিত্যাগকারী মুমিন থাকবে না।

তবে কাফের হবে কি হবে না, এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়ে গেছে। খারেজীদের মতে তারা কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু মুতাযিলাদের মতে তারা মুমিনও থাকবে না, আবার কাফেরও হবে না; বরং ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকবে।

তৃতীয় মত হলো মুরজিয়াদের। তারা বলে, আমলের কোনো প্রয়োজন নেই, নাজাতের জন্য বিশ্বাসই যথেষ্ট।

কাজেই আমলের বিষয়ে প্রথম দুই দল এবং মুরজিয়া সম্প্রদায় দুই মেরুতে অবস্থান গ্রহণ করেছে। (কেননা, প্রথম দুই দল আমলের গুরুত্ব দিতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে আমল পরিত্যাগকারীকে ঈমান থেকে বের করে দিয়েছে, আর মুরজিয়ারা আমলের কোনো গুরুত্বই বাকি রাখেনি।)

চতুর্থ দল হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, যারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন। তারা বলেন, ঈমানের জন্য আমল জরুরি বিষয়। তবে আমল পরিত্যাগকারী ফাসেক, কাফের নয়।

কাজেই তারা না খারেজী ও মুতাযিলাদের মতো সীমালঙ্ঘন করেছেন, আর না মুরজিয়াদের মতো আমলকে গুরুত্বহীন করেছেন।

অতঃপর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় :

১. অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে আমল ঈমানেরই একটি অংশ।

২. ইমাম আবু হানীফা রাহ.-সহ বেশিরভাগ ফকীহ ও মুতাকাল্লিম বলেন, আমল ঈমানের অংশ নয়। তবে উভয় দলই সর্বসম্মতিক্রমে অবিশ্বাসীকে কাফের এবং আমল ত্যাগকারীকে ফাসেক বলেন।

কাজেই এটি প্রকৃত কোনো ইখতিলাফ নয়; বরং শুধু বচনরীতি বা বলার ধরনে পার্থক্য। কারণ, সালাফ (মুহাদ্দিসগণ) যদিও আমলকে ঈমানের অংশ মনে করেন, কিন্তু এমন অংশ মনে করেন না, যার অনুপস্থিতিতে ঈমান চলে যাবে; বরং তাদের নিকটও আমল ত্যাগ করার কারণে ঈমান চলে যায় না।

আর ইমাম আবু হানীফা রাহ. আমলকে ঈমানের অংশ না বললেও এর ওপর পুরোপুরি গুরুত্ব দিয়েছেন, এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং ঈমান বৃদ্ধির কারণ বলেছেন। কাজেই তিনি মুরজিয়াদের মতো আমলকে গুরুত্বহীন করেননি।

তবে মুহাদ্দিসগণের আমল ঈমানের অংশ হওয়ার মতটি যেহেতু মুরজিয়াদের মত থেকে দূরে, কিন্তু এর তুলনায় ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মতটি মুরজিয়াদের কাছাকাছি, তাই হানাফীদের মুরজিয়া বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। এটা আমাদের

ওপর জুলুম।

যদি বক্তব্য কাছাকাছি হওয়ার কারণে আমরা মুরজিয়া হয়ে যাই, তাহলে একইভাবে মুহাদ্দিসগণও মুতাযিলা সাব্যস্ত হবেন। কারণ, মুতাযিলারাও মুহাদ্দিসগণের মতো আমলকে ঈমানের অংশ মনে করে। অথচ তাঁরা মুতাযিলা নন। যারা আমাদের ওপর মুরজিয়ার অপবাদ দিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। দ্বীন কেবল কল্যাণকামিতার নাম, কাদা ছোড়াছুড়ি এবং মন্দ উপাধি দেওয়ার নাম নয়।'[১৪৫]

প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) লেখেন,

فَالسَّلَفُ قَالُوا: هُوَ اعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ، وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، وَأَرَادُوا بِذَلِكَ: أَنَّ الْأَعْمَالَ شَرْطٌ فِي كَمَاله. وَمن هُنَا نشا لَهُم الْقَوْلُ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، وَالْمُرْجِئَةُ قَالُوا: هُوَ اعْتِقَادٌ وَنُطْقٌ فَقَطْ، وَالْكَرَّامِيَّةُ قَالُوا: هُوَ نُطْقٌ فَقَطْ، وَالْمُعْتَزِلَةُ قَالُوا: هُوَ الْعَمَلُ وَالنُّطْقُ وَالِاعْتِقَادُ، وَالْفَارِقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّلَفِ: أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْأَعْمَالَ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ، وَالسَّلَفُ جَعَلُوهَا شَرْطًا فِي كَمَالِهِ.

'ঈমানের ক্ষেত্রে সালাফের বক্তব্য অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল। এখানে সালাফ আমলকে ঈমানের বিশুদ্ধতার শর্ত ধরেননি, বরং ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার শর্ত বলেছেন। আর এ কারণেই মূলত তারা ঈমান বাড়ে-কমে বলেছেন। মুরজিয়ারা বলে, ঈমান কেবল অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকারোক্তির নাম (আমলের কোনো প্রয়োজন নেই)। মুতাযিলাদের মতে, ঈমান সালাফের কথার মতোই তিন ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো। কিন্তু মুতাযিলা ও সালাফের মাঝে পার্থক্য হলো, মুতাযিলারা আমলকে ঈমানের বিশুদ্ধতার শর্ত মনে করে, অপরদিকে সালাফ পূর্ণাঙ্গতার শর্ত মনে করেন।'[১৪৬]

আর আশআরী-মাতুরীদীরাও বলে, আমল ঈমানকে পূর্ণাঙ্গতা দেয়। আমল ছাড়া কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারে না।

সারকথা, মূল ঈমান অন্তরের বিশ্বাস। মুখের স্বীকারোক্তি দুনিয়াতে বিধান প্রয়োগ ও মানুষকে জানানোর উদ্দেশ্যে। আর আমল হলো, ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা। ফলে মূল ঈমানের ক্ষেত্রে আশআরী-মাতুরীদীদের সঙ্গে অন্যদের মৌলিক বিরোধ নেই।

আর আমল ঈমানের অংশ না হলেও আবশ্যকীয় বিষয়। তাই আমল ত্যাগকারী ব্যক্তি মুমিন হলেও ফাসেক ও গুনাহগার। এ জন্য শরীয়তের করণীয়-বর্জনীয়মতে আমল করতে হবে।

সুতরাং মুমিন হতে হলে প্রথম ছয়টি বিষয় আবশ্যকীয়, আর সাত নম্বরটি হলো পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য। পরিপূর্ণ মুমিনকে প্রকৃত মুসলিম বলা হয়।

১৪৫. ফয়যুল বারী, ১/৫৩-৫৪
১৪৬. ফাতহুল বারী, ১/৪৬

CamScanner

হানাফীরা মুরজিয়া ও 'গুনইয়াতুত তালিবীন' প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : হানাফীরা মুরজিয়া না হলে বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী রাহ. (মৃ. ৫৬১ হি.) 'গুনইয়াতুত তালিবীন' গ্রন্থে হানাফীদের মুরজিয়া বলেছেন কেন? **যেমন** : তিনি উক্ত কিতাবের একটি পরিচ্ছেদে উম্মতে মুহাম্মাদীর ফেরকাসমূহের আলোচনা করতে গিয়ে হানাফীদেরকে মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতঃপর বলেছেন, 'হানাফী মুরজিয়া' হলো আবু হানীফা নুমান বিন সাবিত-এর অনুসারীরা।

উত্তর : এ বিষয়ে 'আল-ই'তিমাদ ফী তাওদীহিল ইকতিসাদ ফীত তাকলীদ ওয়াল ইজতিহাদ' গ্রন্থে যে তথ্য তুলে ধরেছি, তা সংক্ষিপ্তাকারে এখানে উল্লেখ করছি।

প্রথমত, জিলানী রাহ. উর্পযুক্ত দল-উপদলের বিবরণ দেওয়ার পর লিখেছেন,

على ما ذكره البرهوتي في كتاب الشجرة.

অর্থাৎ 'আমি এই তথ্য বারাহুতীর 'কিতাবুশ শাজারা'-এর ওপর ভিত্তি করে লিখেছি।'

এ ব্যাপারে মাহমুদ হাসান টুংকী রাহ. 'মু'জামুল মুসান্নিফীন' (২/১৫৯) গ্রন্থে বলেন, বারাহুতী এবং তার 'কিতাবুশ শাজারা' উভয়ই অজ্ঞাত ও অপরিচিত। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখার চেষ্টা করব যে, বাস্তবেই হানাফীদের কথা 'গুনইয়াতুত তালিবীন' গ্রন্থে আছে কি না।

আমি হস্তলিখিত ও মুদ্রিত কিতাবগুলোর মধ্যে 'গুনইয়াতুত তালিবীন'-এর ১০টির অধিক নুসখা ও কপির সন্ধান পেয়েছি। এগুলো অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, এগুলোর পরস্পরের বক্তব্যে ভিন্নতা ও পার্থক্য রয়েছে।

সবগুলোর বক্তব্য যাচাই করলে মোটামুটি তিন ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় :

প্রথম প্রকারের বক্তব্য, যা ওপরে উল্লেখ হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারের বক্তব্য হলো,

وأما الحنفية فهم بعض أصحاب أبي حنيفة.

'হানাফিয়্যা হলো, আবু হানীফার কিছু অনুসারী।'

অর্থাৎ এখানে بعض বা 'কিছু' শব্দটি অতিরিক্ত এসেছে, যার অর্থ দাঁড়ায় আবু হানীফার সকল অনুসারীই মুরজিয়া নয়; বরং তার অনুসারীদের মধ্য থেকে কিছু লোক মুরজিয়া, যারা আমলী মাসআলার ক্ষেত্রে আবু হানীফার অনুসরণ করে ঠিক, কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে তার অনুসরণ না করে মুরজিয়াদের অনুসরণ করে।

এমন বক্তব্য চারটি মুদ্রিত নুসখায় পাওয়া গেছে। নুসখাগুলো হলো :

১. দারু ইহইয়াউত তুরাস আল-আরবী থেকে মুদ্রিত নুসখা, পৃষ্ঠা ১২৮, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৬ হি., ১৯৯৬ ইং.।

২. মাতবায়ে আম্মান্দ লাহোর থেকে ফারসি তরজমাসহ মুদ্রিত নুসখা, পৃষ্ঠা ২৩০।

৩. দারু ছাদের ও দারুল বাশায়ের থেকে মুদ্রিত নুসখা, পৃষ্ঠা ১/১১৪।

৪. طبعة أولو الألباب/دمشق، وطبعة البابي الحلبي-এর নুসখা।

এ ছাড়া মাহমুদ হাসান টুংকী রাহ. 'মুজামুল মুসান্নিফীন' গ্রন্থে (২/১৫৮) বলেছেন, 'কিছু নুসখা পাওয়া যায়, যেগুলো থেকে بعض বা 'কিছু' শব্দটি বাদ পড়েছে।'

তৃতীয় প্রকারের বক্তব্য হলো,

কতক নুসখা এমন পাওয়া গেছে, যেগুলোতে 'হানাফিয়্যা' শব্দটিই নেই; বরং তার স্থলে আছে 'গাসসানিয়্যা'। সে সকল নুসখার ইবারত বা রিডিং হচ্ছে,

وأما الغسانية فهم أصحاب غسان الكوفي.

'আর গাসসানিয়্যা হলো, গাসসান কূফীর অনুসারীরা।'

এমন বক্তব্য কয়েকটি মুদ্রিত ও হস্তলিখিত নুসখায় পাওয়া গেছে।

মুদ্রিত নুসখাগুলো হলো :

১. দারুল জীল, বৈরুত থেকে মুদ্রিত নুসখা (১/২৩৩), প্রথম প্রকাশ : ১৪২০ হি., ১৯৯৯ ইং, তাহকীক : ইসাম ফারেস আল-হারাস্তানী।

উল্লেখ্য, এ নুসখার শুরুতে লেখা রয়েছে, এটি ইবনে হাজার হাইতামী শাফেয়ী (মৃ. ৯৭৪ হি.) রাহ.-এর স্বহস্তে লিখিত নুসখা থেকে কপি করা হয়েছে।

২. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-লেবানন কর্তৃক মুদ্রিত নুসখা (১/১৮৬), প্রথম প্রকাশ : ১৪১৭ হি., ১৯৯৭ ইং, তাহকীক : সালেহ আবীযা।

৩. দারুল খাইর থেকে মুদ্রিত নুসখা, তাহকীক : মাজেদ ইরসান আল-কীলানী।

হস্তলিখিত দুটি নুসখা হলো :

১. বাগদাদের 'আল-মাকতাবাতুল কাদেরিয়্যা'-এর ৩৭ নং পাণ্ডুলিপি।

২. 'আল-মাকতাবাতুল কাদেরিয়্যা'-এর ৩৮ নং পাণ্ডুলিপি। তবে দ্বিতীয়টি 'দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ' থেকে কপিকৃত, যা ৮৫৩ হিজরীতে লিখিত।

কাজেই উল্লিখিত পাঁচটি নুসখায় 'হানাফিয়্যা' শব্দটি নেই; বরং তার স্থলে 'গাসসানিয়্যা'র নাম রয়েছে। সুতরাং বাস্তবে 'গুনইয়াতুত তালিবীন' গ্রন্থে

হানাফিয়্যার নাম আছে কি না, তা সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল।

এ ছাড়াও আবদুল কাহের বাগদাদী রাহ. (মৃ. ৪২৯ হি.) 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' গ্রন্থে, আবুল মুযাফ্ফার ইসফারায়িনী রাহ. (মৃ. ৪৭১ হি.) 'আত-তাবছীর ফীদ দ্বীন' গ্রন্থে এবং আবদুল কারীম শাহরাস্তানী রাহ. (মৃ. ৫৪৮ হি.) 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে মুরজিয়াদের তালিকায় 'গাসসানিয়্যা' (হানাফিয়্যা নয়) উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং কেবল সম্ভাবনা নয়, বরং অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, 'হানাফিয়্যা' শব্দটি 'গাসসানিয়্যা'র স্থলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

একটি ঐতিহাসিক চিঠি রয়েছে, যা বসরার আলেম উসমান আল-বাত্তীর প্রেরিত চিঠির জবাবে ইমাম আবু হানীফা রাহ. লিখেছেন। এ চিঠিতে ইমাম তাঁর ওপর আরোপিত মুরজিয়া অপবাদ খণ্ডন করেছেন। চিঠিটার সারসংক্ষেপ হলো,

ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন, 'আপনার চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে। আপনি লিখেছেন, আপনার কাছে নাকি সংবাদ পৌঁছেছে যে, আমি মুরজিয়া।

...আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে বিভিন্ন ফরজ ইবাদত দিয়েছেন, যা ঈমানের পর আমল হিসেবে পরিগণিত হয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ "যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে।"[১৪৭] অন্যত্র বলেছেন, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا "আর যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং নেক আমল করে।"[১৪৮] কুরআনে এমন আয়াত আরও রয়েছে।

(কাজেই তারা আমলের আগেই মুমিন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। যদি আমলকেও ঈমান বলা হয়, তাহলে এসব ইবাদত আসার আগে তারা মুমিন অভিধা পেতেন না।)

অতএব কেউ আমল নষ্ট করলে তার ঈমানও নষ্ট হয়ে যায় না। কারণ, ঈমান আনার সময় আমল ছিলই না বা আমল ছাড়াও ঈমান ছিল। আর আমলে বিচ্যুতির কারণে যদি ঈমানেও বিচ্যুতি অনিবার্য হয়, তাহলে কেউ আমলে ত্রুটি করলেই ঈমান থেকে বেরিয়ে কাফের-মুশরিক হয়ে যাওয়ার কথা (অথচ সেটা কেউ বলে না)। তা ছাড়া ঈমানের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে কোনো স্তরভেদ নেই। হ্যাঁ, আমলের ক্ষেত্রে স্তরভেদ আছে। ঈমানের ক্ষেত্রে কমবেশ নেই।...

আপনি কি এমন বলেন না যে, জালেম মুমিন, পাপী মুমিন, বিচ্যুত মুমিন, অবাধ্য মুমিন ও অসৎ মুমিন? (আমল আর ঈমান যদি এক হতো, তাহলে এসব অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের তো মুমিনই বলা হতো না।)...

---

১৪৭. সূরা বাকারা (২) : ৮২
১৪৮. সূরা তাগাবুন (৬৪) : ৯

জেনে রাখুন, আমার বক্তব্য হলো,

أهل القبلة مؤمنون لست أخرجهم من الإيمان بتضييع شيء من الفرائض. فمن أطاع الله تعالى في الفرائض كلها مع الإيمان كان من أهل الجنة عندنا، ومن ترك الإيمان والعمل كان كافرا من أهل النار، ومن أصاب الإيمان وضيّع شيئا من الفرائض: كان مؤمنا مذنبا، وكان لله تعالى فيه المشيئة إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

"আহলে কিবলা মুমিন। ফরজ ইবাদতের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে আমি তাদেরকে ঈমান থেকে বের করে দিই না। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সকল ফরজ বিধান মেনে চলবে, সে আমাদের কাছে জান্নাতী। যে ব্যক্তি ঈমান ও আমল দুটোই ছেড়ে দেবে, সে কাফের ও জাহান্নামের অধিবাসী হিসেবে বিবেচিত হবে।

আর যে ঈমান ঠিক রেখে ফরজের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি করবে, সে আমাদের কাছে 'গুনাহগার মুমিন' হিসেবে গণ্য হবে। পরকালে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা হলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন, ইচ্ছা হলে ক্ষমা করতে পারেন।"'

সুতরাং আবু হানীফা রাহ. যদি মুরজিয়াদের মতো আমলকে গুরুত্বহীন মনে করতেন, তাহলে আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে মুমিনকে গুনাহগার সাব্যস্ত করতেন না এবং পরকালে আল্লাহর ইচ্ছাধীন বলে শাস্তির কথা বলতেন না।

একই কথা ইমাম তাহাবী রাহ.-ও (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর 'আকীদা' গ্রন্থে লেখেন,

وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لمن عمله.

'আমরা এ কথা বলি না যে, ঈমান থাকা অবস্থায় (তথা মুমিন) গুনাহগার ব্যক্তিকে তার গুনাহ কোনো ক্ষতি করবে না।'

চিঠির শেষে ইমাম আবু হানীফা রাহ. তাঁর মুরজিয়া হওয়াকে গোমরাহ ফেরকাগুলোর পক্ষ থেকে অপবাদ হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, 'এক সম্প্রদায় (ঈমান ও আমলের স্তর নিয়ে) ইনসাফের সাথে কথা বলেছে, কিন্তু বিদআতপন্থীরা তাদের মুরজিয়া আখ্যা দিয়েছে। অথচ (তারা মুরজিয়া নয়, বরং) তারা আহলে ইনসাফ ও আহলুস সুন্নাহ। বিদ্বেষবশত সেসব সম্প্রদায় তাদের এই অপবাদ দিয়েছে।'[১৪৯]

ইমাম শাহরাস্তানী রাহ.(মৃ. ৫৪৮ হি.) 'আল-মিলাল' গ্রন্থে বলেন,

كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول، والمعتزلة كانوا يلقّبون كلّ من خالفهم في القدر: مرجئا، وكذلك الوعيدية من الخوارج. فلا يبعُد أن اللقب إنما لزمه من فريقَي: المعتزلة والخوارج.

১৪৯. রিসালাতু আবী হানীফা ইলা উসমান আল-বাত্তী-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৪১৩-৪১৬, মাকতাবাতুল গানিম

'তিনি (আবু হানীফা রাহ.) প্রথম যুগের "কাদারিয়্যা" ও "মুতাযিলা"দের বিরোধিতা করতেন। আর মুতাযিলারা তাদের বিরোধিতাকারীদের ওপর মুরজিয়া তকমা লাগাত। একই কাজ করত খারেজীদের অঙ্গ-ফেরকা "ওয়ীদিয়্যা"ও। কাজেই এটা অসম্ভব নয় যে, তাঁর (আবু হানীফা রাহ.-এর) ওপর এই অপবাদটি মুতাযিলা ও খারেজীদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে।'[১৫০]

আল্লামা ইজী রাহ. (মৃ. ৭৫৬ হি.) ও জুরজানী রাহ. (মৃ. ৮১৬ হি.) বলেন,

(وغسان كان يحكيه) أي القول بما ذهب إليه (عن أبي حنيفة)، ويعده من المرجئة (وهو افتراء) عليه، قصد به غسان ترويج مذهبه بموافقة رجل كبير مشهور.

'গাসসান তার নিজ মতবাদ আবু হানীফা রাহ.-এর নামে বর্ণনা করত। আর তাঁকে (আবু হানীফাকে) মুরজিয়াদের মধ্যে গণ্য করত। এটা তাঁর ওপর অপবাদ। গাসসান নিজের (ভ্রান্ত) মতবাদ (মানুষের মাঝে) ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে (আবু হানীফার মতো) প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম ব্যবহার করেছে।'[১৫১]

প্রশ্ন : ইমাম আশআরী রাহ. 'মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন' কিতাবে ইমাম আবু হানীফাকে মুরজিয়া বলেছেন কেন?

উত্তর : দুঃখজনক বিষয় হলো, ইমাম আবু হানীফা রাহ. নিজের পক্ষ থেকে এত স্পষ্টভাবে ওয়াজাহাত করা সত্ত্বেও কয়েকজন আলেম বিভিন্ন কারণে ইনসাফ না করে তাঁকে মুরজিয়া বলা অব্যাহত রেখেছেন। ইমাম বুখারী রাহ. তাঁর 'আত-তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে সনদ যাচাই না করে বলেছেন, 'তিনি মুরজিয়া ছিলেন।' ইমাম মুসলিম রাহ. তাঁর 'কিতাবুত তাময়িয' গ্রন্থে সনদ-সংক্রান্ত মূলনীতি রক্ষা না করে ইমামকে মুরজিয়া সাব্যস্ত করেন এবং ক্ষুব্ধভাবে তাঁর সমালোচনা করেন। ইবনে হিব্বান রাহ. 'আল-মাজরূহীন' গ্রন্থে লেখেন, 'তিনি ইরজা (তথা মুরজিয়া মাযহাব)-এর দিকে দাওয়াত দিতেন।' অনুরূপ ইমাম আবুল হাসান আশআরীও ইমামের ওপর ইরজার অভিযোগ দিয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা বর্ণনার মাঝে পার্থক্য করেননি। হকপন্থীদের ইরজা এবং বিদআতীদের ইরজার মাঝে পার্থক্যের প্রতি লক্ষ করেননি।

বরং ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো, পরবর্তীকালে সময় যত গড়িয়েছে, ইমামের ওপর প্রতিপক্ষের সমালোচনা ও আক্রমণ তত বেড়েছে। এমনকি তারা শুধু 'মুরজিয়া' বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং তাঁর ব্যাপারে এমন অনেক বিষয় বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম তো দূরের কথা, কোনো সাধারণ মুসলিম ও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বলতে পারে না।

---

১৫০. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১৪০, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত
১৫১. শারহুল মাওয়াকিফ, ৮/৩৯৭

CamScanner

তারা ইমামের সমালোচনার ক্ষেত্রে সূত্র-বিশুদ্ধতার প্রতি ন্যূনতম লক্ষ রাখেননি। বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ যাচাই-বাছাই ছাড়া তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুঃখজনক ভূমিকা পালন করেছেন খতীব বাগদাদী রাহ. 'তারিখে বাগদাদ' কিতাবে এবং আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমদ তাঁর 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থে। আরও আছেন ইবনে হিব্বান ও ইবনে আদী প্রমুখ। তারা বিভিন্ন লোকের বরাতে ইমামের নামে শত শত পৃষ্ঠা দোষ লিখেছেন ও কুৎসা রটিয়েছেন। তাঁর ওপর এমন জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত কেউ কারও নামে করেনি!

মুরজিয়া অভিযোগের জবাব এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, ঈমানের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে আমল বিষয়ে ইমামের সাথে তাদের মতপার্থক্য থাকার কারণে শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ করে তারা তাকে মুরজিয়া বলেছেন। আর এমন ব্যক্তিদেরকে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত মনে করে পরিভাষায় 'মুরজিয়াতুস সুন্নাহ' বলা হয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলো, তাদের কেউ কেউ বিদআতী অর্থেই ইমামকে মুরজিয়া বলেছেন! আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। ইমাম আবু হানীফা রাহ. এ ধরনের অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

শাহরাস্তানী রাহ. (মৃ. ৫৪৮ হি.) 'আল-মিলাল' গ্রন্থে বলেন,

ومن العجيب! أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله مثل مذهبه، ويعُدّه من المرجئة! ولعله كذَب كذلك عليه؟ لعمري! كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه: مرجئة السنة. وعدّه كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة، ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول: «الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو لا يزيد ولا ينقص»، ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان. والرجل مع تخريجه في العمل كيف يفتي بترك العمل؟!

'কী অদ্ভুত ব্যাপার! গাসসান তার নিজের মতাদর্শ আবু হানীফা রাহ.-এর নামে বর্ণনা করে তাকে মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে।

সে ইমামের ওপর মিথ্যা অপবাদ চাপিয়েছে। খোদার কসম! ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর অনুসারীদের "মুরজিয়াতুস সুন্নাহ" বলা হতো। অথচ অনেক রচয়িতাগণ তাঁকে মুরজিয়াদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন।

এর একটি কারণ এটা হতে পারে, ইমাম আবু হানীফা রাহ. যেহেতু বলেছেন, ঈমান কেবল অন্তরের সত্যায়নকেই বলা হয় এবং ঈমান বাড়েও না, কমেও না। তাই তারা ধারণা করেছেন, ইমাম আবু হানীফা আমলের কোনো গুরুত্ব দেন না। পরকালে মুক্তির জন্য কেবল ঈমানকেই যথেষ্ট মনে করেন।

অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ তার বিপরীত। কেননা, যিনি আমলী মাসআলা-মাসায়েলের

CS CamScanner

গবেষণায় জীবন ব্যয় করলেন, কীভাবে ভাবা যায় তিনি আমল ছেড়ে দেওয়ার ফতোয়া দেবেন?!'[১৫২]

আল্লামা আবদুল হাই লাখনাভী রাহ. (মৃ. ১৩০৪ হি.) বলেন, 'মুরজিয়া দুই প্রকার: ১. "মুরজিয়াতুল বিদআহ" (যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ থেকে খারেজ), ২. "মুরজিয়াতুস সুন্নাহ" (যারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত)। ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর উস্তাদ ও অনুসারীগণ আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।'

তিনি আরও বলেন, 'অজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন "মীযানুল ই'তিদাল" ও অন্য রিজালশাস্ত্রের কিতাবসমূহে দেখবে, বিভিন্ন ইমামদের পক্ষ থেকে অনেক রাবীর ওপর মুরজিয়া হওয়ার তকমা লাগানো হয়েছে, তখন তারা মনে করবে, এরা আহলুস সুন্নাহ থেকে বহির্ভূত; ভ্রান্ত জাহান্নামী ফেরকা মুরজিয়ার অন্তর্ভুক্ত!

মূলত ইরজার উভয় প্রকার সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে অনেকে ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর উস্তাদ ও অনুসারীদের ওপর আক্রমণ করেছে।'[১৫৩]

ইমাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী রাহ. (মৃ. ১১৭৬ হি.) বলেন, 'মুরজিয়া দুই প্রকার। এক প্রকার মুরজিয়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ থেকে বহির্ভূত। আরেক প্রকার মুরজিয়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার মুরজিয়া : তাদের আকীদা হলো, যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে এবং মুখ দিয়ে স্বীকার করে, সে যতই গুনাহ করুক তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

দ্বিতীয় প্রকারের মুরজিয়া : (যারা আহলুস সুন্নাহ) তাদের আকীদা হলো, আমল ঈমানের অংশ নয় ঠিক, কিন্তু আমল দেখে সাওয়াব ও আযাব দেওয়া হবে।

এই দুই মুরজিয়ার আকীদার মাঝে পার্থক্য হলো, সাহাবা ও তাবেয়ীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, প্রথম প্রকার মুরজিয়াদের আকীদা ভুল। কারণ, ঈমানদারকে আমল দেখে সাওয়াব ও আযাব দেওয়া হবে। সুতরাং যারা এটা মানবে না, তারা ভ্রান্ত।

আর আমল ঈমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনো ইজমা পাওয়া যায় না; বরং এমন অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যা দ্বারা বোঝা যায় ঈমান আমল থেকে ভিন্ন। আবার এমন অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যা দ্বারা বুঝে আসে ঈমান ও আমল অভিন্ন।

লক্ষণীয়! যারা মনে করেন ঈমান আমল থেকে ভিন্ন এবং যারা মনে করেন ঈমান ও আমল অভিন্ন—উভয় দল এ বিষয়ে একমত যে, গুনাহগার ঈমান থেকে খারেজ হয়

---

১৫২. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ১/১৪০, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত
১৫৩. আর-রফউ ওয়াত তাকমীল, পৃষ্ঠা ৩৬০-৬১ ও ৩৫২

CS CamScanner

না, তবে শাস্তির উপযুক্ত হবে। সুতরাং তাদের মাঝে পার্থক্য হলো কেবল শাব্দিক বা উপস্থাপনাগত।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. মনে করেন আমল ঈমান থেকে ভিন্ন এবং তিনি আহলুস সুন্নাহর বড় ইমাম। তবে কিছু লোক যারা মূলত মুতাযিলা, মুরজিয়া বা অন্য কোনো দলের লোক ছিল, তারা আকীদার ক্ষেত্রে আবু হানীফার অনুসরণ করত না, তবে আমলের ক্ষেত্রে আবু হানীফার মাযহাব অনুসরণ করার নামে নিজেদের ভ্রান্ত আকীদা মানুষের মাঝে প্রচার করার জন্য বলে বেড়াতে থাকে যে, ইমাম আবু হানীফাও আমাদের মতো আকীদা পোষণ করতেন।

এ কারণেই ইমাম তাহাবী রাহ.-সহ অন্যান্য ইমাম এ বিষয়ে সতর্ক হয়েছেন এবং তাদেরকে প্রতিহত করেছেন। আর মানুষের সামনে আবু হানীফার আকীদা প্রকাশ করেছেন।'[১৫৪]

আহমদ বিন আলী শীয়ী (যিনি সুলায়মানী নামে প্রসিদ্ধ) আবু হানীফা রাহ.-সহ কিছু ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে মুরজিয়া আখ্যায়িত করলে ইমাম যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) সুলায়মানীর কথার জবাবে বলেছেন,

ولا عبرة بقول السليماني: كان من المرجئة مسعر، وحماد بن أبي سليمان والنعمان، وعمرو بن مرة.

قلت: الارجاء مذهب لعدة من جلة العلماء، لا ينبغي التحامل على قائله.

'সুলায়মানীর এ কথা গ্রহণযোগ্য নয় যে, মিসআর (বিন কিদাম), হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান, নুমান (আবু হানীফা), আমর বিন মুররাহ প্রমুখ মুরজিয়া ছিলেন।'

অতঃপর যাহাবী রাহ. বলেন, 'অনেক বড় বড় আলেমগণ মুরজিয়া (মুরজিয়াতুস সুন্নাহ) ছিলেন। তাদের ওপর আক্রমণ করা ঠিক নয়।'[১৫৫]

মুহাদ্দিস ইবনুল আসীর শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৬০৬ হি.) 'জামেউল উসূল' গ্রন্থের পরিশিষ্টে বলেন, 'ইমাম আবু হানীফা রাহ. একজন আমলদার আলেম ছিলেন। কিন্তু তাঁর ওপর বিভিন্ন তকমা লাগানো হয়েছে। খলকে কুরআন, কদর এবং ইরজা বা মুরজিয়াসহ আরও অনেক উদ্ভট বিষয় আবু হানীফার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা থেকে তিনি পবিত্র।... ইমাম তাহাবী রাহ. একটি কিতাব রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন "আকীদাতু আবী হানীফা" বা আবু হানীফার আকীদা। এতে বর্ণিত সবগুলোই আহলুস সুন্নাহর আকীদা। তাঁর প্রতি যে সকল বিষয়ের সম্বন্ধ করা হয়েছে, সেগুলোর একটিও তাতে উল্লেখ নেই। তাঁর অনুসারীগণ যেহেতু তাঁর অবস্থা, আকীদা-বিশ্বাস ও মতামত সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি অবগত, তাই

১৫৪. আত-তাফহীমাতুল ইলাহিয়্যা, ১/২৭-২৯; আরও দেখুন, মাজমূউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ৭/৩৯৪, ২৯৭
১৫৫. জামেউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল, ১২/৯৫৩-৯৫৪; মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার, তাহের পাটনী, ৫/২৮১

অন্যদের বর্ণনার বিপরীতে তাঁর অনুসারীদের বর্ণনা মেনে নেওয়াই শ্রেয়।

আর ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, কেন বলা হয়েছিল? কী ছিল তার কারণ? কোন বিষয় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করল? সবকিছুই বর্ণিত আছে। সেগুলো এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, আবু হানীফার মতো মানুষ এবং ইসলামে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের জন্য অপবাদের ওজরখাহী করার জন্য কোনো দলীলের প্রয়োজন নেই।'[১৫৬]

সায়্যিদ মুরতাযা যাবীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ১২০৬ হি.) 'উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'আবু হানীফাকে মুরজিয়া বলাটা ভুল। কারণ, ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর সকল অনুসারী মুরজিয়াদের আকীদার বিপরীত আকীদা পোষণ করেন। যদি আবু হানীফা মুরজিয়া হতেন, তাহলে তাঁর অনুসারীরা নিশ্চিত তাঁর রায় গ্রহণ করতেন। অথচ তারা এখনো মুরজিয়াদের রায়ের চরম বিরোধী।

যদি সকল মানুষ একদিকে থাকে, তার বিপরীতে দু-একজন ভিন্ন দাবি করে, তবে তার কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না এবং তার দাবি সত্যায়নযোগ্য নয়। আর আবু হানীফা রাহ.-এর মতে মুরজিয়ার পেছনে নামাজ পড়াও জায়েয নেই।'

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রাহ. (মৃ. ৩১০ হি.) বড় চমৎকার কথা বলেছেন,

لو كان كل من ادعُي عليه مذهب من المذاهب الرديئة، ثبت عليه ما ادعُي عليه به، وسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك: لزم ترك محدثي الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه.

'যদি কারও ব্যাপারে কোনো মন্দ বিষয়ের সম্পৃক্ততার দাবি করা হলেই তা প্রমাণিত হয়ে যেত এবং এর মাধ্যমে তার সাক্ষ্য ও নির্ভরযোগ্যতা বাতিল হয়ে যেত, তাহলে অধিকাংশ মুহাদ্দিস অগ্রহণযোগ্য হয়ে যেতেন। কারণ, এমন কোনো মুহাদ্দিস নেই, যার ব্যাপারে কেউ না কেউ অসংগতিপূর্ণ কোনো বিষয়ের দাবি করেননি।'[১৫৭]

আল্লাহ তাআলা সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন।

আরকানে ঈমানের বিববরণ

আরকানে ঈমান তথা ঈমানের রুকন হলো ছয়টি : ১. আল্লাহর ওপর ঈমান আনা, ২. তাঁর ফেরেশতাকুলের ওপর, ৩. তাঁর নাযিলকৃত সকল কিতাবের ওপর, ৪. নবী-রাসূলগণের ওপর, ৫. কিয়ামত-দিবস বা আখিরাত ও পরকালের ওপর এবং ৬. তাকদীরের ভালো-মন্দ সবই তাঁর পক্ষ থেকেই হয়—এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

---

১৫৬. মীযানুল ই'তিদাল, ৬/৪০৯, মিসআর বিন কিদামের জীবনী
১৫৭. হাদয়ুস সারী, ইবনে হাজার : ইকরিমার জীবনী

CS CamScanner

কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে এ রুকনসমূহের কথা উল্লেখ হয়েছে। যেমন : সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে প্রথম পাঁচটি একসাথে এসেছে,

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ

'...বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনা আল্লাহ, কিয়ামত-দিবস, ফেরেশতাকুল, কিতাব ও নবীগণের প্রতি।'[১৫৮]

আর সূরা কামারের ৪৯ নং আয়াতে তাকদীরের কথা এসেছে,

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

'আমি প্রত্যেক বস্তু নির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছি।'

প্রসিদ্ধ হাদীসে জিবরীলে ছয়টি একসাথে এসেছে,

أخرج الشيخان والترمذي واللفظ له:... قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَالقَدرِ: خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

'(জিবরীল) বললেন, হে মুহাম্মাদ! ঈমান কী?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর সকল ফেরেশতা, সমস্ত কিতাব, রাসূলগণ ও আখিরাত এবং তাকদীরের ভালো-মন্দ (তাঁর পক্ষ থেকেই হয়)-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।'[১৫৯]

ইমাম তাহাবী রাহ. তাঁর বিখ্যাত 'আকীদা' গ্রন্থে লেখেন,

وَأَصْلُ الْإِيمَانِ: هُوَ الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْقَدرِ: خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

'মূল ঈমান হলো, ১. আল্লাহ, ২. তাঁর ফেরেশতাকুল, ৩. কিতাবসমূহ, ৪. রাসূলগণ, ৫. শেষ দিবস ও মৃত্যু-পরবর্তী উত্থান এবং ৬. তাকদীরের ভালো-মন্দ, পছন্দ-অপছন্দ (সবকিছুই) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে—এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।'

প্রকৃতপক্ষে ঈমানের বিষয় অনেক, যেমন এর একটি তালিকা ওপরে উল্লেখ হয়েছে; তবে মূল হলো এই ছয়টি।

তাকলীদযুক্ত ঈমান গ্রহণযোগ্য কি না

নিজে বুঝে-শুনে ও দলীল জেনে ঈমান আনাকে বলা হয় তাকলীদমুক্ত ঈমান। আর

---

১৫৮. সূরা বাকারা, (২) : ১৭৭
১৫৯. বুখারী; মুসলিম; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১০

অন্যের অনুসরণে ঈমান আনার নাম তাকলীদযুক্ত ঈমান।

এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, শরীয়তের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের জন্য তাকলীদমুক্ত ঈমান আকাঙ্ক্ষিত এবং এ ধরনের ঈমান সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য।

তবে দুটি প্রশ্ন : ১. কেউ যদি তাকলীদযুক্ত ঈমান আনে, তাহলে বৈধ হবে কি না? ২. তাকলীদযুক্ত ঈমান আনলে মুকাল্লিদের ঈমান শুদ্ধ হবে কি না?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো, তাকলীদযুক্ত ঈমান বৈধ নয়। খতীব বাগদাদী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন,

والأحكام على ضربين: عقلي وشرعي. فأما العقلي: فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة الصانع تعالى وصفاته، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، وغير ذلك من الأحكام العقلية.

সারাংশ : 'মৌলিক আকীদা-সংক্রান্ত বিষয়ে তাকলীদ বৈধ নয়।'[১৬০]

মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম হানাফী রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.)-এর 'আত-তাহরীর' ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আমীর বাদশার (৯৭২ হি.) 'তাইসীরুত তাহরীরে' রয়েছে,

(فما يحل الاستفتاء فيه) الأحكام (الظنية، لا العقلية) المتعلقة بالاعتقاد؛ فإن المطلوب فيها العلم (على) المذهب (الصحيح)، فلا يجوز التقليد فيها، بل يجب تحصيلها بالنظر الصحيح، وهو قول الأكثرين واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب، بل حكاه الإسفرايني عن إجماع أهل العلم من الحق وغيرهم من الطوائف.

সারমর্ম : 'আকীদা-সংক্রান্ত বিষয়ে তাকলীদ বৈধ নয়। এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত; বরং ইমাম ইসফারায়িনী রাহ. এ বিষয়ে হক্কানী ও অন্য আহলে ইলমের ইজমা নকল করেছেন।'[১৬১]

প্রখ্যাত ফকীহ ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রাহ. (মৃ. ১২৫২ হি.) লেখেন,

ما يَجِبُ اعْتِقَادُهُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بِلَا تَقْلِيدٍ لِأَحَدٍ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদাসমূহ কারও তাকলীদ ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানের ওপর বিশ্বাস করা ওয়াজিব।'[১৬২]

ইমামুল হারামাইন জুয়াইনী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৪৭৮ হি.) বলেন,

لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة... وقال القرافي: وسألت الحنابلة فقالوا: مشهور مذهبنا منع التقليد.

১৬০. আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১২৮; আল-লুমা' ফী উসূলিল ফিকহ, শীরাযী কৃত, পৃষ্ঠা ১২৫
১৬১. তাইসীরুত তাহরীর, ৪/২৪৩; আরও দেখুন, ফাওয়াতিহুর রাহমূত, ২/৪৩৩
১৬২. ফাতাওয়া শামীর মুকাদ্দামা, ১/১৪০

CamScanner

'আকীদার ক্ষেত্রে তাকলীদের কথা হাম্বলীরা ব্যতীত আর কেউ বলেনি।... তবে ইমাম কারাফী মালেকী রাহ. (মৃ. ৬৮৪ হি.) বলেন, আমি হাম্বলীদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেছেন, আমাদের প্রসিদ্ধ মাযহাব হচ্ছে, (আকীদার ক্ষেত্রে) তাকলীদ নিষিদ্ধ।'[১৬৩]

তবে আশ্চর্য হই কাযী শাওকানী রাহ. (মৃ. ১২৫০ হি.)-এর ওপর, তিনি আমলের ক্ষেত্রে তাকলীদকে কঠিনভাবে হারাম বললেও আকীদার ক্ষেত্রে তাকলীদের অনুমতি দিয়েছেন।[১৬৪]

দ্বিতীয় প্রশ্ন : তাকলীদযুক্ত ঈমান আনলে মুকাল্লিদের ঈমান শুদ্ধ হবে কি না?

অর্থাৎ তাকলীদযুক্ত ঈমান যদিও বৈধ নয়, এরপরও কেউ যদি তাকলীদযুক্ত ঈমান আনে, তাহলে মুকাল্লিদের ঈমান শুদ্ধ হবে কি না?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, তাকলীদযুক্ত ঈমান, যা সন্দেহ-সংশয়মুক্ত হয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে হবে, তা বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। তথা এমন ব্যক্তি মুমিন হিসেবে সাব্যস্ত হবে, যদিও দলীল পরিত্যাগ করে তাকলীদের কারণে গুনাহগার হবে।

ইমাম আবুল মুঈন নাসাফী রাহ. (মৃ. ৫০৮ হি.) লেখেন,

من كان مصدّقا كان مؤمنا، سواء وجد منه التصديق عن الدليل أو عن غير الدليل ...وهذا المذهب: أنّ المقلّد الذي لا دليل معه مؤمن، وحكم الإسلام له لازم، وهو مطيع لله تعالى باعتقاده وسائر طاعاته، وإن كان عاصيا بترك النظر والاستدلال، وحكمه حكم غيره من فسّاق أهل الملّة من جواز مغفرته أو تعذيبه بقدر ذنبه، وعاقبة أمره الجنّة لا محالة، هذا القول محكي عن أبي حنيفة والثّوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأهل الظاهر.

'কেউ বিশ্বাস করলেই মুমিন গণ্য হবে। চাই তা দলীলভিত্তিক হোক বা দলীলবিহীন হোক।... কাজেই দলীল না জানা মুকাল্লিদ মুমিন ও মুসলিম। সে তার আকীদা ও সকল ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যকারী এবং পরকালে সে জান্নাতী। তবে দলীল-প্রমাণ পরিত্যাগের কারণে গুনাহগার ও ফাসেক। এটা ইমাম আবু হানীফা-সহ চার ইমাম, সাওরী ও আহলে যাহেরের মাযহাব।'[১৬৫]

নুরুদ্দীন সাবুনী রাহ. (মৃ. ৫৮০ হি.) বলেন, 'সুফিয়ান সাওরী, মালেক, আওযায়ী এবং অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের বক্তব্য হলো, মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ। তবে দলীল-প্রমাণ তরকের কারণে গুনাহগার হবে। এটাই সঠিক বক্তব্য।'

---

১৬৩. দেখুন, আল-বাহরুল মুহীত, যারকাশী, ৬/২৭৮; আরও দেখুন, আল-ইহকাম লিল-আমেদী, ৪/২৭১-৭৩; শারহু মুখতাসারির রওযা, নাজমুদ্দীন তূফী, ৩/৬৬২; শারহু তানকীহিল ফুসূল, কারাফী, পৃষ্ঠা ৪৩০ ও ৪৪৪

১৬৪. দ্র. ইরশাদুল ফুহূল, ২/১০৮৬

১৬৫. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ, ১/২৫, ২৮; শারহুল মাকাসিদ, তাফতাযানী, ৫/২২২

CS CamScanner

আবুল বারাকাত নাসাফী রাহ.-ও (মৃ. ৭১০ হি.) একই কথা বলেছেন।[১৬৬]

সদরুল ইসলাম বাযদাবী রাহ. (মৃ. ৪৯৩ হি.) বলেন, 'আহলুস সুন্নাহর বক্তব্য হলো, মুকাল্লিদ (তথা যে ইসলামের সকল অকাট্য বিধান বিশ্বাস করে ও স্বীকার করে, সে) প্রকৃত অর্থেই মুমিন। তবে মুতাযিলাদের কাছে সে মুমিন নয়। আশআরীদের সঠিক মত অনুযায়ীও সে মুমিন।

এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহর দলীল হলো, উম্মতের সকলেই ও সাহাবায়ে কেরাম সাধারণ লোকদের ঈমান বিশুদ্ধ বলেছেন। কাজেই যে এর বিরোধিতা করল, সে উম্মতের সকলের বিরোধিতা করল, যা গোমরাহ ও বিদআত। আর যুক্তিও বলে, পথ চলার উদ্দেশ্য হলো গন্তব্যে পৌঁছানো। যদি কেউ দলীল নিয়ে মক্কায় পৌঁছায়, আর কেউ (মুকাল্লিদ) অন্যের অনুসরণে মক্কায় পৌঁছায়, তাহলে দুজনেই মক্কায় পৌঁছেছে, গন্তব্যে পৌঁছেছে ধর্তব্য হবে।'[১৬৭]

মুক্তির ক্ষেত্রে উভয় প্রকার ঈমানই গ্রহণযোগ্য; তবে তাকলীদমুক্ত ঈমানের মূল্য তাকলীদযুক্ত ঈমানের চেয়ে বেশি।

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবু বকর কাসানী রাহ. (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেন,

وإيمان المقلِّد صحيح، وهو الذي اعتقد جميع ما فرض عليه اعتقاده من حَدَث العالم، وقِدَم الصانع، ووحدانيته، ورسالاته، وغير ذلك اعتقادًا جزمًا بلا شك وارتياب، من غير دليل عقلي، فهذا مؤمن، وإيمانه صحيح نافع في الدنيا والآخرة.

'মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ এবং উভয় জাহানে উপকারী হবে, এর জন্য আকলী দলীল নিষ্প্রয়োজন। তবে যা বিশ্বাস করা ফরজ, তা কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে।'[১৬৮]

মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম হানাফী রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) লেখেন,

(صحَّحنا إيمان المقلد، وإن أثَّمناه)... أن المستفتي آثم إذا اكتفى بمجرد التقليد فيه، ولم يجتهد في تحصيل العلم بالدليل، وهو مذهب الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري، وكثير من المتكلمين.

'আমাদের মতে মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ, যদিও সে গুনাহগার।'

আমীর বাদশা রাহ. (৯৭২ হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'মুকাল্লিদ দলীল জানার চেষ্টা না করে কেবল তাকলীদ করলে গুনাহগার হবে। এটাই (প্রসিদ্ধ) চার ইমাম, আওযায়ী, সাওরী ও অনেক মুতাকাল্লিমের মাযহাব।'[১৬৯]

---

১৬৬. আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ, পৃষ্ঠা ১৫৪; আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ, পৃষ্ঠা ৩৮৫
১৬৭. উসূলুদ্দীন, পৃষ্ঠা ১৫৫
১৬৮. আল-মু'তামাদ মিনাল মু'তাকাদ, পৃষ্ঠা ৭৫; ফাতাওয়া সিরাজিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩০৭
১৬৯. তাইসীরুত তাহরীর, ৪/২৪৩

দলীল জানা ওয়াজিব, তবে না জানলেও ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে চমৎকারভাবে আবু ইসহাক সাফফার বুখারী রাহ. (মৃ. ৫৩৪ হি.) লেখেন,

ومن عرف الحق بأي وجه كان فإنّه يكون عارفا به وإن لم يعرف الدليل، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ لأنّ معرفة الدليل لا يغيّر ما عرف بغير دليل، فيتضمن معرفته ما عرف بغير دليل جميع ما يعرف بالدليل... ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «قولوا: لا إله إلا الله، تفلحوا» رواه أبو حنيفة. وفي الحديث المعروف قال صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله».. فقد جعلهم مؤمنين بهذا القول من غير تصديق القلب، ولم يشترط معرفة الدليل ولا معرفة التفاصيل، فدل أنّ من عرف الحق من أي وجه عرف: كان عارفا بالحق، لكن جعل الدليل طريقا إلى معرفة الحق، فيجب معرفة الدليل واتباعه.

'সত্যকে যেকোনোভাবেই জানা যথেষ্ট, যদিও দলীল জানা না থাকুক। এটাই ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শাগরিদদের অভিমত এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনসহ অন্য সালাফে সালেহীনের মানহাজ। কারণ, দলীল ছাড়া জানা কোনো জিনিস দলীলসহ জানার দ্বারা বদলে যায় না। সুতরাং দলীল ছাড়া জানলেও যা থাকে, দলীলসহ জানলেও তা-ই থাকে। এটা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন : ইমাম আবু হানীফা রাহ. বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল বলেন, তোমরা বলো, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তাহলে সফল হয়ে যাবে। আর প্রসিদ্ধ এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি মানুষের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে।

এখানে অন্তরের বিশ্বাস না দেখেও কেবল তাদের স্বীকৃতিকে ঈমান বলা হয়েছে। দলীল জানা এবং সবিস্তারে জানার কথা বলা হয়নি। সুতরাং কেউ সত্যকে যেকোনো পদ্ধতিতে জানুক, তাকে সত্য সম্পর্কে জ্ঞাতই বলা হবে।

তবে সত্য জানার মাধ্যম হলো দলীল। কাজেই দলীল জানা ওয়াজিব।'[১৭০]

বিশেষ জ্ঞাতব্য

দলীল জানার বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা রয়েছে। প্রত্যেকের জন্য তার স্তর ও অবস্থার প্রেক্ষিতে দলীল-প্রমাণের আবশ্যকীয়তা নির্ধারিত হবে।

কামালুদ্দীন বায়াযী রাহ. (মৃ. ১০৯৮ হি.) বলেন,

أن وجوب النظر والاستدلال على كل أحد بحسب ما يتيسر له من الدليل، دون الأدلة المشهورة للمتكلمين.

'প্রত্যেকের জন্য দলীল-প্রমাণের আবশ্যকীয়তা তার স্তর ও অবস্থার প্রেক্ষিতে

---

১৭০. তালখীসুল আদিল্লাহ, ১৩২-৩৩; মুসনাদে আবী হানীফা, হারেসী, বর্ণনা নং ২৮

CamScanner

নির্ধারিত হবে। মুতাকাল্লিমীনদের দলীল জানা জরুরি নয়।'[১৭১]

ইমাম গাযালী রাহ. (৫০৫ হি.) মানুষকে চার দলে বিভক্ত করে প্রথম দল সম্পর্কে বলেন,

آمنتْ بالله وصدقتْ رسوله واعتقدتْ الحق وأضمرتْه، واشتغلتْ إما بعبادة وإما بصناعة؛ فهؤلاء ينبغي أن يتركوا وما هم عليه، ولا تحرّكْ عقائدهم بالاستحثاث على تعلم هذا العلم، فإن صاحب الشرع صلوات الله عليه لم يطالب العرب في مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق، ولم يفرّق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي، أو بيقين برهاني... ولهذا لم ينقل عن الصحابة الخوض في هذا الفن لا بمباحثة ولا بتدريس ولا تصنيف، بل كان شغلهم بالعبادة والدعوة إليها، وحمل الخلق على مراشدهم ومصالحهم في أحوالهم وأعمالهم ومعاشهم فقط.

'যারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে, তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করে, হকের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং ইবাদত বা কাজে মগ্ন থাকে, তাদেরকে এভাবেই থাকতে দেওয়া উচিত। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরববাসীর কাছ থেকে সত্যায়ন ছাড়া আর কিছু চাননি। এই ঈমান তাকলীদ করে নাকি দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে, আল্লাহর রাসূল সে পার্থক্য খোঁজেননি।...

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম এসবের মাঝে প্রবেশ করেননি; দাওয়াত ও ইবাদতের মাঝে সময় কাটিয়েছেন। মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ কীভাবে হবে, সবাইকে সেই পথে ডেকেছেন।'[১৭২]

আবু শাকুর সালেমী রাহ. (মৃ. ৪৬০ হিজরীর পর) বলেন, 'কেউ যদি এটুকু জানে যে, তার এবং জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, তাহলে সে 'তাকলীদ'-এর সীমারেখা থেকে বাইরে চলে যাবে। অর্থাৎ কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার সৃষ্টিকর্তা কে এবং জবাবে সে বলে, আল্লাহ অথবা আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, এটুকুতেই তার ঈমান বিশুদ্ধ হবে।'[১৭৩]

সুতরাং একজন কালেমা পড়ছেন, কিন্তু তিনি কী যে পড়ছেন সেটাই জানেন না, এর দাবি কী, তাও বোঝেন না—এমন ব্যক্তির ঈমান কারও মতেই বিশুদ্ধ নয়। কেউ নিজেকে মুসলমান দাবি করে, কিন্তু সে ইসলামের কিছুই বোঝে না, কিছুই জানে না। আল্লাহর ওপর কেন বিশ্বাস রাখে, এ ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই; বরং তার বাপ-দাদা কিংবা বন্ধু-সঙ্গী যেমন বিশ্বাস রাখে, সেও তেমন রাখে। এটা ঈমান ও ইসলামের নামে তামাশা ছাড়া কিছু নয়।

---

১৭১. ইশারাতুল মারাম, পৃষ্ঠা ২৭০; শারহুল কাওকাবিল মুনীর, ইবনুজ নাজ্জার হাম্বলী, ৪/৪৬৬

১৭২. আল-ইকতিসাদ ফিল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ১৪

১৭৩. আত-তামহীদ, আবু শাকুর সালেমী, পৃষ্ঠা ১০০-১০১

CS CamScanner

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,

لَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًا، فَإِنْ آمَنَ آمَنَ، وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ.

'কেউ আকীদার ক্ষেত্রে অন্যের তাকলীদ করবে না। যেমন : একজন ঈমান এনেছে বলে দ্বিতীয়জন ঈমান আনবে, অথবা একজন কুফরী করল দেখে অন্যজন কুফরী করবে।'[১৭৪]

সারকথা, কেউ কালেমা পড়ে কিংবা নিজেকে মুসলিম দাবি করে, কিন্তু এর ন্যূনতম দাবি কী, তা জানে না—এমন ব্যক্তির ঈমান কারও মতেই বিশুদ্ধ নয়। তবে ঈমানের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং এর ন্যূনতম দাবি কী, তাও জানে; কিন্তু দলীল-প্রমাণ জানে না, বরং এ ক্ষেত্রে কারও তাকলীদ করে, তো এমন তাকলীদযুক্ত ঈমান বিশুদ্ধ। মুক্তির ক্ষেত্রে তাকলীদমুক্ত ও তাকলীদযুক্ত উভয় প্রকার ঈমানই গ্রহণযোগ্য, তবে তাকলীদযুক্ত ঈমানের চেয়ে তাকলীদমুক্ত ঈমানের মূল্য বেশি।

---

১৭৪. আল-মু'জামুল কাবীর, তাবরানী, হাদীস নং ৮৭৬৪, হাইসামী রাহ. বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/১৮০)
উল্লেখ্য, এখানে দ্বীন শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে 'আকীদা'। কেননা, দ্বীন শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো আকীদা। যেমন : সূরা শূরার ১৩ নং আয়াতে দ্বীন শব্দটি 'আকীদা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও পরবর্তী বাক্য থেকে উক্ত অর্থ হওয়াটা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। খতীব বাগদাদী রাহ.-ও উক্ত বাক্যের মধ্যে দ্বীন শব্দটি আকীদা অর্থে ব্যবহার করেছেন। (দেখুন, আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৩১-৩২)
কিন্তু লা-মাযহাবী বন্ধুরা বাক্যটিকে 'দ্বীনের কোনো ক্ষেত্রেই তাকলীদ বৈধ নয়' এই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। অথচ এটি পরবর্তী বাক্য (একজন ঈমান এনেছে বলে দ্বিতীয়জন ঈমান আনবে...) ও সালাফের বুঝের সাথে সাংঘর্ষিক, যেমনটি আপনারা দেখেছেন। আল্লাহ তাআলা সহীহ বুঝ দান করুন।

তৃতীয় অধ্যায়
কুফরের পরিচয় ও ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

কুফরের পরিচয়

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ؗ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'যে কেউ ঈমান-বিশ্বাসের বিষয়ে কুফর করবে, তার (ভালো) আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে।'[১৭৫]

অর্থাৎ ইসলামের যেসব বিষয়ের ওপর ঈমান আনা অপরিহার্য, তা যদি অবিশ্বাস, অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে বা এগুলোর প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে কাফেরদের মতো তার ভালো আমল নিষ্ফল। আখিরাতে যার কোনো প্রতিদান নেই।[১৭৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ

'আর দলগুলোর মধ্যে যারাই কুরআনকে অস্বীকার করবে, জাহান্নামই তার নির্ধারিত স্থান।'[১৭৭]

যত দল ও জাতি আছে, সকলকেই কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে হবে। যে তা করবে না, তার ঠিকানা হবে নিশ্চিত জাহান্নাম। অর্থাৎ আখিরাতের নাজাত পূর্ণাঙ্গ কুরআনের প্রতি ঈমান আনার ওপরই নির্ভরশীল।

তাই কুফরের সংজ্ঞা হচ্ছে,

عدم الإيمان عما من شأنه.

---

১৭৫. সূরা মায়েদা, (৫) : ৫

১৭৬. আয়াতটির ব্যাখ্যায় দেখুন, তাফসীরে তাবারী, মাতুরীদী, বাগাবী, নাসাফী, বায়যাবী, জালালাইন ও রুহুল মাআনী

১৭৭. সূরা হুদ, (১১) : ১৭

'যে সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনা অপরিহার্য, এর ওপর ঈমান না আনা।'[১৭৮]

একটা বিধানের ক্ষেত্রেও কুফর পাওয়া গেলে ঈমান থাকবে না

অনেকে মনে করেন, মুমিন হওয়ার জন্য যেভাবে ইসলামের সব বিধান বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হয়, তেমনই ঈমান নষ্ট হওয়ার জন্য ইসলামের সকল বিধানকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করতে হয়। অথচ অকাট্যভাবে প্রমাণিত যেকোনো একটা বিধানকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করলেই ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাফের হয়ে যাবে।

এর উদাহরণ হচ্ছে, হাওয়া দিয়ে বেলুন ফুলিয়ে ওড়ানোর জন্য সবখানে ভালো ও ফুটোমুক্ত হতে হয়, কিন্তু হাওয়া বের হওয়ার জন্য একটা ফুটোই যথেষ্ট। এভাবে বালতির মধ্যে পানি থাকার জন্য এবং পানিতে নৌকা ভাসার জন্য সম্পূর্ণ ভালো ও ছিদ্রমুক্ত হতে হয়, কিন্তু তলাতে একটা ফুটো ও ছিদ্র হলেই বালতির পানি বের হয়ে আসবে এবং নৌকা পানিতে ডুববে।

অনুরূপ মুমিন হওয়ার জন্য ইসলামের সবই বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হয়, কিন্তু ঈমান নষ্ট হওয়ার জন্য অকাট্য একটা বিধানকেই অবিশ্বাস বা অস্বীকার করাই যথেষ্ট। এ কারণেই শয়তান একটি সিজদার আদেশ অস্বীকার করার ফলে কাফের হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ

'যখন আমি আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।'[১৭৯]

সুতরাং ঈমানের গণ্ডিতে থাকতে হলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইসলামের সকল বিধানকেই বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হবে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।

---

১৭৮. শারহুল মাকাসিদ, তাফতাযানী, ৫/২২৪
১৭৯. সূরা বাকারা, (১) : ৩৪

তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।'[১৮০]

প্রখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস ইমাম তাবারী রাহ. (মৃ. ৩১০ হি.) বলেন,

ان المؤمن بالكتب والرسل هو المصدّق بجميع ما في الكتاب الذي يزعم أنه به مصدق، وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صدّق ببعض ذلك وكذّب ببعض: فهو لنبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحد، ومن جحد نبوة نبي فهو به مكذب.

'ওই ব্যক্তিকে কিতাব ও রাসূলগণের ওপর ঈমান এনেছে বলা হবে, যে তাঁর সত্যায়নকৃত কিতাবের সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনবে এবং যেই রাসূলের সত্যায়ন করছে, তাঁর আনীত সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি ওগুলোর মধ্য থেকে কিছু বিশ্বাস করল আর কিছু অবিশ্বাস করল, সে নবীর আনীত কিছু বিষয় অস্বীকার করার কারণে মূলত নবুওয়াতকেই অস্বীকার করল। আর যে কোনো নবীর নবুওয়াতকে অস্বীকার করল, সে নবীকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করল। (কাজেই সে মুমিন থাকতে পারে না।)'[১৮১]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'(হে নবী!) আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে সিদ্ধান্ত দানকারী মানবে। এরপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়।'[১৮২]

ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী রাহ. (মৃ. ৩৭০ হি.), ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৬০৬ হি.) ও ইবনে আদিল হাম্বলী (মৃ. ৭৭৫ হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, 'আয়াতটির ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহ বা রাসূলের কোনো (অকাট্য) বিধান প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাবে। এই আয়াত (আবু বকর রাযি.-এর খেলাফতকালে) যাকাত আদায় অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে মুরতাদ হওয়ার সিদ্ধান্ত আরোপ করে তাদের হত্যা ও শিশুদের বন্দি করার পক্ষে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান গ্রহণের বিষয়টি সঠিক ছিল বলে সাব্যস্ত করে।'[১৮৩]

---

১৮০. সূরা বাকারা, (২) : ৮৫

১৮১. জামিউল বয়ান বা তাফসীরে তাবারী, ৯/৩৫৩

১৮২. সূরা নিসা, (৪) : ৬৫

১৮৩. আহকামুল কুরআন, ২/২৬৮; আত-তাফসীরুল কাবীর, ১০/১২৪; আল-লুবাব ফী উলূমিল কিতাব, ৬/৪৫৬

CS CamScanner

একটু আগে যেই আয়াত উল্লেখ হয়েছে,

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'যে ব্যক্তি ঈমানের বিষয় প্রত্যাখ্যান করবে, তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে।'[১৮৪]

এখানেও ঈমানের বিষয় প্রত্যাখ্যান করলেই কাফের বলা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ)-এর বহুল আলোচিত বিবর্তনবাদ মেনে এ বিশ্বজগৎকে অবিনশ্বর বিশ্বাস করা অথবা মানুষ বানর থেকে উদ্ভব হয়েছে কিংবা মানুষ ও বানর-শিম্পাঞ্জি একটি সাধারণ প্রাইমেট-জাতীয় প্রাণী থেকে যাত্রা শুরু করে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে মনে করা কুফর।[১৮৫]

কেননা, এগুলো মানার অর্থ হচ্ছে একাধিক আয়াতকে অস্বীকার করা, যেখানে এ বিশ্বজগৎকে নশ্বর ও মানুষ সৃষ্টির তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

কাজেই যে বিবর্তনবাদের আড়ালে উপরিউক্ত কুফরী বিশ্বাস লালন করবে, সে কীভাবে মুমিন-মুসলিম থাকতে পারে?

ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. (মৃ. ১৮৯ হি.) বলেন,

وَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ: فَقَدْ أَبْطَلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

قال السرخسي في "شرح السير الكبير": معناه أنه يصير مرتدا، فيقتل إن لم يسلم. وبهذا اللفظ تبين خطأ من يقول من المتأخرين من أصحابنا: إن من أنكر شيئا من الشرائع فهو كافر فيما أنكره، مسلم فيما سوى ذلك.

'কেউ যদি ইসলামী বিধি-বিধানের কোনো বিষয় অস্বীকার করে, তাহলে নিশ্চিত তার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (তথা তার ঈমান) বাতিল বলে গণ্য হবে।'

ইমাম সারাখসী রাহ. (মৃ. ৪৮৩ হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'অস্বীকারের কারণে সে মুরতাদ হয়ে যাবে।'[১৮৬]

ইমাম আবু হানীফা রাহ. (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন,

من آمن بجميع ما يؤمن به إلا أنه قال: لا أعرف موسى وعيسى أمرسلان هما أم غير مرسلين: فهو كافر.

---

১৮৪. সূরা মায়েদা, (৫) : ৫

১৮৫. দ্র. ষষ্ঠ শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুসন্ধানী পাঠ বইটির পৃষ্ঠা ২৪, ২০২৩ ঈসায়ী

১৮৬. শারহুস সিয়ারিল কাবীর, সারাখসী, ৫/৩৬৮

'যে ব্যক্তি ঈমানের সকল বিষয় বিশ্বাস করল, তবে (শুধু একটা বিষয়ের ব্যাপারে) এ কথা বলল যে, মুসা ও ঈসা আ. উভয়জন রাসূল কি না আমার জানা নেই, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। (কেননা, উভয়জনকে রাসূল বিশ্বাস করা ফরজ।)'[১৮৭]

ইমাম মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.) বলেন,

من آمن بالكتب كلها والرسل ولم يؤمن بآية منها أو برسول منهم: فهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر ولا مصدق له.

'যে ব্যক্তি সকল কিতাব ও রাসূলের ওপর ঈমান আনল, কিন্তু কোনো একটি আয়াত বা কোনো একজন রাসূলের ওপর ঈমান আনল না, তাহলে সে মুমিন নয়।'[১৮৮]

কাযী ইয়ায মালেকী রাহ. (মৃ. ৫৪৪ হি.) লেখেন,

نَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ كُلِّ مَنْ كَذَّبَ وَأَنْكَرَ قَاعِدَةً مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ، وَمَا عُرِفَ يَقِينًا بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ مِنْ فعل الرسول ﷺ، وَوَقَعَ الْإِجْمَاعُ الْمُتَّصِلُ عَلَيْهِ، كَمَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الصلوات الخمس، وعدد رَكَعَاتِهَا وَسَجَدَاتِهَا...

'আমরা প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে সুনিশ্চিত কাফের মনে করি, যে শরীয়তের কোনো একটি মূলনীতি, অথবা রাসূল থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত ও সর্বসম্মত কোনো কাজ অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করে। যেমন : কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আবশ্যকতা এবং তার রাকাত ও সিজদা-সংখ্যা অস্বীকার করে।'[১৮৯]

পাকিস্তানের সাবেক মুফতী আযম শফী রাহ. (মৃ. ১৩৯৬ হি.) বলেন,

کفر صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے نہ مانے، بلکہ یہ بھی اسی درجہ کے کفر اور نہ ماننے کا ایک شعبہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام قطعی ویقینی طور پر ثابت ہیں، ان میں سے کسی ایک حکم کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے، اگرچہ باقی سب احکام کو تسلیم کرے اور پورے اہتمام سے سب پر عامل بھی ہو۔

'কুফর শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করার নাম নয়; বরং এটাও কুফরের অন্তর্ভুক্ত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অকাট্য ও সুনিশ্চিত প্রমাণিত বিধানের কোনো একটাকে অস্বীকার করা, যদিও সে বাকি সকল বিধানকে স্বীকার করে এবং সবগুলোর ওপর খুবই ইহতিমামের সাথে আমল করে।'[১৯০]

---

১৮৭. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি আবু মুতী' (প্রচলিত আল-ফিকহুল আবসাত), আকীদা নং ৩৩-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩১৮; আল-উসূলুল মুনীফা, পৃষ্ঠা ১০৮
১৮৮. তাফসীরে মাতুরীদী, ৫/৩৩৭
১৮৯. আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, ২/৬১২
১৯০. জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/১৩৩

CamScanner

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর 'আকীদা' গ্রন্থে বলেন,

وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ.

'আমাদের কিবলাপন্থীদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুমিন-মুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত করব, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত সকল বিধি-বিধান স্বীকার করবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন ও সংবাদ দিয়েছেন, তার সবই বিশ্বাস করবে।'[১৯১]

এর অর্থ হচ্ছে, কেউ মুমিন-মুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ ইসলামের সকল অকাট্য বিধি-বিধান বিশ্বাস ও স্বীকার করবে। কাজেই অকাট্য বিধি-বিধানের একটাও অবিশ্বাস ও অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

এ জন্যই কুফরের সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা সহকারে এভাবে বলা হয়েছে,

عدم تصديق النبي ﷺ في شيء مما علم مجيئه به ضرورة.

'অকাট্যভাবে প্রমাণিত এমন যেকোনো বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যায়ন ও বিশ্বাস না করা।'[১৯২]

সুতরাং কেউ যদি অস্বীকার না করে, কিন্তু ইসলামের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয়ে বিশ্বাস থেকে বিরত থাকে, তাহলে সেও কাফের বলে বিবেচিত হবে। কারণ, ঈমান হচ্ছে বিশ্বাসের নাম; কিন্তু তার থেকে বিশ্বাস পাওয়া যায়নি বিধায় তাকে মুমিন গণ্য করার সুযোগ নেই।

অনুরূপ যে ব্যক্তি সংশয়-সন্দেহ পোষণ করবে, সেও কাফের বলে গণ্য হবে। কারণ, তার থেকেও বিশ্বাস পাওয়া যায়নি। সংশয়-সন্দেহ বিশ্বাসের পরিপন্থী; বরং মুনাফিকের আলামত। কাজেই এমন লোকেরা সর্বসম্মতভাবে কাফের।

নিরানব্বইটা কুফর ও একটা ঈমানের বিষয় থাকলে কি কাফের হবে না?

প্রশ্ন : 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'সহ প্রায় ফাতাওয়ার কিতাবে রয়েছে,

وُجُوه تُوْجِبُ الْكُفْرَ وَوَجْهُ وَاحِدٌ يَمْنَعُ، فَعَلَى إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوه: الْمُفْتِي أَنْ يَمِيلَ إِلَى ذٰلِكَ الْوَجْهِ، إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِإِرَادَةِ مَا يُوْجِبُ الْكُفْرَ، فَلَا يَنْفَعُهُ التَّأْوِيلُ حِينَئِذٍ.

'যদি মাসআলায় কুফর সাব্যস্তকারী কয়েকটি (৯৯টি) দিক থাকে আর কুফর প্রতিহতকারী ১টি দিক থাকে, তাহলে মুফতীর জন্য জরুরি হলো, ওই ১টি দিকের

---

১৯১. আকীদাতুত তাহাবী

১৯২. শারহুল মাওয়াকিফ, জুরজানী, ৮/৩৬১; শারহুল মাকাসিদ, তাফতাযানী, ৫/২২৪-২৫

প্রতি ধাবিত হওয়া। তবে যখন উক্তিকারী কুফর সাব্যস্তকারী দিকটি উদ্দেশ্য হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তখন ব্যাখ্যা করা দ্বারা কোনো লাভ হবে না।'

এই বক্তব্যটি পেশ করে কেউ কেউ বলে, কারও মাঝে যদি ৯৯টি কুফর থাকে আর একটি ঈমানের বিষয় থাকে, তাহলে সে কাফের নয়। তাকে কাফের বলা যাবে না।

উত্তর : বক্তব্যটির অস্পষ্টতা দূর করার জন্য কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি—

১. ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. (মৃ. ১৩৫২ হি.) বলেন,

وَاعْلَم أَنَّ فِي كُتُبِ فقْهِنا أَنَّ مَنْ كان فيه تِسْعٌ وتسعونَ وجهاً مِنَ الكُفْرِ، وَوَجْهٌ مِنَ الإِسلامِ، فإِنَّهُ لا يُحْكَمُ عليه بالكُفْرِ. التبسَ هذا القول على بَعْضِ مَنْ لا دِرَايةَ لهم في الفقه، فَغَلِطُوا فِي مُرَادِهِ، وزَعَمُوا أَنَّ أحداً لو أَتَى على أَفْعَالِ الكُفْرِ عدَدَ ما ذَكَرْنَا وأَتَى بفعلٍ واحدٍ من الإِسلامِ: فإنَّه لا يَكْفُر.

وهو باطلٌ، ليس فيه أَدْنى ريبٍ وريبةٍ، كيفَ وأَنَّ مسلماً لو أَتَى بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الكُفْرِ: فإِنَّه يَكْفُر، فكيف إذا كان جُلُّ أَفْعَالِه كُفْرَاً؟ وإِنَّما كانت مسألةُ الفُقَهاءِ فِي جنسِ الأَقْوال، فَنَقَلُوهُ فِي الأفعال، ومُرَادُهم أَنَّ أحداً منهم لو قال كلمةً احْتَمَلَت وجهاً مِنَ الإِسلامِ: نَحْمِلُها عليه، ولا نَحْمِلُها على أَوْجُه الكُفْرِ وإِنْ كثُرتْ؛ لأَنَّا ما لم نتبين الحال، ولم نَدْرِ أَنَّه أَرَادَ هذا الاحتمال: لا نَحْكُم عليه بالكفر بتلكَ الكلمة المحتملة، ولا نبادر إلى الإِكْفَارِ.

أَمَّا إذا تَبيَّنَ غَيُّه من رُشْدِهِ، وانفَصَلَ اللَّبَنُ عَنِ الرَّغْوَة، وحَصْحَصَ الحقُّ، وظَهَرَ الباطلُ، ولم يبْقَ أَمْرُهُ كالأفواه، تَنَقَّلَ مِنْ بلدٍ إلى بلدٍ، بل أَعْلَنَ بكُفْرِهِ على المنائرِ والمنابرِ، وسوَّد به الصحائف والدفاتر: فإِنَّه كافرٌ مُكَفَّرٌ بلا رَيبٍ، ولا يَتَأَخَّرُ عن إِكْفَارِه إلا مُصَابٌ أو جاهلٌ. ولو كان معنى كلامِهم ما فهموه: لما سَاغَ حُكْمُ الكُفْرِ على أحدٍ أَبَدَ الدَّهْرِ، وَمَنْ يَعْجَزُ عن إِخْرَاجِ احتمالٍ ضعيفٍ. وهذا مسيلمة الكذَّاب، قد كان يَشْهَدُ بنبوةِ سيدِنا ونبيِنا محمدٍ صلى الله عليه وسلّم إلا أَنَّهُ كان يُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِكَ معه في الأمر، فهل أَنقَذَهُ ذلك مِنَ الكُفْرِ والضَّلالِ، فليَتَنَبَّه العلماءُ لهذه الدَّقِيقةِ، ولا يَتَأَخرُوا في مثلِ هذه المحال، ولْيَخْشَ العزيزَ الجبار، فإِنَّه شديدُ المَحال.

'আমাদের ফিকহের কিতাবসমূহে আছে, "যে ব্যক্তির মধ্যে কুফরীর ৯৯টি দিক আছে, আর ঈমানের ১টি দিক আছে, তাকে কাফের বলা যাবে না।" যাদের ফিকহের জ্ঞান নেই, তাদের কতকের কাছে উক্তিটি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। ফলে মর্ম বুঝতে তারা ভুল করেছে। তারা মনে করেছে, কোনো ব্যক্তি যদি ৯৯টি কুফরী কর্ম করে, আর একটিমাত্র ইসলামের কর্ম করে, তাহলে সে কাফের হবে না।

তাদের এ ধারণা বাতিল। এতে সামান্যতম সংশয় ও সন্দেহ নেই। এমন ধারণা কীভাবে সঠিক হয় যখন বাস্তবতা হলো, কোনো মুসলমান একটিমাত্র কুফরী কাজ করলেও কাফের হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কেমন পরিণতি হবে ওই ব্যক্তির, যার অধিকাংশ কর্ম কুফরী!?

CS CamScanner

বস্তুত ফকীহগণের বিষয়টি ছিল কওল তথা বক্তব্য-সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তারা একে কর্মের ক্ষেত্রে স্থানান্তর করেছে। ফকীহগণের উদ্দেশ্য হলো, যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো উক্তি করে, যা ইসলামের অনুকূল হওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে, আমরা তার সে অর্থ গ্রহণ করব। উক্তিটি কুফরী হওয়ার অনেক সম্ভাবনা থাকলেও সে অর্থ গ্রহণ করব না, যতক্ষণ না অবস্থা যাচাইপূর্বক জানব যে, সে উক্ত সম্ভাবনা গ্রহণ করেছে। এই যাচাই করার পূর্বে তাড়াহুড়া করে তাকে কাফের বলব না।

তবে যখন কারও গোমরাহী তার হেদায়েত থেকে সুস্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে যাবে, দুধ ফেনা থেকে আলাদা হবে, সত্য প্রতিভাত হবে, মিথ্যা প্রকাশ পাবে, তার বিষয়টি মুখের কথার মতো থাকবে না, এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হবে, বরং সে মিনার ও মিম্বারে তার কুফরের ঘোষণা করবে, কুফর লিখে লিখে কাগজপত্র ও খাতা-খতিয়ান কালো করবে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে কাফের এবং তাকে তাকফীর করা হবে। তাকে কাফের বলা থেকে শুধু সে-ই পিছিয়ে থাকবে, যে মূর্খ অথবা সঠিক জানার ভানকারী।

ফকীহদের উক্তির অর্থ যদি সেটাই হতো যা এ সকল লোকগুলো বুঝেছে, তাহলে কখনো কারও ওপর কুফরের হুকুম আরোপিত হতো না। কারণ, কে এমন আছে, যে (তার উক্তি বা কর্ম সঠিক হওয়ার) কোনো দুর্বল সম্ভাবনা দেখাতে অক্ষম হবে?

মুসায়লামাতুল কাযযাব—সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত স্বীকার করত। তবে শুধু নবুওয়াতের কিছু বিষয়ে সে অংশীদারের দাবি করত। তার এই নবুওয়াতের স্বীকার কি তাকে কাফের ও গোমরাহ হওয়া থেকে রক্ষা করতে পেরেছে? উলামায়ে কেরাম এই সূক্ষ্ম বিষয়ে সতর্ক থাকুন, এ ধরনের অসম্ভব বিষয়ের কারণে তাকফীর করা থেকে বিরত থাকবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন।'[১৯৩]

২. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) 'নিরানব্বই কুফর ও এক ঈমান'-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ننانوے باتیں کفر کی موجب پائی جاویں تب بھی فتوی نہ دیں گے، ننانوے تو بہت ہوتی ہیں اگر ایک امر بھی موجب کفر یقینی پایا جاوے تب بھی فتوی دینگے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خود اس امر میں بہت سے احتمال ہیں بعض احتمالات پر تو وہ موجب کفر ہے اور وہ احتمالات ننانوے ہیں اور بعض احتمال پر وہ موجب کفر نہیں اور وہ ایک ہے تو اس صورت میں اس امر کو محمول اسی احتمال پر کرینگے جو موجب کفر نہیں اور تکفیر سے احتیاط کریں گے۔

'কথাটির এই অর্থ নয় যে, নিরানব্বই কথা এমন বলল যেগুলোর দ্বারা কুফর আবশ্যক হয়, তখনো তাকে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে না। নিরানব্বই তো অনেক

---

১৯৩. ফয়যুল বারী, ৬/৪০৩

দূরের বিষয়, যদি একটি বিষয়ও সুনিশ্চিতরূপে কুফর হয়, তখনো কাফের বলা হবে। আর কথাটির (নিরানব্বই কুফর-এক ঈমান) অর্থ হলো, কোনো কাজ বা কথা, যার অনেকগুলো সম্ভাবনা আছে, যেমন নিরানব্বইটি দিক কুফরকে আবশ্যক করে, আর একটি সম্ভাব্য দিক কুফরকে আবশ্যক করে না, তখন কাফের আখ্যায়িত করা হবে না; বরং সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।'[১৯৪]

৩. শায়খুত তাফসীর মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রাহ. (মৃ. ১৩৯৪ হি.) বলেন, 'আলেমগণের মধ্যে এমন একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে, যার মধ্যে ৯৯ ভাগ কুফর আছে এবং এক ভাগ ঈমান আছে, তাকে কাফের বলা যাবে না। কিন্তু এটা জানা উচিত, এর অর্থ এই নয়—যে ব্যক্তি দ্বীনের ৯৯টি কথাকে অস্বীকার করে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং দ্বীনের একটিমাত্র কথাকে স্বীকার করে, তাকে কাফের বলা যাবে না। এটা চরম ভুল। কেননা, এ কথার ভিত্তিতে তো ইহুদী-খ্রিষ্টানদেরও কাফের বলা যাবে না। কারণ, ইহুদী-খ্রিষ্টানরা ইসলামের কমপক্ষে ৫০ ভাগ কথাকে মানে। ইসলামের সব কথাকে অস্বীকার করে এমন কোনো কাফের দুনিয়াতে নেই।

এই বক্তব্যের অর্থ হলো, অস্পষ্ট ও সংশয়পূর্ণ কোনো কথা যদি কেউ মুখ থেকে বের করে ফেলে, যে কথার মধ্যে ৯৯ ভাগ কুফরীর সম্ভাবনা থাকে এবং এক ভাগ ঈমানের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এমন সংশয় ও সন্দেহমূলক কথার ওপর ভিত্তি করে তাকে কাফের বলা যাবে না।

আচ্ছা, কোনো ব্যক্তি যদি শরীয়তের ৯৯ শতাংশ হুকুম মানে, কেবল এক শতাংশ না মানে, যেমন : ব্যভিচার, মদপান ও ঘুষ খাওয়াকে হালাল মনে করে, তাহলে সে কি কাফের হবে না? যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের ৯৯টি আইন মানে, কেবল একটি আইন মানে না, সে ব্যক্তি প্রশাসনের নিকট বিদ্রোহী বলে বিবেচিত হবে এবং ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তার জন্য অবধারিত; অথচ সে ৯৯টি আইন মান্য করে কেবল একটি আইনের বিরোধিতার কারণে তাকে এই শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে।'[১৯৫]

'নাওয়াকিদুল ঈমান'/'নাওয়াকিদুল ইসলাম' পরিচিতি, সংখ্যা ও কিতাব

আমরা জানি ওযু ভঙ্গের কারণ আছে, নামাজ নষ্টের কারণ আছে। ওযু করার পর ও নামাজ শুরু করার পর নির্দিষ্ট কিছু কাজ করলে যেমন ওযু ভেঙে যায় ও নামাজ নষ্ট হয়, ঠিক তেমনই ঈমান আনার পর কিছু বিশ্বাস, কথা ও কাজ করলেও ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়। এগুলোকে 'নাওয়াকিদুল ঈমান' বা 'নাওয়াকিদুল ইসলাম' বলে।

কিন্তু এ নাওয়াকিদ আমরা জানি না। ফলে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী ও তাহাজ্জুদ

১৯৪. ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১০/৯১; আরও দেখুন, ১১/৫৭৭
১৯৫. আকায়েদুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৯১; আরও দেখুন, জাওয়াহিরুল ফিকহ, মুফতী শফী, ১/১০৩

CamScanner

আদায়ের দাবিকারীর আচরণ-উচ্চারণেও এমন কিছু প্রকাশ পাচ্ছে, যা সর্বসম্মত আকীদা-বিরোধী ও সরাসরি ঈমান বিনষ্টকারী।

মুমিন হওয়ার পর ঈমান বিনষ্টকারী কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা ফরজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে ইরশাদ করেন,

يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

'সকালের মুমিন সন্ধ্যায় ঈমানহারা কিংবা সন্ধ্যার ঈমানদার সকালে ঈমানছাড়া। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থে নিজের দ্বীনকে বিকিয়ে দেবে।'[১৯৬]

অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে মানুষ ঈমানহারা হবে।

এ জন্য প্রখ্যাত ফকীহ ইবনে আবিদীন শামী রাহ. (মৃ. ১২৫২ হি.) কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা একজন মুমিনের জন্য ফরজে আইন—এর তালিকায় ইউসুফ রূমীর (মৃ. ৯৮৬ হি.) 'তাবয়ীনুল মাহারিম' থেকে উল্লেখ করে বলেন,

لَا شَكَّ فِي فَرْضِيَّةِ ... عِلْمِ الْأَلْفَاظِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْمُكَفِّرَةِ، وَلَعَمْرِي هَذَا مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ فِي هَذَا الزَّمَانِ؛ لِأَنَّكَ تَسْمَعُ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَّامِ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا يُكَفِّرُ، وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ.

'হারাম ও কুফরী শব্দ (যে কথা বা কাজ করলে ঈমান চলে যায়) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। কসম—বর্তমান সময়ে যে সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য—তন্মধ্যে এটি অন্যতম। কারণ, অনেক মানুষ কুফরী কথা বলে, যা তাকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। অথচ এ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন!'[১৯৭]

এই ফরজের প্রতি আমরা চরম উদাসীন, এটি আমাদের মাঝে অবহেলিত 'ফরজে আইন'। এ বিষয়ে আমরা ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবসমূহে শুধু 'মুরতাদ' অধ্যায় দেখলে এর গুরুত্ব বুঝে আসবে।

ঈমান ভঙ্গের কারণ ও কুফরী বাক্যগুলো নিয়ে আকীদা, ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবসমূহে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা রয়েছে, যেগুলোর সংখ্যা প্রায় ৪০০ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এগুলোর বড় একটা অংশ একত্রিত করে 'আলফাযুল কুফর' নামে স্বতন্ত্রভাবে সর্বপ্রথম কিতাব রচনা করেছেন আল্লামা বদরুর রশীদ হানাফী রাহ. (মৃ. ৭৬৮ হি.)। তিনি মূলত এটা হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ১৩টি গ্রন্থ থেকে সংকলন করেছেন। যদিও অনেকগুলো ঈমান ভঙ্গের কারণ হওয়া নিয়ে কথা ও ব্যাখ্যা রয়েছে, তবে এ বিষয়ে ভালো একটা ধারণা পাওয়া যাবে এবং এগুলো থেকে বেঁচে

১৯৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮

১৯৭. ফাতাওয়া শামী, ১/১৩৯-৪০, ড. হুসামুদ্দীন ফারফুরের নুসখা

থাকার জন্য সতর্কতা তৈরি হবে। আর উক্ত কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেছেন প্রখ্যাত হাদীস-ব্যাখ্যাকার মোল্লা আলী কারী মাতুরীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.)।[১৯৮]

অথচ কেউ কেউ মনে করেন, এ বিষয়ে শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী রাহ. (মৃ. ১২০৬ হি.) সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন। এর চেয়ে মারাত্মক বিষয় হচ্ছে, তিনি 'নাওয়াকিদুল ইসলাম' নামক পুস্তিকায় ঈমান ভঙ্গের যে দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন, এগুলোকেই মূল কারণ ও সর্বসম্মত মনে করা হয়। কিন্তু এর কোনোটিই সঠিক নয়।[১৯৯]

'নাওয়াকিদুল ঈমান' বা 'নাওয়াকিদুল ইসলাম' কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং যে সকল বিশ্বাস, বক্তব্য বা কাজ ঈমান নষ্ট ও ভঙ্গের কারণ হবে, তার সবই এতে অন্তর্ভুক্ত। তবে স্থান ও কালভেদে এগুলোর সংখ্যা ও রূপ-প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে।

'আলফাযুল কুফর' বা 'কুফরী উক্তি' তাকফীরের জন্য নয়

কেউ কেউ ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবসমূহের 'আলফাযুল কুফর' বা 'কুফরী উক্তিগুলোকে' তাকফীরের (কাউকে কাফের আখ্যা দেওয়ার) জন্য মনে করে বসেছে; অথচ তা কখনো সঠিক নয়।

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইবনে নুজাইম মিসরী রাহ. (মৃ. ৯৭০ হি.) তাঁর জগদ্বিখ্যাত কিতাব 'আল-বাহরুর রায়েক'-এর আহকামুল মুরতাদের আলোচনায় 'আলফাযুল কুফর' এবং একজন মানুষ কী কী আকীদা রাখলে ও কাজ করলে কাফের হয়ে যাবে, তা বিস্তারিত উল্লেখ করে সতর্কতার জন্য লেখেন,

---

১৯৮. উভয় কিতাবের ওপর ১৯৯৮ সালে মক্কা মুকাররমার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেটের থিসিস হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরও অনেকে লিখেছেন। তবে চার মাযহাবের কিতাব থেকে সংকলন করে সুন্দর কিতাব রচনা করেছেন শাফেয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ ইবনে হাজার মাক্কী হাইতামী রাহ. (মৃ. ৯৭৪ হি.) 'আল-ই'লাম বি-কাওয়াতিয়িল ইসলাম' নামে।

চার মাযহাবের মধ্যে হানাফী মাযহাব ঈমান ভঙ্গের কারণ ও কুফরী বাক্যগুলো নিয়ে সবচেয়ে বেশি মৌলিক, প্রামাণিক ও সুদৃঢ় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (মৃ. ১২৫২ হি.) রাহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী এ বিষয়ে সবচেয়ে ব্যাপক ও সুসংহত কাজ করেছেন ইমাম নিশানজীযাদা রাহ.।

তিনি কুফর ও তাকফীরের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনাসহ ফকীহগণের তাহকীক সংকলন করেছেন। তাঁর সেই গ্রন্থের নাম تنوير الجنان في بيان حفظ الإيمان. যা তাঁর কিতাব نور العين في إصلاح جامع الفصولين গ্রন্থের পরিশিষ্টে রয়েছে।

এ ছাড়া ফাতাওয়া আলমগীরী (ফাতাওয়া হিন্দিয়া) কিতাবেও এ বিষয়ে বিস্তৃত ও উপকারী আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেহেতু এর রচনাকাল অনেক পরে, তাই এতে কুফর ও তাকফীরের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ফকীহগণের তাহকীকের অধিকাংশ সারনির্যাস স্থান পেয়েছে। দ্র. উসূলে তাকফীর, মুফতী উবায়দুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ। এই কিতাব তালিবে ইলমদের অবশ্যই মুতালাআ করা চাই।

১৯৯. এ বিষয়ে সবিস্তারে জানতে দেখুন শায়খ সালাহুদ্দীন ইদলিবীর 'নাওয়াকিদুল ঈমান ফী মীযানিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ' কিতাবটি। এর অনুবাদ রাহনুমা থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'কুফর ও তাকফীরের ভুল নীতি' নামে।

وَالَّذِي تَحَرَّرَ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِتَكْفِيرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ، أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ اخْتِلَافٌ، وَلَوْ رِوَايَةً ضَعِيفَةً، فَعَلَى هَذَا فَأَكْثَرُ أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ الْمَذْكُورَةِ لَا يُفْتَى بِالتَّكْفِيرِ بِهَا، وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِيَ بِشَيْءٍ مِنْهَا.

'কোনো মুসলমানকে এমন উক্তির কারণে কাফের ফতোয়া দেওয়া যাবে না, যার গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, অথবা যার কুফর হওয়া নিয়ে কোনো মতপার্থক্য রয়েছে, যদিও তা দুর্বল বর্ণনা হয়। সুতরাং এ হিসেবে উল্লিখিত অধিকাংশ 'আলফাযুল কুফর' দ্বারা কাফের হওয়ার ফতোয়া দেওয়া যাবে না।

আর আমি নিজের ওপর আবশ্যক করে নিলাম যে, এগুলোর কোনো একটা দিয়ে আমি কাউকে তাকফীর করব না।'[২০০]

মুফতী আযম শফী রাহ. (মৃ. ১৩৯৬ হি.) 'ঈমান আওর কুফর: কুরআন কী রোশনী মেঁ' রিসালায় বলেন, 'দ্বীনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ কতিপয় নামধারী আলেম তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যা দেওয়ার পেশা গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের মধ্যে একে অপরকে কাফের আখ্যা দেওয়ার ফতোয়া চলতে থাকে।'

ফিকহের কিতাবসমূহে বিভিন্ন উক্তিকে 'কুফরী উক্তি' বলা হয়েছে। তারা এ সকল উক্তি দ্বারাও প্রতারিত হয়েছে। উক্তিগুলোর সারকথা এটুকুই, যে সকল কথা দ্বারা ইসলামের কোনো অকাট্য বিষয় অস্বীকার করা সাব্যস্ত হয়, সেগুলো কুফরী উক্তি।

তবে **ফকীহগণ পরিষ্কার ভাষায় এটিও বলেছেন, এ উক্তিগুলোকে কুফরী উক্তি সাব্যস্ত করার অর্থ আদৌ এই নয় যে, যার মুখ থেকে এগুলো বের হবে, কোনো ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও উদ্দেশ্য যাচাই-বাছাই করা ছাড়াই তাকে কাফের বলে দেওয়া হবে; বরং কাউকে কাফের তখন আখ্যা দেওয়া হবে, যখন প্রমাণিত হবে যে, উক্তিগুলোর ওই অর্থ ও মর্মই তার উদ্দেশ্য, যাতে কুফরী আকীদা বা ইসলামের কোনো জরুরি বিষয়ের অস্বীকৃতি রয়েছে।**

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত লোকেরা ওই শব্দগুলোকেই সিদ্ধান্তের ভিত্তি বানিয়ে নিয়েছে এবং তাকফীরবাজি (কাফের আখ্যা দেওয়া) শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে মুসলমানকে কাফের আখ্যা দেওয়ার মতো জঘন্য ঘটনা ঘটছে। পুরো মুসলিম সমাজে তার মন্দ প্রভাব পড়ছে। তাতে কাফের আখ্যাদানকারী ব্যক্তির নিজের ঈমানও ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

অপরদিকে কাফের আখ্যাদানের ফতোয়া একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

---

২০০. আল-বাহরুর রায়েক, ৫/২১০, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া দেওবন্দ; আরও দেখুন, ফাতাওয়া শামী, ৬/৩৮৫, মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ৭/২৮২

ইসলামের যে সকল দাবিদার বাস্তবে কাফের, তাদের এ কথা বলার সুযোগ হয়ে গেছে যে, মানুষ তো একজন অপরজনকে তাকফীর করেই। আমরাও সেই তাকফীরবাজির শিকার!

তাই ইসলামের দাবিদার কাউকে কাফের আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত স্তরের সতর্কতা অবলম্বন করার বিষয়টি পরিষ্কার করা প্রয়োজন ছিল। সাধারণ সাধারণ কথার কারণে, বা সম্ভাব্য ও অস্পষ্ট কথার ভিত্তিতে, উদ্দেশ্য যাচাই না করে এমন ফতোয়া দেওয়ার মধ্যে নিজের ঈমানের ঝুঁকি রয়েছে।'[২০১]

উল্লেখ্য, সামনে ঈমান ভঙ্গের কারণ ও রূপসমূহের আলোচনা পড়েও এগুলোর কোনো একটা কারও মাঝে দেখেই তাকফীর করা যাবে না।

বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির কবলে কুফর ও তাকফীর

কাউকে কাফের বলা বেশ জটিল ও অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। একজন মুসলমানকে অকাট্য উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাফের বলার ওপর যেমন কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে, তেমনই একজন নিশ্চিত কাফেরকে সুস্পষ্ট কারণ থাকার পরও মুসলমান মনে করলে বড় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তবে প্রথমটার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

ইমামুল হারামাইন জুয়াইনী রাহ. (মৃ. ৪৭৮ হি.) বলেন,

إِنَّ إِدْخَالَ كَافِرٍ فِي الْمِلَّةِ، وَإِخْرَاجَ مُسْلِمٍ عَنْهَا: عَظِيمٌ فِي الدِّينِ.

'কোনো কাফেরকে ইসলামে প্রবেশ করানো (তথা মুসলিম বলা) অথবা কোনো মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া (তথা কাফের বলা) দ্বীনের মধ্যে খুব কঠিন ও গুরুতর বিষয়।'[২০২]

মোল্লা আলী কারী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) এটা নকল করার পর বলেন,

والثاني أصعب من الأول، فتأمل.

'প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি বেশি খতরনাক। অর্থাৎ কোনো কাফেরকে মুসলিম বলার চেয়ে মুসলমানকে কাফের আখ্যা দেওয়া কঠিন বিষয়।'[২০৩]

মুফতী শফী রাহ. বলেন, 'কোনো মুসলমানকে ভুলভাবে কাফের আখ্যা দেওয়াকে হাদীসে স্বয়ং আখ্যাদানকারী ব্যক্তির জন্য কুফরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই কুফরী সাব্যস্ত করা চাই শুধু হুমকিদান ও ভীতিপ্রদর্শনের জন্য হোক—যেমনটি কতিপয়

---

২০১. দ্র. জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/৯৯-১০০; ঈমান-কুফর ও তাকফীর, পৃষ্ঠা ১০০-১০১
২০২. আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, কাযী ইয়ায, ২/৫৯৫; শারহে মুসলিম, নববী, ৭/১৬০
২০৩. শারহুশ শিফা, ২/৪৯৯

ফকীহ বলেছেন—অথবা তা দ্বারা প্রকৃত কুফরীই উদ্দেশ্য হোক, সর্বাবস্থায় হাদীস দ্বারা এ ফলাফল অবশ্যই বের হয় যে, ইসলামের দাবিদার কাউকে কাফের আখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।'[২০৪]

বস্তুত ইসলামের দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে 'কাফের' অথবা কোনো কাফেরকে 'মুসলমান' বলা, উভয়টিই অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে উভয় আচরণের কঠিনভাবে নিন্দা করেছেন। ইসলামের দাবিদারকে কাফের আখ্যা দেওয়া সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ

'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করবে, তখন যাচাই-বাছাই করে দেখবে। কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে তাকে বলবে না যে, "তুমি মুমিন নও।"'[২০৫]

এ আয়াত থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানরূপে প্রকাশ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ নিশ্চিতরূপে তার কুফরী সাব্যস্ত না হবে, তাকে কাফের আখ্যা দেওয়া নাজায়েয এবং কঠিন শাস্তির কারণ।

এর বিপরীতে কোনো কাফেরকে মুসলমান সাব্যস্ত করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে নিম্নের আয়াতে,

أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ

'তোমরা কি তাকে পথে আনতে চাও, যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন?'[২০৬]

'তাফসীরে জালালাইনে' أَنْ تَهْدُوْا -এর তাফসীর করা করা হয়েছে এভাবে,

أَيْ: أَنْ تَعُدُّوْهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمُهْتَدِيْنَ.

অর্থাৎ 'কাফেরদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্ত গণ্য করা।'

'তাফসীরে নাসাফীতে' এর তাফসীরে এসেছে,

أتريدون أن تسموهم مهتدين، وقد أظهر الله ضلالهم، فيكون تعييراً لمن سماهم مهتدين.

---

২০৪. দ্র. জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/১০৩-১০৪; ঈমান-কুফর ও তাকফীর, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৬

২০৫. সূরা নিসা, (৪) : ৯৪

মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'এ আয়াতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের সামনে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস স্বীকার করে নেয়, তবে আমরা তাকে মুসলিমই মনে করব আর তার মনের অবস্থা আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেবো।

প্রকাশ থাকে যে, আয়াতে আদৌ এরূপ বলা হয়নি যে, কোনো ব্যক্তি কুফরী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও কেবল "আস-সালামু আলাইকুম" বলে দেওয়ার কারণে তাকে মুসলিম গণ্য করতে হবে।' দ্র. তাওযীহুল কুরআন

২০৬. সূরা নিসা, (৪) : ৮৮

'তোমরা কি তাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্ত বলতে চাও, যাদের ভ্রষ্টতা আল্লাহ প্রকাশ করে দিয়েছেন? কাজেই এটা ভর্ৎসনা হলো তাদের জন্য, যারা তাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্ত বলবে।'

সালফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবিয়ীন ও পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণ এ বিষয়ে বড় সতর্কতার সাথে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। ফিকহ ও আকায়িদ বিষয়ের আলেমগণের নিকট এ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্গম ক্ষেত্র। এ অঙ্গনে প্রবেশকারীদেরকে তাঁরা অনেক সতর্ক ও সচেতন থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

কিন্তু বর্তমানে এর বিপরীতে উভয় বিষয়কে এতই সাধারণ মনে করা হচ্ছে যে, কুফর ও ইসলাম এবং ঈমান ও ইরতিদাদ (ইসলাম ধর্মত্যাগ)-এর কোনো মানদণ্ড এবং মূলনীতিই বাকি থাকেনি।

একটি দল তো তাকফীরবাজিকে তাদের ব্যস্ততাই বানিয়ে রেখেছে। শরীয়তের বিপরীত, বরং তাদের স্বভাবের বিপরীত সামান্যতম কিছু প্রকাশ পেলেই তাদের পক্ষ থেকে কুফরীর ফতোয়া লেগে যায়। সামান্য থেকে সামান্য শাখাগত কথার কারণে মুসলমানদেরকে ইসলাম-বহির্ভূত আখ্যা দিতে শুরু করে।

অপরদিকে আরেকটি দলের অবস্থা হলো, তাদের নিকট ইসলাম ও ঈমানের কোনো বাস্তবতাই নেই। তারা ইসলামের দাবিদার প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুসলমান গণ্য করে; সে পুরো কুরআন, হাদীস ও ইসলামের বিধি-বিধানের অস্বীকার ও অবজ্ঞা করলেও। তাদের নিকট ইসলামের সঙ্গে প্রত্যেক প্রকার কুফরীর সহাবস্থান সম্ভব। তারা হিন্দু ও অন্যান্য বাতিল ধর্মের মতো ইসলামকেও নিছক একটি জাতীয় উপাধি বানিয়ে রেখেছে। যে আকীদাই পোষণ করুক এবং যে রকম উক্তি ও কর্মই করুক, সর্বাবস্থায় ব্যক্তি মুসলমান থাকে। একে তারা চিন্তার ব্যাপকতা ও সাহসের ব্যাপ্তি বলে প্রকাশ করে।

কিন্তু ইসলাম ও ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বক্র দৃষ্টিকোণ এবং বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা—উভয় প্রান্তিকতার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। ইসলাম নিজ অনুসারীদের জন্য একটি আসমানী নীতি পেশ করেছে। যে ব্যক্তি তা প্রশান্ত মনে গ্রহণ করবে এবং মান্য করার ব্যাপারে মনে কোনো সংকীর্ণতা অনুভব করবে না, সে মুসলমান।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর এ ধর্মের কোনো অকাট্য বিধান অস্বীকার করবে, সে নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতভাবে ইসলামের সীমাবহির্ভূত। তাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করার ব্যাপারে ইসলাম অসন্তুষ্ট। তার দ্বারা মুসলিম সমাজের আদমশুমারি বৃদ্ধি করা ইসলাম ও মুসলমানদের আত্মমর্যাদায় আঘাত। এই কতিপয় লোককে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করার দ্বারা হাজার হাজার মুসলমানের ইসলাম থেকে বের হয়ে

যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এটি আমাদের বহুবারের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ।'[২০৭]

তিনি আরও বলেন, 'কাফের আখ্যা দেওয়া ভারি অসতর্কতা ও নিজের ঈমানকে ঝুঁকিতে ফেলার নামান্তর। কেননা, তখন ঈমানকে কুফর আখ্যা দেওয়া আবশ্যক হয়। তদ্রূপ কোনো নিশ্চিত কাফেরকে মুসলমান আখ্যা দেওয়াও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অপরাধ এবং নিজের ঈমানকে ঝুঁকিতে ফেলার নামান্তর। কেননা, তখন কুফরকে ঈমান বলা আবশ্যক হয়ে যায়।

বলাবাহুল্য, যদি ঈমানকে কুফর অথবা কুফরকে ঈমান বলা স্বজ্ঞানে ও ইচ্ছাপূর্বক হয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে কুফর। অন্যথায় কুফরের ঝুঁকি থেকে তো অবশ্যই মুক্ত নয়। (অর্থাৎ যদি ঈমানকে কুফর এবং কুফরকে ঈমান আখ্যা দেওয়া স্বজ্ঞানে ও ইচ্ছাপূর্বক না হয়, তাহলেও তা কুফরীর ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়।)

তা ছাড়া কোনো কাফেরকে মুসলমান বলে দেওয়া শুধু একটি শব্দের উদারতা নয়; বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী সমাজের ওপর বিরাট অবিচার। কারণ, তাতে পুরো উম্মাহর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিবাহ, বংশ, উত্তরাধিকার, কুরবানী, ইমামতি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার—সবগুলোর ওপর প্রভাব পড়ে।

এ ক্ষেত্রে সামান্য অসতর্কতা একজন প্রকৃত মুসলমানকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করতে পারে, আবার ইসলামের একজন শত্রু কাফেরকে ইসলামী সমাজের আস্তিনের সাপ ও কপট বন্ধু বানাতে পারে। আর এ উভয় ঝুঁকি উম্মাহর জন্য অনেক ভয়ংকর এবং সেগুলোর ফলাফল ও পরিণতি সুদূরপ্রসারী।'[২০৮]

আর কোনো মুসলিমকে তাকফীর করার অর্থ হচ্ছে, তার ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত দেওয়া যে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে এবং এখন থেকে তার ওপর কাফের ও মুরতাদের বিধান প্রয়োগ হবে। যেমন : মুসলিমের সাথে তার বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া, মুসলিম পিতার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া, মুসলমানদের কবরে দাফন না করা ইত্যাদি। তাই এটা সাধারণ বিষয় না।

সাবিত ইবনে দাহহাক রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ.

'ঈমানদারকে লানত করা (অভিশাপ দেওয়া) তাকে হত্যার মতো। আর যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদারকে কুফরীর অপবাদ দিল, তাহলে সে যেন তাকে হত্যা করল।'[২০৯]

---

২০৭. দেখুন, উসূলুল আফকার ফী উসূলিল ইকফার, মুফতী শফী রাহ.-এর সূত্রে জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/১০৬-১০৯, অনুবাদ : ঈমান-কুফর ও তাকফীর, পৃষ্ঠা ১১১-১১৫

২০৮. জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/১০৪-১০৫, ঈমান-কুফর ও তাকফীর, পৃষ্ঠা ১০৯

২০৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১০৫

তাকফীরের উসূল ও মূলনীতি সংক্ষিপ্তাকারে জানার জন্য দেখুন, **মুফতী তাকী** উসমানী হাফিযাহুল্লাহর 'ইনআমুল বারী' ১/৩১৯-৩৩৫ পৃষ্ঠা; আর বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলে দেখতে পারেন, মুফতী উবায়দুর রহমান হাফিযাহুল্লাহর 'উসূলে তাকফীর' নামক সাড়ে চারশ পৃষ্ঠার কিতাবটি।

কুফর ও তাকফীরের মাঝে পার্থক্য

'কুফর'—যার সংজ্ঞা ও বিবরণ ওপরে সবিস্তারে উল্লেখ হয়েছে। সহজে বললে, যে সকল বিশ্বাস, কথা বা কাজকে ঈমান ভঙ্গের কারণ বা কুফর অপরিহার্যকারী বলা হয়েছে অনির্দিষ্টভাবে। যেমন : ফাতাওয়ার কিতাবে রয়েছে, 'এমন বিশ্বাস যে রাখবে, সে কাফের', 'এমন কথা যে বলবে, সে কাফের' ইত্যাদি।

আর 'তাকফীর' হলো, ঈমান ভঙ্গের কারণ বা কুফর পাওয়া গেলে এবং কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকলে কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে কাফের বলা। দুটো এক বিষয় নয়। কেননা, অনেক সময় কুফর পাওয়া গেলেও প্রতিবন্ধকতা থাকার ফলে তাকফীর করা যায় না। এ কারণেই কুফর তাকফীরকে আবশ্যক করে না।

অর্থাৎ কুফরী কাজ করলেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি-মুসলমান কাফের সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক নয়; বরং এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বাধা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন : জাহালত-অজ্ঞতা, ইকরাহ-বাধ্য হওয়া, তাবীল-ব্যাখ্যার সুযোগ থাকা (জরুরিয়াতে দ্বীন ব্যতীত হলে), ভুলক্রমে অনিচ্ছায় কুফরে জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি। তবে এগুলোও নিঃশর্তভাবে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না; বরং প্রতিটির নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। তো বাধাগুলো দূর হলেই কেবল তাকফীর করা যায়। আর সেই বাধাগুলো আছে কি নেই, তা নির্ণয় করবেন বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম। যাঁরা কারও কথা বা কাজকে শরীয়তের মানদণ্ডে মেপে এই ফয়সালা দেন যে, অমুক মুসলিম অথবা কাফের।

তাই বলি, **কুফর ও তাকফীরের মাঝে রয়েছে পার্থক্য, তাকফীরের জন্য রয়েছে কিছু প্রতিবন্ধকতা ও শর্ত, যা বুঝতে অনেকেই ব্যর্থ। তাকফীর জনসাধারণ তো দূরের কথা, সাধারণ আলেমও এর জন্য অনুপযুক্ত।**

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) লেখেন,

قَدْ يُنْقَلُ عَنْ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ كَفَرَ مَنْ قَالَ بَعْضَ الأَقْوَالِ، وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كُفْرٌ لِيُحَذَرَ، وَلَا يَلْزَمُ إِذَا كَانَ الْقَوْلُ كُفْرًا أَنْ يَكْفُرَ كُلُّ مَنْ قَالَهُ مَعَ الْجَهْلِ وَالتَّأْوِيلِ، فَإِنَّ ثُبُوتَ الْكُفْرِ فِي حَقِّ الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ، كَثُبُوتِ الْوَعِيدِ فِي الْآخِرَةِ فِي حَقِّهِ، وَذَلِكَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ، كَمَا بَسَطْنَاهُ.

'কখনো কারও (ফকীহ) থেকে বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি কিছু কথাকে কুফরী উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেই কথাকে কুফর বলে চিহ্নিত করা, যাতে এর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। **কোনো কথা কুফর হলে**

এটা অপরিহার্য হয় না যে, কেউ তা অজ্ঞতা বা তাবীলের (ব্যাখ্যার) সঙ্গে বললেও **তাকে তাকফীর করা হবে।** কারণ, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে কুফর সাব্যস্ত করা আখিরাতে তার ব্যাপারে শাস্তির ধমকি সাব্যস্ত করার মতো। আর এর জন্য কিছু শর্ত ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যেমনটা আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।'[২১০]

সুতরাং কোনো কথা বা কাজ কুফর হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, সর্বাবস্থায় যে তা বলবে বা করবে তাকে তাকফীর করা হবে; বরং কুফর ও তাকফীরের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সহজে বোঝার জন্য এর সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত আমরা হাদীসের মধ্যে দেখতে পাই। হযরত উমর রাযি. বলেন, 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবদুল্লাহ নামের এক ব্যক্তিকে মদপানের কারণে (বেশ কয়েকবার) শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। একবার শাস্তি দেওয়া শেষে একজন তাকে বলল,

اللهُمَّ العَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ.

"হে আল্লাহ! তার ওপর লানত করুন। আর কতবার তাকে আনা হবে?"

লানতের কথা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানতকারীকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "তাকে লানত দিয়ো না। আল্লাহর কসম! আমি জানি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।"'[২১১]

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে, আবদুল্লাহকে মদপান করার অপরাধে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এরপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদপানকারী আবদুল্লাহকে লানত বা অভিশাপ দিতে বারণ করেছেন।

অথচ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল নিজে মদপানকারীসহ মদ-সংশ্লিষ্ট ১০ শ্রেণির ওপর লানত করেছেন। আনাস রাযি. বর্ণনা করেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ-সংশ্লিষ্ট দশ শ্রেণির ওপর লানত করেছেন। তারা হলো : ১. মদ প্রস্তুতকারীর ওপর, ২. মদ তৈরির পরামর্শদাতা বা তলবকারীর ওপর, ৩. মদপানকারীর ওপর, ৪. মদ বহনকারীর ওপর, ৫. যার কাছে মদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার ওপর, ৬. (পানশালায়) যে মদপান করায় তার ওপর, ৭. মদ বিক্রেতা বা মধ্যস্থতাকারীর ওপর, ৮. মদ দ্বারা উপার্জিত কোনো কিছু ভক্ষণকারীর ওপর, ৯. (নিজে পান বা ব্যবসা করার জন্য) মদ

---

২১০. মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়া, ৫/২৪০

২১১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৮০

ক্রয়কারীর ওপর, ১০. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয় তার ওপর।'[২১২]

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মদপানকারী অভিশপ্ত। সুতরাং তাকে অভিশাপ দেওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই। তাহলে আল্লাহর রাসূল আবদুল্লাহকে অভিশাপ দিতে বারণ করলেন কেন?

এর জবাব হলো, একটা হচ্ছে মদ্যপদের ওপর অনির্দিষ্টভাবে অভিশাপ দেওয়া, আরেকটা হলো সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্তিবিশেষকে অভিশাপ দেওয়া—দুইটা এক নয়। এর আলোকে বিবেচনা করলে অনির্দিষ্টভাবে কুফরী কাজের কারণে কেউ কাফের হওয়ার কথা বলা, আর সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে তাকফীরের মাঝে পার্থক্য বোঝা সহজ হয়ে যাবে।

আহলে কিবলা কি কাফের হয় না?

এ কথা প্রসিদ্ধ যে, আহলে কিবলা গুনাহের কারণে কাফের হয় না বা তাকফীর করা যাবে না। যেমন : ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও ইমাম তাহাবী রাহ. বলেন,

وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ.

'আমরা গুনাহের কারণে কোনো আহলে কিবলাকে তাকফীর করি না।'

অনেকেই এ-জাতীয় কথা দেখে বা শুনে বিভ্রান্ত হয় ও বিভ্রমে পড়ে যায়। তারা ধারণা করে বসে, যে ব্যক্তি কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করে বা কাবাকে কিবলা মনে করে, সে কখনো কাফের হবে না।

চাই সে যত বড় কুফরেই লিপ্ত হোক না কেন, ঈমান ভঙ্গের যতগুলো কারণই তার মাঝে পাওয়া যাক না কেন, ইসলামের যেমন বিধানই সে অস্বীকার করুক না কেন, অস্বীকারের যত আলামতই তার থেকে প্রকাশ পাক না কেন, শরীয়তের যেকোনো বিষয় নিয়ে সে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুক না কেন, এরপরও সে কোনোভাবেই কাফের হবে না। কারণ, ঈমান এত শক্ত ও শক্তিশালী যে, যতকিছুই করা হোক না কেন, ঈমান কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং ধর্ম দুর্বল হয় না।

এগুলো হচ্ছে, ঈমান-ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতার ফল।

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) যেই কিতাবে 'গুনাহের কারণে কোনো আহলে কিবলাকে তাকফীর করি না' বলেছেন, সেই একই কিতাবে তিনি আহলে কিবলাকে মুসলিম-মুমিন বলার জন্য শর্তারোপ করে বলেন,

وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ

২১২. তিরমিযী, হাদীস নং ১২৯৫; ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৩৮০, হাদীস সহীহ

مُصَدِّقِينَ.

'আহলে কিবলাকে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন-মুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত করব, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত সকল বিধি-বিধান স্বীকার করবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন ও সংবাদ দিয়েছেন, তার সবই বিশ্বাস করবে।'

এর অর্থ হচ্ছে, কেউ মুমিন-মুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ ইসলামের সকল বিধি-বিধান বিশ্বাস ও স্বীকার করবে। কাজেই একটাও অবিশ্বাস ও অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

আল্লামা আকমালুদ্দীন বাবিরতী রাহ. (মৃ. ৭৮৬ হি.) ও আবু হাফস গাযনাবী রাহ. (মৃ. ৭৭৩ হি.) এর ব্যাখ্যায় লেখেন,

إن مجرَّدَ التوجُّه إلى قبلتنا لا يدُل على الإيمان ما لم يصَدِّق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من الشريعة، فإن الغلاة من الرافضة – الذين يدعون أن جبريل غلط في الوحي لمحمد وأن الله أرسله إلى علي، وبعضهم قالوا بأنه إله – فهؤلاء وإن صلُّوا إلى القبلة ليسوا بمؤمنين.

'শুধু কিবলামুখী হওয়া মুমিন হওয়ার প্রমাণ বহন করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নবীর আনীত শরীয়তের সকল বিধান সত্যায়ন করবে না।

কাজেই যে সকল কট্টর শিয়া এ দাবি করে যে, হযরত আলী রাযি.-এর কাছে পাঠানো ওহী জিবরীল আ. ভুলবশত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এসেছেন বা তিনি ইলাহ ছিলেন, তারা কিবলামুখী হয়ে নামাজ পড়লেও মুমিন নয়।'[২১৩]

আল্লামা তাফতাযানী রাহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেন,

فلا نزاع في كفر أهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم، ونفي الحشر، ونفي العلم بالجزئيات، ونحو ذلك. وكذا بصدور شيء من موجبات الكفر عنه.

'আহলে কিবলা জীবনভর ইবাদত করলেও যদি পৃথিবীর অবিনশ্বরতার (কাদীম) আকীদা রাখে এবং হাশরের মাঠে সমবেত হওয়াকে অস্বীকার করে অথবা অন্য কোনো কুফরী বিষয় তার থেকে প্রকাশ পায়, তাহলে সে কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।'[২১৪]

ইবনে আমীর হাজ রাহ.-ও (মৃ. ৮৭৯ হি.) একই কথা বলেছেন।[২১৫]

---

২১৩. শারহুল আকীদাতুত তাহাবীয়া, ৯৬ ও ১১০
২১৪. শারহুল মাকাসিদ, তাফতাযানী, ৫/২২৮
২১৫. দ্র. আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, ৩/৩১৮

CamScanner

ইমাম ইবনে দাকীক আল-ঈদ রাহ. (মৃ. ৭০২ হি.) লেখেন,

والحق انه لا يَكْفُرُ أحدٌ مِنْ أهْلِ القِبلة، إلا بإنكار مُتَوَاتِرٍ من الشريعة عن صاحبها، فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع.

'হক কথা হলো, কোনো আহলে কিবলা কাফের হবে না। তবে সে যদি শরীয়তের এমন কোনো বিধান অস্বীকার করে, যা শরীয়ত-প্রণেতা থেকে মুতাওয়াতিরভাবে (অকাট্য) প্রমাণিত (তাহলে কাফের হবে)। কারণ, তখন সে শরীয়ত অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হবে।'[২১৬]

ইমাম সাখাবী রাহ.-ও (মৃ. ৯০২ হি.) 'ফাতহুল মুগীস' গ্রন্থে একই কথা বলেছেন।

আকায়েদ-শাস্ত্রের ইমাম আযুদুদ্দীন ইজী রাহ. (মৃ. ৭৫৬ হি.) বলেন,

وَلا نُكَفِّرُ أحدًا مِن أهْلِ القِبلَة، إلَّا بِمَا فِيْه نَفْيُ الصَّانِعِ المُخْتار، أوْ بِمَا فِيْه شِرْكٌ، أو إنكارُ النُّبُوَّة، أوْ إنْكارُ مَا عُلِمَ مَجِيْئُ مُحَمَّدٍ ﷺ به ضَرُورةً، أوْ إنكارُ مُجْمَعٍ عَلَيْه قَطعًا، وَأمَّا غَيْرُ ذلكَ فَالْقَائِلُ بِه مُبْتَدِعٌ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ.

'আমরা কোনো "আহলে কিবলা"-কে কাফের আখ্যা দিই না, তবে এমন কিছু করলে—যাতে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের অস্বীকৃতি থাকে, অথবা শিরক থাকে, অথবা নবুওয়াতের অস্বীকৃতি থাকে, অথবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত সর্বজনজ্ঞাত কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান করলে, অথবা উম্মাহর অকাট্যভাবে সর্বসম্মত কোনো জিনিস অস্বীকার করলে। আর কেউ এগুলোর বাইরের কোনো কিছুর প্রবক্তা হলে সে বিদআতপন্থী, কাফের নয়।'[২১৭]

শাহ আবদুল আযীয দেহলবী রাহ. (মৃ. ১২৩৯ হি.) লেখেন,

التحقيق أن المراد بأهل القبلة في هذه القاعدة: هم الذين لا ينكرون ضروريات الدين، لا من يوجه وجهه إلى القبلة في الصلاة، قال الله تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ إلخ

فمن أنكر ضروريات الدين لم يبق من أهل القبلة، لأن ضروريات الدين عندهم منحصرة في ثلاثة:

١. مدلول الكتاب بشرط أن يكون نصا صريحا لا يمكن تأويله، كتحريم الخمر والميسر واثبات العلم والقدرة والإرادة والكلام له تعالى وكون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مرضيين عند الله تعالى وأنه لا يجوز إهانتهم والاستخفاف بهم.

٢. مدلول السنة المتواترة لفظا أو معنى، سواء كان من الاعتقاديات أو من العمليات، وسواء كان فرضا أو نفلا، كوجوب محبة أهل البيت من الأزواج والبنات والجمعة والعيدين.

২১৬. ইহকামুল আহকাম শারহু উমদাতিল আহকাম, ২/২১০

২১৭. দ্র. শারহুল আকায়িদিল আযদিয়্যা, ইবনে কাওয়ান, পৃষ্ঠা ১১৩-১১৪; শারহুল মাওয়াকিফ, ৮/৪০০

٣. والمجمع عليه إجماعا قطعيا كخلافة الصديق والفاروق ونحو ذلك، ولا شبهة أن أنكر امثال هذه الأمور لم يصح إيمانه بالكتاب والنبيين، إذ في تخطئة الإجماع تضليل لجميع الأمة... فلا يكون منكر هذه الأمور من أهل القبلة.

'বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, "আহলে কিবলা" দ্বারা উদ্দেশ্য এমন সব ব্যক্তি, যারা জরুরিয়াতে দ্বীন অস্বীকার করে না; নামাজে কিবলার অভিমুখী হওয়াটা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ বলেন, "পুণ্য তো কেবল তা নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে; বরং গুণ হচ্ছে, মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি এবং...।"[২১৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি জরুরিয়াতে দ্বীন অস্বীকার করবে, সে আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, আলেমদের কাছে জরুরিয়াতে দ্বীন তিন বিষয়ের কোনো একটি হবে :

১. কুরআন দ্বারা প্রমাণিত বিধান। তবে শর্ত হলো, তা সুস্পষ্ট নস হতে হবে, যাতে তাবীলের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। যেমন : মদ ও জুয়া হারাম হওয়া, আল্লাহর জন্য ইলম, কুদরত ও কালামের গুণ সাব্যস্ত হওয়া, মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে প্রথম সারির মুমিনরা আল্লাহর কাছে সন্তোষভাজন হওয়া এবং তাঁদের অবমাননা বা অবজ্ঞা অবৈধ হওয়া।

২. মুতাওয়াতির সুন্নাহ দ্বারা শব্দগত বা অর্থগতভাবে প্রমাণিত বিধান হওয়া। চাই তা আকীদা-বিষয়ক হোক কিংবা আমল-বিষয়ক, ফরজ হোক কিংবা নফল। যেমন : আহলে বাইত তথা রাসূলের স্ত্রী ও কন্যাদের ভালোবাসা এবং জুমআ ও দুই ঈদের আবশ্যক হওয়া।

৩. অকাট্য ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত বিধান। যেমন : আবু বকর ও উমর রাযি.-এর খেলাফত প্রভৃতি।

যারা এ-জাতীয় বিষয় অস্বীকার করবে, আসমানী কিতাব ও নবীগণের ওপর তার ঈমান বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে না। কারণ, ইজমাকে ভুল আখ্যায়িত করার অর্থ হচ্ছে গোটা উম্মাহকে বিভ্রান্ত বলা।...

সুতরাং জরুরিয়াতে দ্বীন অস্বীকারকারী আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত নয়।'[২১৯]

আল্লামা আবদুল আযীয ফারহাবী রাহ. (মৃ. ১২৩৯ হি.) বলেন,

معناه اللغوي: من يصلي إلى الكعبة أو يعتقدها قبلة، وفي اصطلاح المتكلمين: من يصدق بضروريات الدين؛ أي: الأمور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر؛ فمن أنكر شيئا من الضروريات

২১৮. সূরা বাকারা, (২) : ১৭৭

২১৯. ফাতাওয়া আযীযিয়া, পৃষ্ঠা ৩৯৭; ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা ১২২

كحدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الله سبحانه بالجزئيات وفرضية الصلاة والصوم، لم يكن من أهل القبلة، ولو كان مجاهدا في الطاعات.

وكذلك من باشر شيئا من أمارات التكذيب كسجود الصنم والإهانة بأمر شرعي والاستهزاء عليه فليس من أهل القبلة، ومعنى عدم تكفير أهل القبلة: أن لا يكفر بارتكاب المعاصي، ولا بإنكار الأمور الخفية غير المشهورة. هذا ما حققه المحققون فاحفظه.

'আহলে কিবলা শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, যারা কাবার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করে অথবা কাবাকে নিজের কিবলা মনে করে। মুতাকাল্লিমীন বা আকীদা-বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায় আহলে কিবলা বলা হয়, জরুরিয়াতে দ্বীন তথা শরীয়তে যে সকল বিষয় মজবুতভাবে প্রমাণিত ও প্রসিদ্ধ, এমন সকল বিষয়কে সত্যায়ন করা।

কাজেই পৃথিবীর নশ্বরতা এবং হাশরের মাঠে সমবেত হওয়া, আল্লাহ তাআলা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন ও নামাজ-রোযা ফরজ প্রভৃতি জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো একটি বিষয়কে অস্বীকার করলে আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, যদিও সে নেক আমল সম্পাদনে সচেষ্ট থাকে।

তদ্রূপ কারও মাঝে মিথ্যা বা অস্বীকারের আলামত পাওয়া গেলে (সেও আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত নয়)। যেমন : মূর্তিকে সিজদা করা, শরীয়তের কোনো বিষয় নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, হাসি-ঠাট্টা করা এমন ব্যক্তি আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত নয়।

আহলে কিবলাকে কাফের না বলার অর্থ হচ্ছে, গুনাহে লিপ্ত হলে বা জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিষয়কে অস্বীকার করলে কাফের না বলা। এটাই মুহাক্কিকদের কথা।'[২২০]

আল্লামা কাশ্মীরী রাহ. (মৃ. ১৩৫২ হি.) বলেন,

إن إنكار القطعي كفر، ولا يشترط أن يعلم ذلك المنكر قطعيته ثم ينكر فيكون بذلك كافراً على ما يتوهمه الخائلون، بل يشترط قطعيته في الواقع، فإذا جحد شخص ذلك القطعي استتيب، فإن تاب وإلا قتل على الكفر، وليس وراء الاستتابة مذهب.

'নিশ্চয় অকাট্য বিধান অস্বীকার করা কুফর। আর এটা শর্ত নয় যে, অস্বীকারকারী পূর্ব থেকেই তা অকাট্য হওয়ার ব্যাপারে জানবে এবং সে জেনে-বুঝে তা অস্বীকার করবে। ফলে এর দ্বারা সে কাফের হবে, যা কল্পনাকারীরা মনে করে থাকে; বরং শর্ত হলো, বিষয়টি বাস্তবে অকাট্য হতে হবে। যখন কেউ এমন অকাট্য বিধান অস্বীকার করবে, তখন তাকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা করে, তাহলে তা গৃহীত হবে। অন্যথায় তাকে কুফরের অপরাধে হত্যা করা হবে। এ ক্ষেত্রে তাওবা

---

২২০. আন-নিবরাস, পৃষ্ঠা ৭২২

করতে বলা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।'[২২১]

উল্লেখ্য, হানাফী মুহাক্কিক আলেমগণের মতে ইসলামের যেকোনো অকাট্য বিষয় অস্বীকার করাও কুফর, যদিও তা জরুরিয়াতে দ্বীনের পর্যায়ে না পৌঁছায়। ইবনুল হুমাম রাহ. 'আল-মুসায়ারা' গ্রন্থে, তাফতাযানী রাহ. 'আত-তালবীহ'তে ও ইবনে আবেদীন শামী রাহ. 'ফাতাওয়া শামী'তে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

এ ছাড়া অনেক ফকীহ ও আকীদা-বিশেষজ্ঞ আলেমের কাছে অকাট্য ও জরুরিয়াতে দ্বীন শব্দ দুটি সমার্থক। সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে অকাট্য বিষয় অস্বীকার করা জরুরিয়াতে দ্বীন অস্বীকার করার হুকুম হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

গুনাহের কারণে আহলে কিবলাকে কাফের না বলার ব্যাখ্যা

গুনাহের কারণে আহলে কিবলাকে কাফের না বলার ব্যাখ্যা হচ্ছে, কুফর-শিরক তথা ঈমান ভঙ্গের কারণ নয় এমন কোনো গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের না বলা। কারণ, গুনাহের কারণে কাফের বলে খারেজীরা।

ইমাম ইবনে ফূরাক রাহ. (মৃ. ৪০৬ হি.) বলেন,

فأما أهل السنة والجماعة فهم على ما أشار إليه صاحب الكتاب رحمه الله: أن صاحب الذنب من المؤمنين ما لم يكن ذنبه شركا وكفرا فإنه محسن بإيمانه، مسيئ بذنبه.

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মাসলাক, যা ইমাম আবু হানীফা রাহ. ইশারা করেছেন তা হলো, গুনাহগার মুমিন গুনাহের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার ঈমান থাকবে, যতক্ষণ তার গুনাহটা শিরক-কুফর না হবে।'[২২২]

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন,

إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب: فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب.

'আহলুস সুন্নাহ যে সর্বসম্মতভাবে গুনাহের কারণে কাফের না বলার কথা বলেছেন, তা থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে যিনা ও মদজাতীয় গুনাহ।'[২২৩]

ইবনে আমীর হাজ রাহ. (মৃ. ৮৭৯ হি.) লেখেন,

إن عدم تكفير أهل القبلة بذنب: ليس على عمومه، إلا أن يُحمَل الذنب على ما ليس بكفر.

'গুনাহের কারণে আহলে কিবলাকে কাফের না বলাটা ব্যাপক অর্থে নয়; বরং গুনাহ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন গুনাহের কারণে কাফের না বলা, যা কুফর (তথা ঈমান

২২১. দ্র. ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা ৩৩
২২২. শারহুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, পৃষ্ঠা ২৫২
২২৩. মাজমুউল ফাতাওয়া, ৭/৩০২

ভঙ্গের কারণ) নয়।'[২২৪]

এ বিষয়ে ইমামুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. তাঁর অসাধারণ উপকারী কিতাব 'ইকফারুল মুলহিদীন'-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ আলোচনার উদ্দেশ্য

কেউ কেউ কুফর নিয়ে আলোচনা করাকেও ভয় করেন। অথচ কুফর নিয়ে আলোচনা করা মানেই কাউকে তাকফীর করা নয়। তাই ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ ও বিভিন্ন রূপ নিয়ে সামনের আলোচনা কাউকে তাকফীর বা কাফের বলার জন্য নয়; বরং নিজেকে ও অন্যকে কুফর থেকে বাঁচানোর জন্য।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্যকরণীয় হলো, কুফর ও ঈমান ভঙ্গের কারণ ও রূপসমূহের ব্যাপারে ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করা ও সতর্ক থাকা এবং কুফরের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ও কুফরের ভয়াবহতা তুলে ধরা।

ঈমান ভঙ্গ হয় বা কুফর প্রকাশ পায় তিন মাধ্যমে

১. আকীদা-বিশ্বাস, ২. কথা-উক্তি, ৩. কাজ-কর্ম।

কোনো মুসলিম এই তিনটি বিষয়ের যেকোনো একটির মাধ্যমে ঈমান হারিয়ে কাফের হয়ে যায়। মানুষ কখনো এমন বিশ্বাস লালন করে বা এমন কথা মুখ দিয়ে প্রকাশ করে অথবা এমন কাজ করে বসে, যা ইসলামের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক, তখন সে মুমিন-মুসলিম থাকতে পারে না।

ঈমান ভঙ্গ হওয়ার মৌলিক কারণ

অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইসলামের যে সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনার মাধ্যমে ঈমানের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে হয়েছে, এমন কোনো বিষয়ে কুফর করা।

কুফর করার মানে হচ্ছে, অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয়ে সন্দেহ করা, সংশয় করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, আপত্তি করা, অবজ্ঞা করা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, অপব্যাখ্যা করা, শিরক করা, শরীয়তের বিধান হিসেবে অপছন্দ করা এবং অকাট্য হারামকে হালাল মনে করা কিংবা এ-জাতীয় বিধানকে মেনে না নেওয়া প্রভৃতি। এগুলো সবই কুফর শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

বলাবাহুল্য, যে সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনার মাধ্যমে ঈমানে প্রবেশ করতে হয়, এগুলোর বড় একটা তালিকা ওপরে ঈমানের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

২২৪. আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, ৩/৩১৮

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'যে কেউ ঈমান-বিশ্বাসের বিষয়ে কুফর করবে, তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে (কাফের হওয়ার কারণে) এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে।'[২২৫]

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর 'আকীদা' গ্রন্থে বলেন,

وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ.

'একজন বান্দা ঈমান থেকে বের হয় না, তবে যে সকল বিষয় (বিশ্বাসের দ্বারা) তাকে ঈমানে প্রবেশ করিয়েছে, তা কুফরের কারণে (ঈমান ভঙ্গ হয়)।'

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) বলেন,

إن بعض الأفعال تقوم مَقام الجحود، نحو العلائم المختصة بالكفر، وإنما يجب في الإيمان التبرؤ عن مثلها أيضًا، كما يجب التبرؤ عن نفس الكفر.

'কিছু কাজ এমন রয়েছে, যা কুফরের স্থলাভিষিক্ত। যেমন : কুফরের বিশেষ প্রতীক বা আলামতগুলো। কাজেই ঈমানের জন্য এগুলো থেকেও সম্পর্কহীন হওয়া আবশ্যক, যেভাবে কুফর থেকে সম্পর্কহীন হওয়া অপরিহার্য।'[২২৬]

সুতরাং কারও ঈমান ভঙ্গ ও নষ্ট হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, যে সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনার মাধ্যমে সে ঈমানে প্রবেশ করেছে, এগুলোর কোনো একটা বিষয়ে কুফর করা অথবা কুফরের বিশেষ কোনো প্রতীক স্বেচ্ছায় ধারণ করা বা কুফর-সংশ্লিষ্ট কোনো কাজে স্বেচ্ছায় লিপ্ত হওয়া।

মানুষ দুই ধরনের এবং কাফেরদের প্রকার

পৃথিবীর সকল মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত : হয়তো মুমিন, নয়তো কাফের।

ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।'[২২৭]

মানুষ যেহেতু দু-ধরনের : মুমিন-মুসলিম ও কাফের-বেঈমান—এর বাহিরে আর কোনো প্রকার নেই—কাজেই মুমিন-মুসলিম ছাড়া সবাই কাফেরদের মধ্যে গণ্য হবে। কাফের হওয়ার পর তার নাম মুশরিক, মুরতাদ, মুনাফিক, যিন্দীক, মুলহিদ,

---

২২৫. সূরা মায়েদা, (৫) : ৫

২২৬. ফয়যুল বারী, ১/৬৫

২২৭. আত-তাগাবুন, ২; ইউনুস ৪০

নাস্তিক বা ধর্মহীন, হিন্দু, বৌদ্ধ, আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিষ্টান হতে পারে। অথবা মুসলিম নামধারীও হতে পারে, যেমন : কাদিয়ানী সম্প্রদায়।

কাফেরদের বিভিন্ন প্রকারের নাম পরিচিতি

আল্লামা তাফতাযানী রাহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেন,

إن «الكافر» اسم لمن لا إيمان له. فإن أظهر الإيمان: فهو «المنافق»، وإن كفر بعد الإسلام: فهو «المرتد» لرجوعه عن الإسلام، وإن قال بإلهين أو أكثر: فهو «المشرك»، وإن كان متدينًا بالكتب المنسوخة: فهو «الكتابي» كاليهودي والنصراني، وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه: فهو «الدهري»، وإن كان لا يثبت الباري: فهو «المعطل»، وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهاره شعائرَ الإسلام يُبْطِن عقائدَ هي كفرٌ بالاتفاق: فهو «الزنديق».

'যার ঈমান নেই তাকে "কাফের" বলে। এখন

- কোনো কাফের যদি মুখে ইসলাম প্রকাশ করে তাকে "মুনাফিক" বলা হবে।

- মুসলমান হওয়ার পর কাফের হয়ে গেলে তাকে "মুরতাদ" বলা হবে।

- একাধিক উপাস্যে বিশ্বাসী হলে তাকে "মুশরিক" বলা হবে।

- রহিত আসমানী ধর্মের অনুসারী দাবি করলে তাকে "আহলে কিতাব" বলা হবে। যেমন : ইহুদী-খ্রিষ্টান।

- কালকে অনাদি মনে করে যদি (পৃথিবীর) ঘটনাবলিকে কালের আবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত করে, তাহলে "দাহরী" বলা হবে।

- স্রষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারকারীকে "নাস্তিক" বলা হবে।

- নবীর নবুওয়াত স্বীকার এবং ইসলাম প্রকাশ করা সত্ত্বেও যদি এমন আকীদা পোষণ করে যা সর্বসম্মত কুফর, তখন তাকে "যিন্দীক" বলা হবে।'[২২৮]

---

২২৮. শারহুল মাকাসিদ, ৫/২২৭; উল্লেখ্য, মুনাফিক ও যিন্দীক সম্পর্কে আরও আলোচনা সামনে আসবে।

نقل ابن عابدين في «رد المحتار» عن ابن كمال باشا قوله: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الزِّنْدِيقِ وَالْمُنَافِقِ وَالدَّهْرِيِّ وَالْمُلْحِدِ مَعَ الِاشْتِرَاكِ فِي إبْطَانِ الْكُفْرِ: أَنَّ الْمُنَافِقَ غَيْرُ مُعْتَرِفٍ بِنُبُوَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالدَّهْرِيَّ كَذَلِكَ مَعَ إنْكَارِ إسْنَادِ الْحَوَادِثِ إلَى الصَّانِعِ الْمُخْتَارِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَالْمُلْحِدُ: وَهُوَ مَنْ مَالَ عَنْ الشَّرْعِ الْقَوِيمِ إلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْكُفْرِ، لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاعْتِرَافُ بِنُبُوَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِوُجُودِ الصَّانِعِ تَعَالَى. وَبِهَذَا فَارَقَ الدَّهْرِيَّ أَيْضًا. وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ إضْمَارُ الْكُفْرِ، وَبِهِ فَارَقَ الْمُنَافِقَ. كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ سَبْقُ الْإِسْلَامِ وَبِهِ فَارَقَ الْمُرْتَدَّ. فَالْمُلْحِدُ أَوْسَعُ فِرَقِ الْكُفْرِ حَدًّا: أَيْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْكُلِّ.

ঈমান ভঙ্গ হওয়ার প্রথম কারণ

ইসলাম ত্যাগ করা বা মুরতাদ হওয়া

ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করা কিংবা কোনো ধর্মই না মানা। যেমন : খ্রিষ্টান বা 'ঈসায়ী মুসলিম' হওয়া, অদৃশ্য বস্তুকে না মানার কথা বলে আল্লাহকে বিশ্বাস না করা এবং প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিক হওয়া ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা

পরিভাষায় এটাকে 'ইরতিদাদ' বা 'মুরতাদ' হওয়া বলে। আর মুরতাদ দুই প্রকারের হয়ে থাকে :

১. যে নিজের ইরতিদাদ বা ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে।

২. যে ইরতিদাদমূলক (তথা নিশ্চিত ঈমান নষ্ট ও ভঙ্গ হয় এমন) কোনো কুফর করার পরেও নিজেকে মুসলমান দাবি করে অথবা মুসলমানের বেশভূষা ধারণ করে। দ্বিতীয় প্রকারের মুরতাদকে মুনাফিক ও যিন্দীকও বলা হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাপারে মুফতী শফী রাহ. (মৃ. ১৩৯৬ হি.) বলেন,

یہ صورت بھی باجماع امت ارتداد میں داخل ہے، اگرچہ اس ایک حکم کے سوا تمام احکام اسلامیہ پر شدت کے ساتھ پابند ہو۔ ارتداد کی اس دوسری صورت میں اکثر مسلمان غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

'এ প্রকারেও সর্বসম্মতভাবে মুরতাদ হয়ে যাবে, যদিও সে এই একটি বিধান ছাড়া ইসলামের অন্য সমস্ত বিধান দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে।

ইরতিদাদের এ দ্বিতীয় প্রকারে অধিকাংশ মুসলমান ভুল বুঝে থাকে।'[২২৯]

মুরতাদের বিধান

'মুরতাদ' হওয়া সকল প্রকার কুফরের চেয়েও ভয়াবহ। সাধারণ কুফর হলো, সত্য দ্বীন গ্রহণ না করা বা বিমুখ থাকা। কিন্তু ইরতিদাদ শুধু বিমুখতা নয়; বরং তা বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধতা! কেননা, সত্য দ্বীন গ্রহণ করার পর তা বর্জনের অর্থ ওই দ্বীনকে অভিযুক্ত করা, যা নির্জলা অপবাদ। যে কারণে এটাকে কুরআনে কারীমে 'ইফসাদ ফিল আরদ' তথা পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি করা বলা হয়েছে।

মুরতাদের আসল শাস্তি তো হবে পরকালে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে কারও অন্তরের একান্ত গোপন কথাও অজানা নয়। তাই দুনিয়াতে কেউ নিজের ইরতিদাদ

২২৯. জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/১৩০

ও কুফর লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও পরকালে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না!

স্বঘোষিত মুরতাদ হোক কিংবা মুনাফিক-জাতীয় মুরতাদ হোক, উভয় প্রকার মুরতাদই জঘন্য কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'তোমাদের মধ্যে যারা মুরতাদ হয়ে কাফের অবস্থায় মারা যাবে, তাদের দুনিয়া-আখিরাতে সকল কাজ বরবাদ হয়ে যাবে এবং তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।'[২৩০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছেড়ে দেবে, তাকে তোমরা হত্যা করো।'[২৩১]

কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, তার ব্যাপারে বিধান হলো, তাকে তিন দিনের সুযোগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে তাকে বোঝানো হবে এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তার যাবতীয় প্রশ্ন ও সন্দেহ দূরীভূত করার চেষ্টা করা হবে। যদি তিন দিনের মধ্যে তার বুঝে এসে যায় এবং পুনরায় সে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে, তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। অন্যথায় সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব হলো, এসব লোকের অস্তিত্ব থেকে এ পৃথিবীর মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া। এটাই মুরতাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

তবে মুরতাদ যদি মহিলা হয়, তাহলে হানাফী মাযহাবমতে কতল করবে না; বরং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত জেলে ভরে রাখবে।[২৩২]

আমাদের দেশসহ অনেক দেশের সংবিধানে যুদ্ধাপরাধী ও রাষ্ট্রদ্রোহীর চূড়ান্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করা আছে। আর মুরতাদ হচ্ছে ইসলামদ্রোহী। তাই ইসলাম ধর্মে তার চূড়ান্ত শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড রাখা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম এ বিধানের ক্ষেত্রেও তার

---

২৩০. সূরা বাকারা, (২) : ২১৭

২৩১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯২২

২৩২. হানাফী ফিকহের প্রখ্যাত কিতাব 'আল-হিদায়াহ'তে (২/৪৩৪-৩৫, মাকতাবাতুল আমজাদ) রয়েছে,

باب احكام المرتدين قال: (وَإذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنِ الإِسْلَامِ –وَالْعِيَاذُ بِاللهِ– عُرِضَ عَلَيْهِ الإِسْلَامُ، فَإنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كُشِفَتْ عَنْهُ) لِأَنَّهُ عَسَاهُ اعْتَرَتْهُ شُبْهَةٌ فَتُزَاحُ، وَفِيهِ دَفْعُ شَرِّهِ بِأَحْسَنِ الأَمْرَيْنِ، إلَّا أَنَّ الْعَرْضَ عَلَى مَا قَالُوا غَيْرُ وَاجِبٍ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ بَلَغَتْهُ. قَالَ: (وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: الْمُرْتَدُّ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلَامُ، فَإنْ أَبَى قُتِلَ)... وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥] مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الإِمْهَالِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ لِإِطْلَاقِ الدَّلَائِلِ...

(وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَلَا تُقْتَلُ... وَلَكِنْ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ)؛ لِأَنَّهَا امْتَنَعَتْ عَنْ إيفَاءِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى بَعْدَ الإِقْرَارِ...

CamScanner

প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল আচরণ করে থাকে। কারণ, কোনো দেশই রাষ্ট্রদ্রোহীকে কখনো ছাড় দেয় না। সে যতই ক্ষমা চাক আর তাওবা করুক, কোনো কিছুই শোনা হয় না এবং কোনোভাবেই তাকে ক্ষমার উপযুক্ত মনে করা হয় না।

অথচ ইসলামদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলেও ইসলাম তার প্রতি এতটুকু সহানুভূতি পোষণ করেছে যে, তাকে তিন দিনের সময় দেওয়া হবে, তাওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে। শুধু তা-ই নয়, নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাকে তাওবা করার জন্য বলা হবে, তাওবা করে নাও, একটু ক্ষমা চেয়ে নাও, তাহলেই তুমি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

এত কিছুর পরও যদি কেউ ফিরে না আসে, এরূপ হতভাগার জন্য মৃত্যুদণ্ডই বাঞ্ছনীয়। কারণ, সে তো এ সমাজের জন্য বিষাক্ত ক্ষতের মতো। কোনো অঙ্গ যদি বিষাক্ত পচনশীল রোগে আক্রান্ত হয়, ডাক্তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গকে রক্ষা করার জন্য সে অঙ্গটিকে কেটে ফেলে। দুনিয়ার কোনো আদালত একে অত্যাচার মনে করে না। কারণ, না কাটলে এর বিষক্রিয়া সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে তার মৃত্যু ডেকে আনবে।

অতএব বিষাক্ত পচনশীল অঙ্গের পচন রোধ করার জন্য একটি অঙ্গ কেটে ফেলা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলে বিবেচিত হয়, মুরতাদ হওয়াটাও ইসলাম ধর্মের একটি বিষাক্ত পচনশীল রোগের মতো। তাওবার সুযোগ দেওয়ার পরও যদি কোনো মুরতাদ ফিরে না আসে, তার মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত। কারণ, তাকে ছেড়ে দিলে সমাজের জন্য মৃত্যু ডেকে আনবে। তাই মৃত্যুদণ্ডই মুরতাদের চূড়ান্ত ফয়সালা। এটাই যুক্তিযুক্ত ও সুস্থ বিবেকের দাবি। গোটা উম্মতের শান্তি তাতেই নিহিত।

পরিতাপের বিষয় হলো, মুরতাদের প্রতি ইসলাম এমন সহানুভূতি দেখালেও ইসলাম ধর্মে মুরতাদের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান কেন রাখা হলো, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের রাজ সিংহাসন উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে কেউ ধরা পড়লে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, এতে কোনো প্রশ্ন উঠে না। বাংলাদেশের বিদ্রোহকারী পাকড়াও হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও কোনো সমস্যা হয় না। দুনিয়ার কোনো আদালত বা সংবিধান নাক গলায় না।

আশ্চর্য হলো, কেবল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর বিদ্রোহীদের ওপর যদি কোনো মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করা হয় তখন সকলেই বলে ওঠে, এ শাস্তি অমানবিক! এটা হওয়া উচিত নয়!

ঈমান ভঙ্গ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ

শিরক করা। আর শিরক সাধারণত দুই বিষয়ের মধ্যে হয়ে থাকে :

১. **শিরক ফিল ইবাদাহ বা উলূহিয়্যাহ :** তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের

উপযুক্ত মনে করে তার ইবাদত করা কিংবা আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদত করা। যেমন : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে (কোনো ওলী বা মাজারকে) ইবাদতের সিজদা করা বা কারও জন্য নামাজ পড়া, গায়রুল্লাহর নামে মান্নত করা, সাদকা দেওয়া, কুরবানী করা ইত্যাদি।

২. শিরক ফির রুবূবিয়্যাহ : তথা এমন কোনো বিশ্বাস পোষণ করা বা কাজ করা, যা তাওহীদ-পরিপন্থী। যেমন : আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরীক করা, আল্লাহ ছাড়া কাউকে রিযিকদাতা, সন্তানদাতা ইত্যাদি মনে করা।

আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রাহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) লেখেন,

الإشراك: هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس، أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام.

'শিরক হলো প্রভুত্বের মধ্যে কাউকে শরীক করা, অর্থাৎ অগ্নিপূজকদের মতো অন্য কিছুকে প্রভু মনে করা। অথবা মূর্তিপূজকদের মতো অন্য কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা।'[২৩৩]

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

'যারা বলে, মারয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ, নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়ে গেছে। অথচ মাসীহ বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক।

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে (কাউকে) শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[২৩৪]

শিরক বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণ

কোনো পীর-ওলী বা মাজারকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বা লাভ-ক্ষতির মালিক মনে করে সাহায্য চাওয়া, সন্তান চাওয়া, ধন-সম্পদ চাওয়া, সমস্যার সমাধান চাওয়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

২৩৩. শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৫২

২৩৪. সূরা মায়েদা, (৫) : ৭২

CamScanner

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ

'আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যা তোমার কোনো উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। তারপরও যদি তুমি এরূপ করো, তবে তুমি জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।'[২৩৫]

ইবাদত যেমন একমাত্র তাঁরই করা হবে, সাহায্যের জন্যও তাঁকেই ডাকতে হবে। কেননা, সর্বপ্রকার লাভ-ক্ষতি ও মঙ্গল-অমঙ্গল এককভাবে তাঁরই মুঠিতে রয়েছে।

মুশরিকদের ন্যায় এমন সব জিনিসকে সাহায্যের জন্য ডাকা—যারা কোনো লাভ-লোকসানের মালিক নয়—অত্যন্ত গর্হিত বিষয়, বরং চরম অন্যায় (অর্থাৎ শিরক)-এর একটি শাখা।[২৩৬]

ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ

'যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, যে সম্পর্কে তার কাছে কোনো রকম দলীল-প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হতে পারে না।'[২৩৭]

ইসলামের প্রকৃতি ও মেজায হচ্ছে আল্লাহর বান্দা আল্লাহমুখী হবে, আল্লাহর বান্দা হয়ে তাঁর আরেক বান্দামুখী হবে না। তাই আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়ে বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

'তোমরা আমার কাছে চাও, আমি তোমাদের চাওয়া পূরণ করব।'[২৩৮]

তিরমিযীর সহীহ হাদীসে এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

'একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে (আরোহী) ছিলাম।

২৩৫. সূরা ইউনুস, (১০) : ১০৬
২৩৬. দ্র. তাফসীরে উসমানী
২৩৭. সূরা মুমিনূন, (২৩) : ১১৭
২৩৮. সূরা গাফির, (৪০) : ৬০

CamScanner

তিনি বললেন, ওহে বালক, আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিচ্ছি। আল্লাহর (বিধানসমূহ) যথাযথভাবে পালন করবে, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখবে, তাঁকে তোমার সামনে পাবে। **যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছে চাইবে। আর যখন সাহায্যের দরকার পড়বে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।**

জেনে রাখো, সমস্ত উম্মতও যদি তোমার উপকার করতে একত্রিত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ যা তোমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন তা ছাড়া কোনো উপকার তারা তোমার করতে পারবে না। আর সব উম্মত যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে একত্রিত হয়ে যায়, তবে তোমার তাকদীরে আল্লাহ তাআলা যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া তোমার কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আর লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।'[২৩৯]

এ জন্যই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহায় আমাদের থেকে এই কথার স্বীকৃতি নেওয়া হয় এবং আমরাও স্বীকৃতি প্রদান করে বলি,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।'

কিন্তু সুন্নী নামের বেরেলভী ভাইয়েরা মানুষকে কবর ও মাজারমুখী করতে চায়। ওরশ-ফাতেহাসহ বিভিন্ন নামে মানুষকে মাজারমুখী করার আয়োজন করে। তারা আউলিয়া কেরামের বিভিন্ন কারামত ও অলৌকিক ঘটনা বলে তাদেরকে অনেক কিছুর ক্ষমতার মালিক বোঝাতে চায় এবং এর মাধ্যমে মানুষকে তাদের কাছে নিজেদের সমস্যা সমাধান চাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

যদিও কবর-মাজারকেন্দ্রিক সব কাজ শিরক ও হারাম নয়; বরং শর্তসাপেক্ষে কিছু বৈধ কাজও আছে। কিন্তু সব বৈধ কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার দরকার নেই। গাছের পাতা খাওয়া বৈধ হলেও কেউ তো তা খেতে উদ্বুদ্ধ করে না!

প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (মৃ. ১২৫২ হি.) লিখেছেন,

كُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّي إِلَى زَعْمِ الْجُهَّالِ سُنِّيَّةَ أَمْرٍ، أَوْ وُجُوبَهُ: فَهُوَ مَكْرُوهٌ.

'যে বৈধ কাজ সাধারণদের কাছে কোন বিষয় সুন্নাত বা ওয়াজিব মনে করার দিকে নিয়ে যাবে, তা করা মাকরূহ।'[২৪০] অর্থাৎ যে বৈধ কাজ সাধারণদের আকীদা নষ্ট হওয়ার কারণ হবে, তা থেকে বেঁচে থাকা চাই।

---

২৩৯. তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬, হাসান সহীহ

২৪০. আল-উকূদুদ দুরিয়্যাহ ফী তানকীহিল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ, ২/৩৩৩, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত

CamScanner

সহীহ বুখারী মুসলিমের প্রসিদ্ধ হাদীসেও সুস্পষ্ট হারাম ও হালাল বাদ দিয়ে অন্যগুলোতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে সীমা অতিক্রম করে হারামের মধ্যে লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

বেরেলভী ভাইয়েরা তো হানাফী মাযহাব মানার দাবি করে থাকেন। আশা করি তারা হানাফী ফকীহ ইবনে আবেদীন শামী রাহ.-এর ফতোয়াটা মেনে নেবেন!

আবার সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইয়েরা কবর-মাজারকেন্দ্রিক কিছু দেখলেই শিরক বলে থাকেন; বরং তারা শিরক-ফোবিয়ায় আক্রান্ত! তারা যদি কষ্ট করে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ.-এর কিতাব إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان থেকে

فصل في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين

অংশটুকু পড়ে নিতেন, তাহলে কিছুটা বুঝতে পারতেন।

এভাবে আমাদেরও কেউ কেউ তাদের বক্তব্য-বিবৃতি শুনে কিংবা তাদের কিতাবাদি পড়ে কোনো পার্থক্য করা ছাড়া সবকিছু শিরক বলে থাকেন, তারা যদি হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর

غاية الإدراك في أقسام الإشراك

ছোট রিসালাটি অধ্যয়ন করে নিতেন, তাহলে ভুল ভেঙে যেত। এই রিসালা তাঁর 'ইমদাদুল ফাতাওয়া'র ১২তম খণ্ডের মধ্যে আছে।

ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ

ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোর কোনো একটিতে সন্দেহ বা সংশয় পোষণ করা বা অজ্ঞেয়বাদী হওয়া। কেননা, সংশয়-সন্দেহ ও ঈমান একসাথে হতে পারে না; বরং এটা মুনাফিকের কাজ। এ সম্পর্কে ওপরে ঈমানের প্রথম শর্তের বিবরণে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী রাহ (মৃ. ৯৭৪ হি.) বলেন,

واعلم أن التردد في المعلوم من الدين بالضرورة كالإنكار.

'জেনে রাখো, জরুরিয়াতে দ্বীন তথা দ্বীনের সর্বজনবিদিত বিধানের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া তা অস্বীকারের মতো।'[২৪১]

ঈমান ভঙ্গের পঞ্চম কারণ

কুফর করা। যেমন :

১. অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইসলামের বিষয়গুলোর কোনো একটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন

---

২৪১. আল-ফাতাওয়াল হাদীসিয়া, পৃষ্ঠা ২০১

CamScanner

করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা।

২. অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয় ও বিধানাবলির কোনো একটিকে অবজ্ঞা করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা এবং ইসলামের শিআর তথা প্রতীকসমূহের অবমাননা করা।

ইসলামের মৌলিক শিআর হলো কুরআন মাজীদ, বিভিন্ন ইবাদত, যথা : আজান, নামাজ, রোযা, হজ-যাকাত, দুআ-দরূদ; বিভিন্ন ফযীলতপূর্ণ স্থান, যথা : কাবা শরীফ, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা ও পৃথিবীর সকল মসজিদ ইত্যাদি— এগুলোর অবমাননা, যেমন : কুরআন মাজীদকে আবর্জনায় ছুড়ে ফেলা, মসজিদকে গোয়ালঘর বলা।

এভাবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইসলামের কোনো বিধান, নবীজীর কোনো সুন্নাত, এমনকি অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো মুস্তাহাব আমল ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য ব্যবহার করা অথবা অবজ্ঞা-প্রকাশক কোনো আচরণ করা। যেমন : কুকুরের মাথায় টুপি পরানো, ধর্মপালনকারীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্য দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে দিয়ে নাটক-সিনেমা বা কৌতুক বানানো, হাতে তাসবীহওয়ালা ব্যক্তিকে ক্রিমিনাল সাজানো, আজানের ধ্বনিকে বেশ্যার আওয়াজ বলা, পর্দাকে হেয় করে বোরকাকে ট্যাবু ইত্যাদি বলা।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) বলেন,

مناط التكفير هو: التكذيب أو الاستخفاف بالدين.

'তাকফীরের মূল উপাদান হচ্ছে দ্বীনী কোনো বিষয় অস্বীকার করা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অথবা অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।'[২৪২]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

'যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল (এগুলোর কোনো একটা) বিষয়ে কুফর করে, নিশ্চিতভাবে সে মারাত্মক পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।'[২৪৩]

وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

'কেউ যদি ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।'[২৪৪]

---

২৪২. আল মুসায়ারাহ, পৃষ্ঠা ৩১৮

২৪৩. সূরা নিসা, (৪) : ১৩৬; তাফসীরে মাতুরীদী, ৩/৩৮৭; তাফসীরে বায়যাবী ও রুহুল মাআনী

২৪৪. সূরা বাকারা, (২) : ১০৮; তাফসীরে বাগাবী; ইবনে কাসীর ও তাফসীরে উসমানী

CamScanner

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

'যারা কুফর করেছে ও কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের কারও থেকে পৃথিবী-পরিমাণ স্বর্ণও গৃহীত হবে না, যদিও তারা নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে তা দিতে চায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব! এবং তাদের কোনো রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না।'[২৪৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

'আপনি যদি ওদের জিজ্ঞাসা করেন, তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক-ঠাট্টা করছিলাম। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর বিধানাবলি ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিলে? তোমাদের কোনো ওজর চলবে না, তোমরা ঈমান প্রকাশ করার পর কাফের হয়ে গেছ।'...[২৪৬]

এ আয়াত থেকে জানা যায়, ইসলামের ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক কৌতুক, ঠাট্টা, বিদ্রুপ ও উপহাস করা কুফরের মধ্যে গণ্য।

কাযী ইয়ায রাহ. (মৃ. ৫৪৪ হি.) লেখেন,

وَاعْلَمْ أَنَّ مَن اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ أَوِ الْمُصْحَفِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ، أَوْ سَبَّهُمَا، أَوْ جَحَدَهُ، أَوْ حَرْفًا مِنْهُ، أَوْ آيَةً، أَوْ كَذَّبَ بِه، أو بشيء منه.. أو بِشَيْءٍ مِمَّا صُرِّحَ بِهِ فِيهِ مِنْ حُكْمٍ، أَوْ خَبَرٍ، أَوْ أَثْبَتَ مَا نَفَاهُ، أَوْ نَفَى مَا أَثْبَتَهُ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِذَلِكَ، أَوْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِإِجْمَاعٍ.

'জেনে রেখো, যে ব্যক্তি পুরো কুরআন বা এর কোনো অংশের অবজ্ঞা করে, কিংবা কটূক্তি করে, অথবা পুরো কুরআন বা এর কোনো একটি অক্ষর কিংবা একটি আয়াত অস্বীকার করে, অথবা পুরো কুরআন বা এর কোনো একটি অংশ, অথবা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত কোনো বিধান বা সংবাদ অস্বীকার করে, অথবা জেনে-বুঝে কুরআন যা নাকচ করেছে, তা সাব্যস্ত করে, কিংবা কুরআন যা সাব্যস্ত করেছে, তা নাকচ করে, অথবা কুরআনের কোনো বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সে আলেমগণের নিকট সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে।'[২৪৭]

প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ইমাম ইবনু নুজাইম মিসরী রাহ. (মৃ. ৯৭০ হি.) বলেন,

---

২৪৫. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ৯১

২৪৬. সূরা তাওবা, (৯) : ৬৫-৬৬

২৪৭. আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, ২/৬৪৬

وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ هَازِلًا، أَوْ لَاعِبًا: كَفَرَ عِنْدَ الْكُلِّ، وَلَا اعْتِبَارَ بِاعْتِقَادِهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ. وَمَنْ تَكَلَّمَ بِهَا مُخْطِئًا، أَوْ مُكْرَهًا: لَا يَكْفُرُ عِنْدَ الْكُلِّ. وَمَنْ تَكَلَّمَ بِهَا عَالِمًا عَامِدًا: كَفَرَ عِنْدَ الْكُلِّ. وَمَنْ تَكَلَّمَ بِهَا اخْتِيَارًا جَاهِلًا بِأَنَّهَا كُفْرٌ: فَفِيهِ اخْتِلَافٌ.

সারকথা : 'কেউ যদি ঠাট্টা করে বা খেল-তামাশা করে কুফরী কথা বলে বা কুফরী বক্তব্য দেয়, তাহলে সে সকলের ঐকমত্যে কাফের হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তার আকীদা বা অন্তরের বিশ্বাস ধর্তব্য হবে না। যেমনটি কাযী খান রাহ. তার ফাতাওয়া গ্রন্থে স্পষ্ট করেছেন।

তবে কেউ যদি ভুলবশত কিংবা বাধ্য হয়ে (অন্তরে ঘৃণা রেখে) বলে থাকে, তাহলে সে কারও মতে কাফের হবে না।

আবার কেউ জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে বললে, সকলের ঐকমত্যে সে কাফের সাব্যস্ত হবে।

তবে কেউ যদি অজ্ঞতাবশত স্বেচ্ছায় বলে, তাহলে সে কাফের সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।'[২৪৮]

ঈমান ভঙ্গের ষষ্ঠ কারণ

আল্লাহ ও রাসূলের অবমাননা বা কটূক্তি করা। যেমন : নবীজীকে যুদ্ধবাজ বা নারীলোভী বলা, অবমাননার উদ্দেশ্যে তাঁর ছবি আঁকা বা নামের অবমাননা করা ইত্যাদি।

ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রাহ. (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেন,

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ سَبَّ رَسُولَهُ، أَوْ دَفَعَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِكُلِّ مَا أَنْزَلَ اللهُ.

'কেউ যদি আল্লাহ তাআলা বা তাঁর রাসূলকে গালিগালাজ করে, অথবা আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করে, কিংবা কোনো নবীকে হত্যা করে, তাহলে সে মুসলমানদের নিকট সর্বসম্মতভাবে কাফের। যদিও সে আল্লাহর নাযিলকৃত প্রতিটি বিষয়ের স্বীকারোক্তি প্রদান করে।'[২৪৯]

শাতেম বিষয়ে বিধান

একটি বিষয় এমন, যেখানে সকল আবেগ ও শ্রদ্ধা নিহিত এবং নিজের জান-প্রাণ সবই নিবেদিত। তাই সেখানে আঘাত পেলে কোনো মলম কাজ করে না। সেখানে সহনশীলতা দেখানো যায় না, ছাড় দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। বিষয়টি হলো,

২৪৮. আল-বাহরুর রায়েক, ৫/২১০
২৪৯. আল-ইসতিযকার, ইবনে আবদিল বার, ৫/৩৪৩

CamScanner

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মান ও মর্যাদা এবং ইজ্জত ও সম্মান।

রাসূলকে গালিগালাজ করা, অবমাননা করা বা তাঁর সম্মান খাটো করা মুরতাদ হওয়ার চেয়েও মারাত্মক ও জঘন্য। কেননা, মুরতাদ মানে কাফের হয়ে যাওয়া, যা কেবল ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিপরীতে রাসূলকে গালিগালাজ করা কাফের হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকারও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ফলে এখানে দুই অপরাধ : কুফর ও কষ্টদান। কাজেই এটা মুরতাদের চেয়ে অনেক বেশি জঘন্য।

তাই তো ইসলামের প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে শত শত জানের নজরানা পেশ করা হয়েছে, সবই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে ও কুরবান করা হয়েছে। এরপরও নবীজীর অবমাননা বরদাশত করা হয়নি এবং তাঁর সম্মানের প্রশ্নে কোনো আপস করা হয়নি।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ»، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»... فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কা'ব বিন আশরাফের ব্যাপারটা কে দেখবে? কারণ, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি চান আমি তাকে হত্যা করি? রাসূল বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তারা (ইহুদী) কা'বকে হত্যা করে ফেলেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তা জানালেন।'[২৫০]

এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, রাসূলের গালিদাতা ও কষ্টদাতাকে হত্যা করা হবে।

খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম মালেক রাহ.-কে (মৃ. ১৭৯ হি.) জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়, তাহলে বিধান কী হবে?

ইমাম মালেক রাহ. জবাব দেওয়ার আগে এমন এক বাক্য বললেন, যার আবেদন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। তিনি বললেন,

---

২৫০. বুখারী, হাদীস নং ৩০৩১, ৪০৩৭; মুসলিম, হাদীস নং ১৮০১; এ ধরনের আরও একাধিক ঘটনা রয়েছে, তা জানতে দেখুন, আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩৬১, ৪৩৬২; আসসারিমুল মাসলূল, ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা ১২৮

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا بَقَاءُ الْأُمَّةِ بَعْدَ شَتْمِ نَبِيِّهَا؟

'হে আমীরুল মুমিনীন! ওই উম্মত বেঁচে থাকার কী অর্থ, যে উম্মতের নবীকে গালি দেওয়া হয়?'

অতঃপর তিনি জবাব দিয়ে বললেন,

مَنْ شَتَمَ الْأَنْبِيَاءَ: قُتِلَ، وَمَنْ شَتَمَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُلِدَ.

'যে নবীগণকে গালি দেয় তাকে হত্যা করতে হবে, আর যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের গালি দেয় তাকে পেটাতে হবে।'[২৫১]

ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. (মৃ. ১৮২ হি.) বলেন,

وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَبَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَوْ كَذَّبَهُ، أَوْ عَابَهُ، أَوْ تَنقصهُ: فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ وَبَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتِلَ.

'কোনো মুসলিম যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিংবা তাঁর দোষ বর্ণনা করে অথবা তাঁর সম্মান খাটো করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। অতঃপর যদি সে তাওবা করে, তাহলে তা কবুল করা হবে; অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।'[২৫২]

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) বলেন,

ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تنقصه: كان بذلك مرتدًا. وذلك لقوله تعالى: لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ.

'যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে অথবা তাকে খাটো করে উপস্থাপন করবে, এর কারণে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং তাকে সাহায্য করো ও তাকে সম্মান করো।'[২৫৩]

তিনি অন্যত্র লেখেন,

قَالَ أَصْحَابُنَا فِيمَن سبّ النَّبِي ﷺ أَو عابه وَكَانَ مُسلما: فقد صَار مُرْتَدا. وَلَو كَانَ ذِمِّيا عزّر وَلم يقتل.

হানাফী ইমামগণ বলেছেন, 'কোনো মুসলিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিলে বা তাঁর দোষ বর্ণনা করলে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর জিম্মি হলে তাকে তা'যীর করা হবে, হত্যা করা হবে না।'[২৫৪]

---

২৫১. আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, কাযী ইয়ায, ২/৪৯২
২৫২. কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ১৯৯
২৫৩. সূরা ফাতহ, (৪৮) : ৯; শারহে মুখতাসারিত তাহাবী, ৬/১৪১-১৪২
২৫৪. মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা, ৩/৫০৪

CS CamScanner

প্রখ্যাত ফকীহ ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (মৃ. ১২৫২ হি.) শাতেম বিষয়ে 'তাম্বীহুল উলাতি ওয়াল হুক্কাম আলা আহকামি শাতিমি খাইরিল আনাম' নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন। এতে তিনি এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, হানাফী মাযহাবমতে মুসলিম শাতেমের তাওবা কবুল হবে এবং হত্যা করা হবে না; তবে বারবার প্রকাশ পেলে তাওবা কবুল হবে না। তিনি বলেন,

المسلم ظاهر حاله أن السب إنما صدر منه عن غلط وحمق وسبق لسان، لا عن اعتقاد جازم، فإذا تاب وأناب وأسلم: قبلنا إسلامه، بخلاف الكافر؛ فإن ظاهر حاله يدل على اعتقاد ما يقول، وأنه أراد الطعن في الدين.

ولذلك قلنا فيما مر: إن المسلم أيضا إذا تكرر منه ذلك، وصار معروفا بهذا الاعتقاد داعيا إليه يقتل، ولا تقبل توبته وإسلامه كالزنديق، فلا فرق ح بين المسلم والذمي؛ لأن كُلًّا منهما إذا تكرر منه ذلك وصار معروفا به: دل ذلك على أنه يعتقد ما يقول، وعلى خبث باطنه وظاهره وسعيه في الأرض بالفساد، وأن توبته إنما كانت تقية ليدفع بها عن نفسه القتل.

'একজন মুসলিমের বাহ্যিক অবস্থা তো এটাই হবে যে, তার থেকে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানের খেলাফ কোনো কিছু প্রকাশ পাবে, তা হয়তো তার ভুলে বা নির্বুদ্ধিতায় অথবা মুখ ফসকে বের হয়েছে। সে দৃঢ়ভাবে সেগুলো বিশ্বাস করে এমন নয়। কাজেই সে তাওবা করে পুনরায় ইসলাম আনলে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু কাফেরের ব্যাপারটা এমন নয়। কারণ, কাফেরের বাহ্যিক অবস্থা হচ্ছে, সে যা বলে তা-ই বিশ্বাস করে এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনের দোষারোপ করা।

তবে যদি কোনো মুসলিম থেকে তা বারবার প্রকাশ পায় এবং এ বিশ্বাসের সাথে সে পরিচিতি লাভ করে ও দাওয়াত দিয়ে বেড়ায়, তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে এবং তার ইসলাম ও তাওবা যিন্দীকের মতো কোনোটাই কবুল করা হবে না।

তখন কাফের জিম্মি শাতেম ও মুসলিম শাতেমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হবে না। কেননা, জিম্মি ও মুসলিম থেকে তা বারবার প্রকাশ পাওয়া এবং উক্ত বিশ্বাসের সাথে পরিচিতি লাভ করার ফলে এ কথা প্রমাণিত হবে যে, তারা যা বলে তা-ই বিশ্বাস করে এবং তাদের অন্তরে সমস্যা রয়েছে ও তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। আর তাওবাকে তারা হত্যা থেকে বাঁচার জন্য তাকিয়া হিসেবে ব্যবহার করছে।'[২৫৫]

ইমাম আবু বকর ইবনুল মুনযির রাহ. (মৃ. ৩১৮ হি.) বলেন,

وأجمع عوام أهل العلم عَلَى وجوب القتل عَلَى من سب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ومن تبعهم.

২৫৫. মাজমুআ রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১/৩৫৫

'অধিকাংশ আহলে ইলম ঐকমত্যভাবে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গালাগালকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব। এটা ইমাম মালেক, লাইস, শাফেয়ী, আহমদ ও ইমাম ইসহাক রাহ. ও তাঁদের অনুসারীদের বক্তব্য।'[২৫৬]

কাযী ইয়ায রাহ. (মৃ. ৫৪৪ হি.) বলেন, 'একই মত ইমাম আবু হানীফা ও হানাফীদের এবং ইমাম সাওরী, আহলে কুফা ও ইমাম আওযায়ীর (তথা হত্যা করা ওয়াজিব)।'[২৫৭]

ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রাহ. (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেন,

قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ مَنْ سَبَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ سَبَّ رَسُولَهُ...: أَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِكُلِّ مَا أَنْزَلَ اللهُ.

'মুসলমানরা সর্বসম্মতভাবে বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের কটূক্তি করে, তাহলে সে কাফের। যদিও সে আল্লাহর নাযিলকৃত প্রতিটি বিষয়ের স্বীকারোক্তি প্রদান করে।'[২৫৮]

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাহনূন রাহ. (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেন,

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ شَاتِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَنَقِّصَ لَهُ كَافِرٌ، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وَحُكْمُهُ عِنْدَ الْأُمَّةِ الْقَتْلُ. وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ كَفَرَ.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগালকারী ও তাঁর কুৎসাকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা হয়েছে। এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহর শাস্তি ও ধমক রয়েছে। উম্মাহর কাছে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে বিধান হলো হত্যা করা। আর যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তির কাফের ও শাস্তির ব্যাপারে সন্দেহ করবে, সেও কাফের।'[২৫৯]

ইমাম আবু সুলায়মান খাত্তাবী রাহ. (মৃ. ৩৮৮ হি.) বলেন,

أن السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين، ولا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কটূক্তিকারী মুরতাদ। আমার জানামতে কোনো মুসলমান উক্ত মুরতাদের হত্যার আবশ্যকতার ব্যাপারে মতবিরোধ করেনি।'[২৬০]

আর মুরতাদ যদি তাওবা না করে, তাহলে পুরুষ হলে মুরতাদের শাস্তি সকলের

২৫৬. আল-ইকনা', ইবনুল মুনযির, ২/৫৮৪
২৫৭. আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, ২/৪৭৫
২৫৮. আল-ইসতিযকার, ইবনে আবদিল বার, ৫/৩৪৩
২৫৯. আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, ২/৪৭৬
২৬০. মাআলিমুস সুনান, ৩/২৯৬

CamScanner

ঐকমত্যে হত্যা বা মৃত্যুদণ্ড। তবে সে তাওবা করলে যদি যিন্দীক না হয়, তাহলে অধিকাংশ আলেমের ঐকমত্যে তা গ্রহণযোগ্য হবে।[২৬১]

শাতেমের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে কি না

ওপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শাতেমে রাসূলের নিম্নোক্ত দুই বিষয়ে সবাই একমত :

১. সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে তথা মুরতাদ সাব্যস্ত হবে।

২. সে তাওবা না করলে যদি পুরুষ হয়, তার শাস্তি মুরতাদের মতো হত্যা বা মৃত্যুদণ্ড।

তবে একটু ইখতিলাফ হচ্ছে, শাতেম নিজ থেকে তাওবা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না কিংবা তাকে হত্যার পূর্বে তার থেকে তাওবা চাওয়া হবে কি না?

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবমতে ফতোয়া হলো, যদি সে নিজ থেকে তাওবা করে অথবা তার কাছে তাওবা তলব করার পর তাওবা করে, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে। এভাবে শাফেয়ী মাযহাবে একাধিক মত থাকলেও ফতোয়া হলো, শাতেমের তাওবা গ্রহণযোগ্য।

উল্লেখ্য, 'ফাতহুল কাদীর'সহ ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কিছু কিতাবে আছে, শাতেমের তাওবা কবুল হবে না; বরং তাকে হত্যা করতে হবে। এটা মুফতাবিহী কওল বা এ কথার ওপর ফতোয়া নয়।

আর মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত ও হাম্বলীদের এক মত অনুযায়ী এবং অনেক আলেমের মতে শাতেমের তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তাকে হত্যা করতে হবে।[২৬২]

এ ইখতিলাফের মূল কারণ হচ্ছে, তাওবা গ্রহণকারীদের মতে শাতেমের জন্য আলাদা কোনো বিধান নেই। এটা মূলত ইরতিদাদেরই একটি প্রকার। তাই মুরতাদ ও শাতেমের বিধান একই। আর শাতেমের তাওবা অগ্রহণযোগ্যের প্রবক্তরা বলেন, শরীয়ত শাতেমের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি রেখেছে। কাজেই শাতেমের শাস্তি 'হদ'-এর অন্তর্ভুক্ত। আর যে বিষয়টি 'হদ'-এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন যিনা ও চোরের শাস্তি, সেখানে তাওবা হোক বা না হোক, কোনোভাবেই ক্ষমার সুযোগ নেই।[২৬৩]

জরুরি জ্ঞাতব্য

১. ইরতিদাদ বা মুরতাদ হওয়ার মানে হচ্ছে ইসলামের সাথে বিদ্রোহ করা। আর

---

২৬১. আল-ইসতিযকার, ইবনে আবদিল বার, ২২/১৪৩; মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা, ৩/৫০১; মাজমুআ রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১/৩১৮ ও ৩২২

২৬২. আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ, ২২/১৮৪ ও ১৯৩; মাজমুআ রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১/৩২১-৩২৪

২৬৩. মাজমুআ রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১/৩২১ ও ৩২৬

ইসলামে ইরতিদাদ ও বিদ্রোহের শাস্তি হত্যা বা মৃত্যুদণ্ড আবশ্যকীয় হলেও তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। তাই ইরতিদাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান মৃত্যুদণ্ডের কার্যকর যেভাবে চায়, সেভাবে করতে পারবে। কিন্তু ইসলাম যে সকল ক্ষেত্রে হত্যাকে 'হদ' হিসেবে সাব্যস্ত করেছে, সেখানে ইসলামপ্রদত্ত হত্যার যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে, এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

সুতরাং হানাফীসহ যাদের নিকট শাতেম ও মুরতাদের বিধান একই, তাদের মতে রাষ্ট্রপ্রধান চাইলে শাতেমের মৃত্যুদণ্ড মর্মান্তিক ও অপমানজনকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে। কাজেই এর মাধ্যমে শাতেমের শাস্তির মাত্রা পদ্ধতির ক্ষেত্রে বেশি করে দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই ধরনের অন্যায় করার কল্পনাও করতে না পারে।

২. শাতেমের শাস্তি যদি 'হদ'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তা খলীফা বা তার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছাড়া অন্য কেউ বাস্তবায়ন করার কোনো সুযোগ নেই। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্র তা কখনো বাস্তবায়ন করবে না।

পক্ষান্তরে শাতেমের শাস্তি যদি 'হদ' না হয়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়াও অন্য কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে, যার আলোচনা সামনে আসছে। কাজেই হানাফী মাযহাবমতে ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলেও শাতেমের শাস্তি বাস্তবায়নের সুযোগ পাওয়া যাবে।

শাতেমের শাস্তির বিধান

শাতেম ও মুরতাদের বিধান যেহেতু একই, সুতরাং মুরতাদের যে শাস্তি, শাতেমেরও একই শাস্তি। আর কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে বিধান হলো, তার নিকট দ্বিতীয়বার ইসলাম পেশ করা হবে। যদি ইসলাম নিয়ে তার কোনো সংশয়ের কারণে সে ধর্ম ত্যাগ করে থাকে, তাহলে তা দূর করা হবে। অথবা সে নিজে যদি সময় চায় বা তার ইসলাম কবুলের ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া যায়, তাহলে তাকে তিন দিন সময় দেওয়া হবে।

যদি মুরতাদ ব্যক্তির নিকট ইসলাম পেশ করার পরও সে কবুল না করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহে মুরতাদের শাস্তির বিধান এভাবে বলা হয়েছে।[২৬৪]

আর ইসলামী রাষ্ট্রে মুরতাদের বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রশাসনের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং খলীফা বা তার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা বাস্তবায়ন করবে।

২৬৪. মাজমুআ রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১/৩২৬

CamScanner

এখানে একটি প্রশ্ন হলো, মুরতাদকে প্রশাসনের হাতে পেশ করার আগেই যদি কেউ হত্যা করে ফেলে, তখন কী হবে? বা কেউ এ কাজ করে ফেললে ওই ব্যক্তির কী শাস্তি হবে?

বর্তমানে অনেক সময় এ প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয় এবং সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার সময় খুব বেশি আলোচিত হয়। তাই এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের কিছু বক্তব্য পেশ করছি।

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) বলেন,

قال أصحابنا: لَا يُقْتَلُ الْمُرْتَدّ حَتَّى يُسْتَتَابَ، وَمَنْ قَتَلَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَتَابَ: فَقَدْ أَسَاءَ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

'আমাদের হানাফী আলেমগণ বলেছেন, ইসলামের দিকে পুনরায় আহ্বান করা ছাড়া মুরতাদকে হত্যা করা হবে না। তবে কেউ হত্যা করে ফেললে সে ভুল করেছে। কিন্তু তার ওপর কোনো জরিমানা আসবে না।'[২৬৫]

ইমাম মারগীনানী রাহ. (মৃ. ৫৯৩ হি.) 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বলেন,

(فَإِنْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ كُرِهَ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ) وَمَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ هَاهُنَا: تَرْكُ الْمُسْتَحَبِّ وَانْتِفَاءُ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ مُبِيحٌ لِلْقَتْلِ، وَالْعَرْضُ بَعْدَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ.

'কেউ যদি মুরতাদকে ইসলাম পেশ করার পূর্বে হত্যা করে ফেলে, তাহলে মাকরূহ তথা মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেওয়ার গুনাহ হবে। তবে হত্যাকারীর ওপর কোনো জরিমানা বা কিছু আরোপ করা হবে না।'[২৬৬]

'ফাতাওয়া শামী'তে রয়েছে,

(وَكُرِهَ) تَنْزِيهًا لِمَا مَرَّ (قَتْلُهُ قَبْلَ الْعَرْضِ بِلَا ضَمَانٍ)؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ مُبِيحٌ لِلدَّمِ، (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْعَرْضَ مُسْتَحَبٌّ.

'মুরতাদের নিকট ইসলাম পেশ করার পূর্বে তাকে হত্যা করা মাকরূহে তানযীহি। কারণ, তাকে ইসলাম পেশ করা মুস্তাহাব। তবে কেউ করে ফেললে কোনো জরিমানা আসবে না।'

আল্লামা আবদুল হাই লাখনাভী রাহ. (মৃ. ১৩০৪ হি.) বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন,

يعني لو قتل المرتد قبل عرض الاسلام عليه: كان تاركا للأمر المستحب، مرتكبا المكروه تنزيها؛ لأن العرض مستحب، لا واجب. (بلا ضمان) يعني لا يجب على القتال ضمان دية ولا كفارة؛

---

২৬৫. মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা, ৩/৫০১; আত-তামহীদ, ইবনে আবদিল বার, ৫/৩১০

২৬৬. আল-হিদায়াহ, ২/৪৩৫, মাকতাবাতুল আমজাদ

لأنه قتل من هو مستحق بالقتل، فكان قتله مباحا، ولا شيء في ارتكاب المباح، غاية الأمر: أنه ترك الأمر المندوب.

'মুরতাদকে ইসলাম পেশ করার পূর্বে হত্যা করে ফেললে একটি মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে মাকরূহে তানযীহির গুনাহ হবে। কারণ, মুরতাদকে দ্বিতীয়বার ইসলাম পেশ করাটা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।...

'হত্যাকারীর ওপর কোনো জরিমানা আসবে না'—এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, এই হত্যার কারণে হত্যাকারীকে কোনো রকম দিয়াত বা কাফফারা কিছুই দিতে হবে না। কারণ, সে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, যে হত্যার উপযুক্ত ছিল। কাজেই সে একটি বৈধ কাজ করেছে। আর বৈধ কাজে কোনো জরিমানা আসে না। সর্বোচ্চ এতটুকু বলা হবে, সে একটি মুস্তাহাব আমল ছেড়ে দিয়েছে।'[২৬৭]

বলাবাহুল্য, এটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের বিধান। কাজেই আমাদের বাংলাদেশসহ গণতান্ত্রিক দেশসমূহে কিন্তু প্রশাসন হত্যাকারীকে এমনি ছেড়ে দেবে না।

এখন প্রশ্ন আসবে, তাহলে কেউ শাতেম বা মুরতাদ প্রমাণিত হলেই তাকে মেরে ফেলবে জনগণ?

উত্তর :

জনগণ আইন হাতে তুলে নেবে না এবং তাকে মারবে না; বরং এই কাজ রাষ্ট্র ও প্রশাসন করবে। আর রাষ্ট্রপক্ষ এই কাজ করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধ্য। তা ছাড়া জনগণ আইন হাতে তুলে নিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে বা অনেকে এই সুযোগে অহেতুক হত্যা ও ফাসাদে লিপ্ত হবে। কাজেই জনগণ এতে কোনো দখল দেবে না। এটাই ইসলামের বিধান এবং ইসলাম এটাই শিক্ষা দেয়।

কিন্তু কোনো ব্যক্তি শাতেম বা মুরতাদ হওয়াটা যদি স্পষ্টভাবে ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, আর যদি কোনো মুসলিম ঈমানী গায়রত থেকে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো জেল-জরিমানা আরোপ করা হবে না। এভাবে তার নিন্দা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যাবে না, কিংবা এই ধরনের কাজ ইসলাম সমর্থন করে না—এ-জাতীয় কথাও বলা যাবে না।

তবে হ্যাঁ, উক্ত ব্যক্তিকে হত্যার পর যদি সে শাতেম বা মুরতাদ হওয়াটা প্রমাণিত না হয়, তাহলে ইসলাম কাউকে খুন ও হত্যা করার যে শাস্তি রেখেছে, সে অনুযায়ী হত্যাকারীর ব্যাপারে ফয়সালা করা হবে।

জি, এটাই ইসলামের আদল ও সৌন্দর্য, যা মানুষকে ঈমানী গায়রত শিক্ষা দেবে।

২৬৭. উমদাতুর রিআয়াহ, ৪/৪৮০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

CamScanner

সাথে সাথে এটাও সতর্ক করে দেবে যে, যদি ঈমানী গায়রতের জযবা সঠিকভাবে প্রয়োগ না করে, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

আল্লাহ আমাদের বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত থেকে রাষ্ট্র ও প্রশাসনকে তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করার এবং মুসলমানদের তাদের ঈমানী গায়রত ও জযবা সঠিকভাবে প্রয়োগ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ঈমান ভঙ্গের সপ্তম কারণ

ইসলামের অকাট্য কোনো বিধানের ওপর আপত্তি তোলা বা যুগের সাথে অনুপযোগী মনে করা কিংবা সংস্কারযোগ্য বলে মনে করা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

امَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

'রাসূল তার ওপর তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও।... এবং তারা বলে, আমরা (আল্লাহ ও রাসূলের বিধানসমূহ মনোযোগ সহকারে) শুনেছি এবং তা (খুশিমনে) কবুল বা পালন করছি।'[২৬৮]

অন্যত্র এসেছে,

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ

'আমরা আল্লাহ এবং যে সত্য (ইসলামের বিধানাবলি) আমাদের প্রতি আগত হয়েছে, তাতে কেন ঈমান আনব না? অথচ আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।'[২৬৯]

ইসলামের বিধানাবলির প্রতি ঈমান আনার অনিবার্য অর্থ হচ্ছে, মুসলিম হওয়া তথা নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। আল্লাহর প্রতি ঈমান আর আল্লাহর বিধানে আপত্তি একত্র হতে পারে না। রাসূলের প্রতি ঈমান আর তাঁর আদর্শের ওপর আপত্তি, কুরআনের প্রতি ঈমান আর তার কোনো আয়াত বা বিধানের ওপর আপত্তি কখনো একত্রিত হয় না।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো সমর্পণ আর ইবলীস ও তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য হলো

---

২৬৮. সূরা বাকারা, (২) : ২৮৫

২৬৯. সূরা মায়েদা, (৫) : ৮৪

CamScanner

বিপরীত যুক্তি। এখন তো শুধু আপত্তি বা বিপরীত যুক্তিই নয়, রাসূল, কুরআন ও ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহকারীকেও মুসলমান মনে করা হয়। কারও প্রতি ঈমান, অতঃপর তার বিরুদ্ধতা—এ দুটো একত্র হওয়া অসম্ভব হলেও 'অসহায়' ইসলামের ব্যাপারে বর্তমানের 'বুদ্ধিজীবী'দের কাছে তা পুরোপুরিই সম্ভব। বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই জানেন, ইসলামবিহীন তথা সমর্পণবিহীন ঈমানের কথা কল্পনাও করা যায় না, আর না তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এ তো ঈমানের সাথে সরাসরি বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৭০]

হিন্দুস্তানের প্রখ্যাত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ দেহলবী রাহ. (মৃ. ১৩৭২ হি.) বলেন, 'কুরআনের বিধানাবলি বর্তমান যুগে উন্নতি-অগ্রগতির পথে বাধা মনে করা একটি স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। এমন ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

যে ব্যক্তি কুরআনের বিধানাবলির বিরুদ্ধে চলা ব্যক্তিদের উন্নত মনে করবে এবং তাদের কার্যক্রমকে ইনসাফের ভিত্তি বলবে, সে মুসলমান থাকবে না। এমন আকীদা লালনকারী ব্যক্তি নামে মাত্র মুসলমান। বাস্তবে সে ইসলামী আকীদার বিরোধী এবং ইসলাম ধর্ম থেকে খারেজ।'[২৭১]

ঈমান ভঙ্গের অষ্টম কারণ

সুনিশ্চিত প্রমাণিত ইসলামের কোনো বিধান বা রাসূলের সুন্নাহকে শরীয়তের বিধান হিসেবে অপছন্দ করা।

ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

'যারা কাফের তাদের জন্য আছে ধ্বংস। এবং আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এই জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।'[২৭২]

উল্লেখ্য, দ্বীনের কোনো বিষয়কে শরীয়তের বিধান হিসেবে অপছন্দ করে না; বরং অপছন্দ করে স্বভাবগত কারণে বা ঝামেলা-বিরক্তি, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি কারণে, যেমন : ঠান্ডা পানির কারণে শীতের রাতে ওযু করতে অপছন্দ করা, ভালোবাসা কমে যাবে বলে স্বামীর একাধিক বিবাহ অপছন্দ করা, তাহলে এটা কুফর নয়।

সুতরাং কারও স্ত্রী বহুবিবাহের শরয়ী বিধানকে অপছন্দ ও ঘৃণা করলে কাফের হয়ে

২৭০. দ্র. ঈমান সবার আগে, মাওলানা আবদুল মালেক

২৭১. কিফায়াতুল মুফতী, ১/৩০২, জামিয়া ফারুকিয়া থেকে তাককীককৃত নুসখা

২৭২. সূরা মুহাম্মাদ, (৪৭) : ৮-৯

CS CamScanner

যাবে। তবে স্ত্রী শরয়ী বিধানকে অপছন্দ করে না; বরং তার স্বামীর অন্য মহিলাকে বিয়ে করাটা অপছন্দ করে, তাহলে ঈমান ভঙ্গ হবে না।

ঈমান ভঙ্গের নবম কারণ

অকাট্যভাবে প্রমাণিত কিছু বিধান মানা, আর কিছু না মানা।

অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোর কিছু মানা আর কিছু না মানা কুফর। এগুলোর কিছু মেনে আর কিছু না মেনে কুফর ও ঈমানের মাঝামাঝি কোনো পথ অবলম্বন করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতকের (রাসূলগণের থেকে) ওপর ঈমান রাখি ও কতককে অস্বীকার করি। আর (এভাবে) তারা (কুফর ও ঈমানের মাঝখানে) মাঝামাঝি কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই কাফের। আর আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।'[২৭৩]

আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের সেই মাঝামাঝি পন্থা হলো, আল্লাহকে বিশ্বাস করা, কিন্তু রাসূলকে অবিশ্বাস করা। অথবা রাসূলদের কাউকে মান্য করা আর কাউকে অমান্য করা।

অনুরূপ প্রচলিত কিছু মাঝামাঝি পন্থা হলো, কুরআন মানা, কিন্তু হাদীস না মানা; যেমনটা আহলে কুরআন, কুরআনিস্ট বা হাদীস অস্বীকারকারীরা করে থাকে।

তদ্রূপ শরীয়তের এক বিধান মানা ও অন্য বিধান অমান্য করা। যেমন : ব্যক্তিগত জীবনের বিধি-বিধান ও নামাজ-রোযার বিধান মনঃপূত হওয়া বা স্বীকার করা, কিন্তু সমাজ, রাজনীতি, সংসদ, বিচার, শিক্ষা কারিকুলাম, অর্থনীতি, লেনদেন, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী, বেশভূষা, আনন্দ-উৎসব ও সংস্কৃতিতে ইসলামের বিধান অবিশ্বাস করা বা মনঃপূত না হওয়া। এভাবে শরীয়তপ্রদত্ত সুখ-শান্তির বিধান ও 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' ভালো লাগা, কিন্তু কষ্ট ও জিহাদের হুকুম অস্বীকার করা, যা সেকুলার-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও মডারেটরা বলে থাকে।

---

২৭৩. সূরা নিসা, (৪) : ১৫০-১৫১, আরও দেখুন, সূরা বাকারা, (২) : ৮৫

অথবা ইসলামপ্রদত্ত নারীর মর্যাদা ও নারীশিক্ষার বিষয়টি (আংশিক) লুফে নেওয়া, কিন্তু নারীর পর্দা ও উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষ সমানাধিকারী নয়—এ-জাতীয় বিধানে সম্মত না হওয়া, যা নারীবাদী ও হিজবুত তাওহীদরা করে থাকে।

এভাবে ইসলামের যে (অকাট্য) বিধান নেতা-নেত্রী ও দলের পক্ষে যায় কিংবা দুনিয়ার লাভ ও নিজ স্বার্থ রক্ষা হয়, তা গ্রহণ করা; কিন্তু যা নেতা-নেত্রী ও দলের বিপক্ষে যায় কিংবা লাভ ও স্বার্থের বিপরীত হয়, তা অগ্রাহ্য করা। এগুলো সবই কুফর।

প্রকৃতপক্ষে এগুলো মাঝামাঝি কোনো পন্থা নয়; বরং নির্জলা কুফর। কেননা, রাসূলকে অবিশ্বাস করা আল্লাহকে অবিশ্বাস করারই নামান্তর; যেহেতু তাঁরা আল্লাহ কর্তৃকই প্রেরিত। তদ্রূপ শরীয়তের কোনো অকাট্য বিধান অমান্য-অস্বীকার করা আল্লাহকে অস্বীকার করারই নামান্তর; যেহেতু আল্লাহ তাআলাই সমস্ত বিধানের বিধানদাতা এবং সবই একই সূত্রে গাঁথা।

সুতরাং ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী পন্থা বলতে কিছু নেই; হয় ঈমান নয়তো কুফর। অর্থাৎ ঈমানের বাইরে সবই কুফর।

ঈমান ভঙ্গের দশম কারণ

অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিধানাবলির সুনির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যা ও রূপ-পদ্ধতির বিপরীত ভিন্ন ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করা। এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা ওপরে ঈমানের আলোচনায় হয়েছে। তবে এখানে একটা তথ্য যোগ করছি—

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. (মৃ. ১১৭৬ হি.) বলেন,

أن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له، لا ظاهرا ولا باطنا فهو كافر، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهرا وباطنا؛ لكنه يفسر بعض ماثبت من الدين ضرورة، بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة: فهو الزنديق، كما إذا اعترف بأن الجنة والنار حق، لكن المراد بالجنة: الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة، والمراد بالنار: هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة، وليس في الخارج جنة ولا نار: فهو الزنديق...

'ইসলামের বিরোধী ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে-গোপনে কোনোভাবেই ইসলাম মেনে না নেয় এবং স্বীকার না করে, তাহলে সে কাফের। তবে যদি অন্তরে কুফর রেখে মুখে ইসলাম স্বীকার করে, তাহলে সে মুনাফিক।

আর যদি প্রকাশ্যে-গোপনে ইসলাম স্বীকার করে, কিন্তু দ্বীনের যে সকল বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনো বিধানের এমন ব্যাখ্যা করে, যা সাহাবা, তাবেয়ীন ও উম্মাহর সর্বসম্মত ব্যাখ্যার বিপরীত, তাহলে সে যিন্দীক। যেমন : কেউ স্বীকার করল, জান্নাত-জাহান্নাম সত্য; কিন্তু জান্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই

CamScanner

প্রফুল্লতা, যা প্রশংসিত গুণাবলি থেকে সৃষ্ট হয় এবং জাহান্নাম দ্বারা উদ্দেশ্য সেই অনুশোচনা, যা নিন্দিত গুণাবলি থেকে অস্তিত্ব লাভ করে, বাস্তবে জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কিছু নেই। তাহলে এমন ব্যক্তি যিন্দীক।'

অতঃপর বলেন,

ثم التأويل تأويلان: تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع، فذلك الزندقة. فكل من أنكر... عذاب القبر، أو أنكر الصراط والحساب، سواء قال: لا أثق بهؤلاء الرواة، أو قال: أثق بهم لكن الحديث مأول، ثم ذكر تأويلاً فاسداً لم يسمع من قبله، فهو الزنديق.

'ব্যাখ্যা দুই প্রকার। এক প্রকার হলো, যা কুরআন-হাদীসের অকাট্য বিষয় এবং উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়। দ্বিতীয় প্রকার হলো, যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক। সেটাই হলো যান্দাকা।

তো যে ব্যক্তি কবরের আযাব অস্বীকার করবে, অথবা পুলসিরাত ও হিসাব-নিকাশকে অবিশ্বাস করবে, অস্বীকার ও অবিশ্বাসের ভিত্তিরূপে যা-ই উল্লেখ করুক; যেমন বলল, এসবের বর্ণনাকারীগণের ওপর আমার আস্থা নেই, অথবা আস্থা আছে, তবে হাদীসটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, অতঃপর এমন কোনো ভুল ব্যাখ্যা উল্লেখ করল, যা পূর্বে শোনা যায়নি, তাহলে সে যিন্দীক।'[২৭৪]

যান্দাকা ও যিন্দীকের পরিচয়

'ফাতাওয়া শামী' গ্রন্থে যিন্দীকের পরিচয়ে বলা হয়েছে,

إِنَّ الزِّنْدِيقَ يُمَوِّهُ كُفْرَهُ وَيُرَوِّجُ عَقِيدَتَهُ الْفَاسِدَةَ وَيُخْرِجُهَا فِي الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ، وَهَذَا مَعْنَى إِبْطَانِ الْكُفْرِ.

'যিন্দীক তার কুফরকে লুকিয়ে রাখে এবং তার বাতিল আকীদাকে বিশুদ্ধ রূপের আকৃতিতে প্রকাশ ও প্রচার করে। এটাই হলো কুফর লুকিয়ে রাখার অর্থ।'

'আল-মাসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ' গ্রন্থে এসেছে,

وَالزَّنْدَقَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: إِظْهَارُ الْإِسْلَامِ وَإِبْطَانُ الْكُفْرِ، فَالزِّنْدِيقُ هُوَ مَنْ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ. قَالَ الدُّسُوقِيُّ: وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مُنَافِقًا، وَيُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ زِنْدِيقًا.

'অধিকাংশ ফকীহের মতে যান্দাকা হলো, কুফর লুকিয়ে রেখে বাহিরে ইসলাম প্রকাশ করা। কাজেই যিন্দীক এমন ব্যক্তি, যে নিজেকে মুসলিম দাবি করে, কিন্তু অন্তরে কুফরী আকীদা লুকিয়ে রাখে।

২৭৪. আল-মুসাওওয়া, ২/২৬৮, ২৬৯

CamScanner

দুসূকী মালেকী রাহ. (মৃ. ১২৩০ হি.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যাকে মুনাফিক বলা হতো, ফকীহগণ তাকে যিন্দীক বলে।'

আল্লামা আইনী রাহ. (মৃ. ৮৫৫ হি.) মুনাফিকের সংজ্ঞা উল্লেখ করার পর বলেন,

هذا التفسير تفسير الزنديق اليوم.

'মুনাফিকের এ সংজ্ঞা ও বর্তমান যুগের যিন্দীকের সংজ্ঞা একই।'

এ কারণেই ইমাম মালেক রাহ. (মৃ. ১৭৯ হি.) বলেছেন,

الْمُنَافِقُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الزِّنْدِيقُ الْيَوْمَ.

'আজকের যিন্দীকই হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মুনাফিক।'[২৭৫]

সারকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যাদের মুনাফিক বলা হতো, ফকীহগণের পরিভাষায় তারাই যিন্দীক।

জানা কথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কারও মনে লুকিয়ে থাকা নেফাক জানার জন্য কোনো অকাট্য মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। কাজেই বর্তমানে শুধু ওই সকল লোককেই মুনাফিক বলা যাবে, যাদের থেকে ইসলামের দাবিদার হওয়ার পাশাপাশি এমন কোনো কথা ও কাজ প্রকাশ পায়, যা তাদের মনের কুফরকে প্রকাশ করে। যান্দাকা ও ইলহাদ মুনাফিকিরই একটি প্রকার। আর এটি সাধারণ মুনাফিকির তুলনায় অধিক ক্ষতিকর ও মারাত্মক।

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর কারও মনে আকীদাগত মুনাফিকি যতই লুকিয়ে থাকুক, তা জানার মাধ্যম আমাদের নিকট না থাকার কারণে আমরা কাউকে আকীদাগত মুনাফিক বলতে পারি না। তবে বর্তমানে মুনাফিকির একটি প্রকার অবশিষ্ট আছে, যাকে 'যান্দাকা' বলা হয়। তা হলো, ইসলামের দাবিদার ও শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসরণকারী হওয়ার পাশাপাশি দ্বীনের কোনো অকাট্য বিধানের ভুল ব্যাখ্যা করে তার সর্বসম্মত অর্থ ও মর্ম বিকৃত করা, যেমনটা কাদিয়ানী সম্প্রদায় করে থাকে।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) ইলহাদ ও যান্দাকার বিরাট ক্ষতি ও ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ রেখে 'ফায়সালুত তাফরিকাহ বাইনাল ইসলাম ওয়ায যানদাকাহ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে তিনি কুরআন-হাদীস

---

২৭৫. দেখুন, আল-মাসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ, ২৪/৪৭ ও ২১/৩১; আত-তামহীদ, ইবনে আব্দিল বার, ১০/১৫৪; উমদাতুল কারী, ১/২১৭; আরও দেখুন, তাফসীরে কুরতুবী ও ইবনে কাসীর সূরা বাকারার ১০ নং আয়াতের অধীনে

এবং উক্তি ও যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা ও বিকৃতির মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। তিনি সাব্যস্ত করেছেন, মুসলিম সমাজে যিন্দীক ও মুলহিদদের কোনো স্থান নেই। নিজেরা মুসলমান হওয়ার দাবি করলেও অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে তারা ইসলামের সীমানা থেকে বাইরে।

ঈমান ভঙ্গের এগারোতম কারণ

অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো হারামকে হারাম মনে না করা তথা বৈধ মনে করা অথবা হালালকে হারাম মনে করা। যেমন : সুদ-ঘুষ, জুলুম-দুর্নীতি, মদ-মাদকদ্রব্য, গান-বাদ্য, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, লিভ-টুগেদার, সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডারবাদ (রূপায়নকামিতা) ও প্রাণী/মানবভাস্কর্য ইত্যাদিকে হারাম জানা সত্ত্বেও হালাল-বৈধ মনে করা অথবা পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ বা বিধবা মহিলার বিবাহকে হালাল-বৈধ জানার পরও হারাম মনে করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ

'কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং পরকালেও নয়, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না আর সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া আদায় করে।'[২৭৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ.

'তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনই করে বোলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। কেননা, এর অর্থ হবে তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ।'[২৭৭]

ইমাম কুরতুবী রাহ. (মৃ. ৬৮৫ হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

ومعنى هذا: أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان، إلا أن يكون البارئ تعالى يخبر بذلك عنه.

'অর্থাৎ কোনো বস্তু হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা।

২৭৬. সূরা তাওবা, (৯) : ২৯
২৭৭. সূরা নাহল, (১৬) : ১১৬

অন্য কেউ তা সাব্যস্ত করতে পারে না।'

আল্লামা হেবাতুল্লাহ তুরকিস্তানী রাহ. (মৃ. ৭৩৩ হি.) 'আকীদাতুত তাহাবী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১২৮) আরও সুস্পষ্ট করে বলেন,

لأنّ التّحليل والتحريم في الأصل من صفات الله تعالى، إذ ليس لأحد دونه تحليل شيء ولا تحريمه على الحقيقة، فإذا استحَل ما حرّم الله تعالى يكون منازعا فيما تفرّد الله تعالى، به فيكون منازعه في الربوبيّة، فيكفر بذلك.

'হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করা একমাত্র আল্লাহ তাআলার গুণ ও ক্ষমতা। তিনি ছাড়া আর কেউ তা করতে পারে না। আর আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করার অর্থ হচ্ছে, তাঁর একক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা। অতএব সে ব্যক্তি কাফের সাব্যস্ত হবে।'

আকীদা ও ফাতাওয়ার প্রায় কিতাবে হারামকে হালাল মনে করলে কাফের হয়ে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে। কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি—

ইমাম আযম আবু হানীফা রাহ. (মৃ. ১৫০ হি.)-এর নামে প্রচলিত 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে রয়েছে,

ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب، وإن كانت كبيرة، إذا لم يستحلها. وقد شرحه الملا على القاري في «شرح الفقه الأكبر» فقال: لأن من استحل معصية قد ثبتت حرمتُها بدليل قطعي فهو كافر.

'আমরা কোনো মুসলমানকে কোনো গুনাহ (কুফর-শিরক ছাড়া) করার কারণে কাফের বলি না—যদিও তা কবীরা গুনাহ হোক—যতক্ষণ না সে উক্ত গুনাহকে হালাল মনে করবে।'

মোল্লা আলী কারী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'যে ব্যক্তি অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো গুনাহকে হালাল-বৈধ মনে করবে, সে কাফের।'

'আকীদাতুত তাহাবী'তেও একই বক্তব্য রয়েছে,

ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحِلَّهُ.

'ফাতাওয়া শামী' গ্রন্থে রয়েছে,

استحلال المعصية القطعية كفر.

'অকাট্যভাবে প্রমাণিত গুনাহকে (সগীরা হোক বা কবীরা) হালাল মনে করা কুফর।'

ইমাম নববী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৬৭৬ হি.) 'মিনহাজুত তালিবীন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৯৩) বলেন,

فمن نفى الصانع... أو حلل محرما بالإجماع... كفر.

ইবনে কুদামা হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৬২০ হি.) 'আল-মুগনী' ১০/৮৩ গ্রন্থে লেখেন,

من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين... كفر.

সারাংশ : 'কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করলেও কাফের হবে না। তবে যারা অকাট্য ও সর্বসম্মত হারামকে জানার পরও হালাল বা বৈধ মনে করবে, তারা কাফের হয়ে যাবে।'

মোল্লা আলী কারী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন,

وفي الجواهر:)من أنكر حرمة الحرام المجمع على حرمته، أو شك فيها(أي: يستوي الأمر فيهما) كالخمر والزنى واللواطة والربا: كفر .(

'যে ব্যক্তি কোনো অকাট্য হারাম বিষয়ের হুরমতকে (হারাম হওয়াটাকে) অস্বীকার করবে বা এতে সন্দেহ করবে (অর্থাৎ হালাল-হারাম উভয়কে সমান মনে করবে), সে কাফের হয়ে যাবে। যেমন : মদ, যিনা, সমকামিতা, সুদ।'[২৭৮]

সুতরাং যারা কোনো অকাট্য ও সর্বসম্মত গুনাহকে হারাম জানার পরও বৈধ মনে করবে, তাদের ঈমান ও বিবাহ নবায়ন করা জরুরি। কেননা, যারা কুফরী করবে, তারা মুরতাদ ও তাদের স্ত্রী তালাক। এবং মৃত্যুর পূর্বে ঈমান নবায়ন না করলে তাদের জানাযা ও মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হারাম।

কাযী ইয়ায মালেকী রাহ. (মৃ. ৫৪৪ হি.) 'আশ-শিফা' গ্রন্থে এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা নকল করেছেন। তাঁর ভাষ্য হচ্ছে,

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَكْفِيرِ كُلِّ مَنِ اسْتَحَلَّ القَتْلَ أَوْ شُرْبَ الخَمْرِ أو الزِّنَا مِمَّا حَرَّمَ اللهُ، بَعْدَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهِ.

'আল্লাহর হারামকৃত কাজ, যেমন : খুন, মদপান ও যিনা ইত্যাদিকে হালাল মনেকারী ব্যক্তি মুসলমানদের ঐকমত্যে কাফের।'[২৭৯]

আর হালালকে হারাম মনে করার ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

'হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেছেন, সেসবকে তোমরা হারাম সাব্যস্ত কোরো না এবং সীমালঙ্ঘন কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।'[২৮০]

---

২৭৮. শারহু আলফাযিল কুফর, মাজমুয়ে রাসায়েলে মোল্লা আলী কারী, ৭/১৭৮

২৭৯. আশ-শিফা, ২/২৮৭

২৮০. সূরা মায়েদা, (৫) : ৮৭

CamScanner

হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর রয়েছে :

১. বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে করে নেওয়া। যদি ওই বস্তু অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে, তবে তাকে হারাম বিশ্বাস করলে কাফের হয়ে যাবে।

২. উক্তির মাধ্যমে কোনো বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নেওয়া। উদাহরণত এরূপ প্রতিজ্ঞা করা যে, ঠান্ডা পানি পান করবে না, কিংবা অমুক হালাল খাদ্য খাবে না অথবা অমুক জায়েয কাজ করবে না। যদি কসমের শব্দযোগে হালাল বস্তুটিকে নিজের ওপর হারাম করে থাকে, তবে কসম শুদ্ধ হবে। বিনা প্রয়োজনে কসম না করা চাই। কিন্তু এরূপ কসম ভঙ্গ করলে তার কাফফারা দেওয়া জরুরি।

ইরশাদ হয়েছে,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

'আল্লাহ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমরা যে শপথ পরিপক্কভাবে করে থাকো, সে জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। সুতরাং তার কাফফারা হলো, দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাবার দেবে, যা তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে খাইয়ে থাকো। অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করবে কিংবা একজন গোলাম আযাদ করবে। তবে কারও কাছে যদি (এসব জিনিসের মধ্য হতে কিছুই) না থাকে, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা, যখন তোমরা শপথ করবে (এবং তারপর তা ভেঙে ফেলবে)। তোমরা নিজেদের শপথকে রক্ষা করো।'[২৮১]

ব্যাখ্যা : 'নিরর্থক শপথ' বলতে এমন সব কসমকে বোঝানো হয়, যা কসমের উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল বাকরীতি হিসেবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এভাবে অতীতের কোনো বিষয়কে সত্য মনে করে যে কসম করা হয় এবং পরে প্রকাশ পায় যে, আসলে তা সত্য ছিল না বা তার ধারণা ভুল ছিল, সেটাও নিরর্থক শপথের অন্তর্ভুক্ত। এ-জাতীয় কসমে কোনো গুনাহ হয় না এবং কাফফারাও ওয়াজিব হয় না। তবে অপ্রয়োজনে কসম করা কোনো ভালো কাজ নয়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

আর 'শপথ পরিপক্কভাবে করা' থেকে ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করা সম্পর্কে যে শপথ করা হয়, তাকে বোঝানো হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় এরূপ শপথ ভাঙা কঠিন গুনাহ। কেউ এরূপ শপথ ভেঙে ফেললে তার কাফফারা দেওয়া

২৮১. সূরা মায়েদা, (৫) : ৮৯

ওয়াজিব, যা আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে সেই কসম, যাতে অতীতের কোনো বিষয়ে জেনে-শুনে মিথ্যা বলা হয় এবং প্রতিপক্ষের অন্তরে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য কসম করা হয়। এরূপ কসম করা কঠিন গুনাহ। তবে দুনিয়ায় এর জন্য কোনো কাফফারা নেই। কেবল তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমার আশা রাখা যায়।

শেষে বলা হয়েছে, 'শপথকে রক্ষা করো।' অর্থাৎ কসম করা কোনো তামাশার বিষয় নয়। সুতরাং প্রথমত চেষ্টা থাকতে হবে, কসম যত কম করা যায়। বিশেষ প্রয়োজনে যদি কসম করতেই হয়, তবে সাধ্যমতো তা পূর্ণ করার চেষ্টা থাকা চাই। অবশ্য কেউ যদি কোনো নাজায়েয কাজ করার জন্য কসম করে ফেলে, তবে তার জন্য অপরিহার্য হলো, সেই কসম ভেঙে ফেলা এবং তার কাফফারা আদায় করা। এমনইভাবে কেউ যদি কোনো জায়েয কাজ করার জন্য কসম করে, তারপর উপলব্ধি হয় সেই কাজ করা অপেক্ষা না করাই শ্রেয়, তখনো কসম ভেঙে কাফফারা আদায় করাই উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে এরূপ শিক্ষাই দান করেছেন।

৩. বিশ্বাস ও উক্তি কিছুই নয়, কিন্তু কার্যত কোনো হালাল বস্তুকে চিরতরে বর্জন করার সংকল্প করে নেওয়া। অর্থাৎ বিশ্বাস ও উক্তি দ্বারা কোনো হালালকে হারাম না করে কার্যত হারামের মতো ব্যবহার করলে যদি এরূপ বর্জনকে সওয়াবের কাজ মনে করে, তবে তা বিদআত ও বৈরাগ্য বা সংসারত্যাগ বলে গণ্য হবে।

তবে এরূপ বিধি-নিষেধ সওয়াবের নিয়তে না হয়ে অন্য কোনো কারণে, যেমন : কোনো দৈহিক কিংবা আত্মিক অসুস্থতার কারণে কোনো বিশেষ বস্তুকে স্থায়ীভাবে বর্জন করলে তাতে কোনো গুনাহ নেই। কোনো কোনো সূফী-বুযুর্গ হালাল বস্তু বর্জন করেছেন বলে যেসব ঘটনা বর্ণিত আছে, তা এমন ধরনের বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। তারা এসব বস্তুকে স্বীয় নফসের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছেন কিংবা কোনো বুযুর্গ ক্ষতিকর বলেছেন। তাই প্রতিকারার্থে তা বর্জন করেছেন। এতে কোনো দোষ নেই।[২৮২]

মাযহাবের ইমামগণ কোনো হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বানান না

খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মীয় পোপ ও পাদরিদের ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। ফলে তারা কোনো বস্তুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করলে নিঃসংকোচে তারা তা গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর হুকুমের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করে না।

কিন্তু মাযহাবের অনুসারীরা কুরআন-সুন্নাহর ওপর সঠিক পন্থায় আমল করার জন্য নিজেদের অসম্পূর্ণ ও কাঁচা বুঝের ওপর নির্ভর না করে কুরআন-সুন্নাহ

---

২৮২. দ্র. মাআরিফুল কুরআন, মুফতী শফী; তাওযীহুল কুরআন, সূরা মায়েদার ৮৯ নং আয়াতের তাফসীর

সম্পর্কে গভীর ও চূড়ান্ত পর্যায়ের পাণ্ডিত্য অর্জনকারী ইমামগণের অনুসরণ করেন। ইমামগণকে নিছক ব্যাখ্যাকার এবং কুরআন-সুন্নাহর জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ের মর্ম উদ্‌ঘাটনকারী হিসেবে মান্য করেন। শরীয়তের কোনো বিধান প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে এককভাবে তাদের সিদ্ধান্ত দলীলযোগ্য মনে করা হয় না।

সুতরাং প্রমাণিত হলো, মুসলিমগণ তাদের ইমামদের আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যাকারী মনে করে মাত্র।[২৮৩]

ঈমান ভঙ্গের বারোতম কারণ

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম-মতবাদকে সত্য-সঠিক মনে করা বা পরকালে মুক্তি পাবে বিশ্বাস করা। অথবা ইসলামের চেয়ে অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা ও সংবিধানকে উত্তম বা সমতুল্য মনে করা কিংবা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর মনে করা এবং ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা বিশ্বাস না করা।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম-দ্বীন অবলম্বন করবে, তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[২৮৪]

এ আয়াত বলছে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম-মতবাদকে সত্য-সঠিক মনে করা যাবে না কিংবা পরকালে মুক্তি পাবে বিশ্বাস করা যাবে না। কাজেই যে এরূপ বিশ্বাস করল, সে এ আয়াত অস্বীকার করল। আর যে কোনো আয়াত অস্বীকার করবে, সে নিশ্চিত কাফের হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন,

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ

'আল্লাহ কি বিচারকদের/শাসকবৃন্দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক/শাসক নন?'[২৮৫]

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

'তবে কি ওরা জাহিলিয়াতের বিধান চায়? আর বিশ্বাসী লোকদের জন্য বিধানদানে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে আছে?'[২৮৬]

---

২৮৩. সবিস্তারে জানতে দেখুন আমাদের 'কুরআন-হাদীস থাকতে মাযহাব কেন?' বইটি

২৮৪. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ৮৫

২৮৫. সূরা ত্বীন, (৯৫) : ৮

২৮৬. সূরা মায়েদা, (৫) : ৫০

CamScanner

অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস রাখে, তাদের নিকট দুনিয়াতে আল্লাহর বিধানের সম্মুখে আর কারও বিধান ভ্রূক্ষেপযোগ্যই হতে পারে না। সুতরাং যে কেউ ইসলামের চেয়ে অন্য কোনো সংবিধানকে উত্তম বা সমতুল্য মনে করবে কিংবা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর মনে করবে, সে এ আয়াতদ্বয় অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যাবে।

ইরশাদ হয়েছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।'[২৮৭]

ঈমান ভঙ্গের তেরোতম কারণ

সুনিশ্চিত কাফেরকে কাফের মনে না করা বা কুফরের ওপর সন্তুষ্ট হওয়া।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী (যেমন : হিন্দু ও ইহুদী-খ্রিষ্টান) বা মুসলিম নামধারী সুনিশ্চিত কাফেরকে (যেমন : কাদিয়ানী ও হিজবুত তাওহীদ ইত্যাদি দলের কুফরী বিশ্বাস জানার পরও) কাফের মনে না করলে নিজের ঈমান চলে যাবে, কাফের হয়ে যাবে। কেননা, 'ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম' এই বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি ইসলামের বিপরীত কুফর-শিরকমিশ্রিত সব ধর্ম, মতবাদ ও আদর্শকে অস্বীকার করে মুমিন হতে হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا

'যে ব্যক্তি তাগূতকে (তথা কুফর-শিরক বা কুফর-শিরকমিশ্রিত ধর্ম-মতবাদকে) অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে নিশ্চিত এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।'[২৮৮]

উক্ত আয়াতের মতো আমাদের কালেমার প্রথম অংশেও দুটি ভাগ :

১. 'লা-ইলাহা' তথা আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন-ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম ও তাদের অনুসারীকে অস্বীকার করা।

২. 'ইল্লাল্লাহ' তথা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর দ্বীন-ইসলামকেই বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

---

২৮৭. সূরা মায়েদা, (৫) : ৩
২৮৮. সূরা বাকারা, (২) : ২৫৬

CamScanner

সহীহ হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ...

'ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি জিনিসের ওপর ইসলামের ভিত্তি। (তন্মধ্যে একটা হলো,) আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সবকিছু অস্বীকার করা...।'[২৮৯]

ইমাম কুরতুবী মালেকী রাহ. (মৃ. ৬৭১ হি.) বলেন,

وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ.

'কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা কুফর।'[২৯০]

ইমাম নববী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৬৭৬ হি.) লেখেন,

وَالرِّضَى بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهُ كَافِرٌ يُرِيدُ الإِسْلَامَ أَنْ يُلَقِّنَهُ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ، فَلَمْ يَفْعَلْ، أَوْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يُسْلِمَ، أَوْ عَلَى مُسْلِمٍ بِأَنْ يَرْتَدَّ، فَهُوَ كَافِرٌ.

'কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা কুফর। এমনকি তা পরোক্ষভাবেই হোক না কেন। যেমন : কোনো কাফের ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে কালেমা পড়ানোর জন্য বলল, কিন্তু সে পড়াল না অথবা কাউকে পরামর্শ দিল যে, সে যেন ইসলাম গ্রহণ না করে কিংবা কোনো মুসলমানকে মুরতাদ হওয়ার পরামর্শ দিল, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।'[২৯১]

মোল্লা আলী কারী হানাফী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন,

والرضا بالكفر كفر، سواء كان بكفر نفسه، أو بكفر غيره.

'কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা কুফর। চাই নিজের কুফরের ব্যাপারে হোক বা অন্যের কুফরের ব্যাপারে হোক।'[২৯২]

আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন রেখে বলেন,

اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا

---

২৮৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬

২৯০. তাফসীরে কুরতুবী, ৫/৪১৮, সূরা নিসার ১৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়

২৯১. রওযাতুত তালিবীন, ১০/৬৫; আল-ই'লাম বি কাওয়াতিয়িল ইসলাম, ইবনে হাজার হায়তামী, পৃষ্ঠা ১০০ উল্লেখ্য, ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক কাফেরকে যদি এই জন্য দেরি করানো হয় যে, ব্যস্ততা শেষ করে ভালো করে সুন্দর করে তাকে ইসলাম গ্রহণ করানো হবে, তাহলে কাফের হবে না। হাঁ, তবে এভাবে দেরি করানো অনুচিত। তবে যদি দেরি করানো দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, এতদিন কাফের ছিলে, তো আর অল্প সময় কাফের থাকলে সমস্যা কোথায়, তাহলে সে কাফের হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

২৯২. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ২৫৬, তবে কারও ওপর আক্রোশ বা শত্রুতাবশত চাইলে কুফর হবে না।

CamScanner

‘আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তোমরা কি তাকে হেদায়েতের ওপর আনতে চাও? আর আল্লাহ কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তুমি তার জন্য কখনো কোনো পথ পাবে না।’[২৯৩]

ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন,

قلت: قال قائل: لا أعرف الكافر كافرا. قال: هو مثله.

‘কেউ যদি কাফেরকে কাফের মনে না করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।’[২৯৪]

কাযী ইয়ায রাহ. (মৃ. ৫৪৪ হি.) লেখেন,

نُكَفِّر من لم يُكَفِّر من دَان بِغَيْرِ ملّة الْمُسْلِمِين مِن المِلَل، أَو وَقَف فِيهِم، أَو شَكّ، أَو صَحَّح مَذْهَبَهُم، وَإِنْ أَظْهَرَ مَعَ ذَلِكَ الْإِسْلَامَ وَاعْتَقَدَهُ وَاعْتَقَدَ إِبْطَالَ كُلِّ مَذْهَبٍ سِوَاهُ: فَهُوَ كَافِرٌ بِإِظْهَارِهِ مَا أَظْهَرَ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ.

‘আমরা ওই ব্যক্তিকে কাফের বলি, যে ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণকারীদের কাফের বলে না, বা তাদের ব্যাপারে (সিদ্ধান্তহীনতার কারণে) কিছুই বলে না, কিংবা (তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে) সন্দেহ পোষণ করে, অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক বলে। যদিও সে এর সাথে সাথে নিজেকে মুসলিম বলে প্রকাশ করে ও ইসলামের আকীদা রাখে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মকে (মনে মনে) বাতিল বলে বিশ্বাস করে; তবুও সে কাফের। কারণ, সে ইসলামের বিপরীত বিষয় প্রকাশ করেছে।’[২৯৫]

মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রাহ.-কে (মৃ. ১৩৯৪ হি.) প্রশ্ন করা হয়,

اس شخص کے حق میں جو اسلام کو حق کہے اور دوسرے مذہب مثلاً بودھ مذہب کو بھی حق کہے؟

‘ওই ব্যক্তির বিধান কী, যে ইসলামকেও সত্য মনে করে এবং অন্য ধর্মকে, যেমন বৌদ্ধ ধর্মকেও সত্য বলে?’

উত্তরে যফর আহমদ উসমানী রাহ. বলেন,

ایسا شخص جو مذہب اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو بھی حق کہتا ہو کافر ہے

‘যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মকেও সত্য বলবে, সে কাফের হয়ে যাবে।’[২৯৬]

ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম—এই বিশ্বাস রাখতে হবে

আল্লাহ তাআলার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন-ধর্ম ইসলাম।

---

২৯৩. সূরা নিসা, (৪) : ৮৮

২৯৪. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি আবু মুতী’ (প্রচলিত আল-ফিকহুল আবসাত), আকীদা নং ২৫-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩১২

২৯৫. আশ-শিফা বি তা’রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, ২/৬১০

২৯৬. ইমদাদুল আহকাম, ৪/১৩০ ও ১৩২, নং ১৬

CamScanner

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন একমাত্র ইসলাম।'[২৯৭]

ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম, মতবাদ ও আদর্শ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْأٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করবে, তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[২৯৮]

ইমাম তাহাবী রাহ. তাঁর প্রসিদ্ধ 'আকীদা' গ্রন্থে বলেন,

وَدِينُ اللهِ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ.

'আসমান ও জমিনে আল্লাহর দ্বীন একটি; আর তা হচ্ছে দ্বীন-ইসলাম।'

অতঃপর তিনি আয়াত দুটি উল্লেখ করেন।

আল্লামা ইবনে হাযম যাহেরী (মৃ. ৪৫৬ হি.) রাহ. লেখেন,

كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ، وَكُلُّ دِينٍ سِوَاهُ بَاطِلٌ.

'রাসূলের আনীত সবই সত্য এবং ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম বাতিল।'[২৯৯]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন,

فَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بَاطِنًا وَظَاهِرًا بِأَنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ دِينًا سِوَى الْإِسْلَامِ: فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.

'যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ও গোপনে এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করবে না যে, আল্লাহ তাআলা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করবেন না, সে মুসলিম নয়।'[৩০০]

বলাবাহুল্য, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ঈমান ভঙ্গকারী যত ধর্ম-কর্ম, মতবাদ ও আদর্শ রয়েছে, সবই কুফর। আর কুফর সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

إِنْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

'যদি তোমরা কুফর অবলম্বন করো, তবে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের

---

২৯৭. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৯
২৯৮. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ৮৫
২৯৯. আল-মুহাল্লা, ১/২৮
৩০০. মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৭/৪৬৩

কারও মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে কুফর পছন্দ করেন না।'[৩০১]

প্রখ্যাত ফকীহ ইবনে নুজাইম মিসরী রাহ. (মৃ. ৯৭০ হি.) বলেন,

وَيَكْفُرُ إِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى بِالْكُفْرِ

'আল্লাহ তাআলা কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এমন বিশ্বাস করলে কাফের হয়ে যাবে।'[৩০২]

সুতরাং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোনো ধর্ম-কর্ম, মতবাদ ও আদর্শ বা নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা গ্রহণকারীদের কাফের বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রয়োজনে মুখে বলতে হবে।

কাফেরকে কাফের মনে করার এবং ধর্মীয় পরিচিতি স্পষ্ট থাকার প্রয়োজনীয়তা

ঈমান-কুফর, তাওহীদ-শিরক ও ইসলাম-অনৈসলামের মাঝখানে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা আছে এবং এটা সকলের কাছে পরিষ্কার থাকা অপরিহার্য। কারণ, এই সীমারেখা লঙ্ঘন কোনো সাধারণ অপরাধ নয়, যা সামান্য বা সাময়িক কোনো শাস্তিতে মোচন হয়ে যায়। এই সীমারেখার একপাশে চিরস্থায়ী জান্নাত, অন্যপাশে চিরকালীন জাহান্নাম। এই সীমারেখাকে মুছে দেওয়া কিংবা অস্পষ্ট করে দেওয়া মোটেই কোনো ছোটখাটো অপরাধ নয়।

ঈমান-কুফর বা ইসলাম-অনৈসলাম শুধু আখিরাত বা আল্লাহর বিচার্য বিষয় না। কিছু লোক ধর্মকে কেবল পরকালে আটকে দিতে চায়। দুনিয়াতে প্রত্যেকের ধর্মীয় পরিচিতি স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। কেননা, ঈমান-কুফর নির্ণয় করা ইসলামী আইনের অংশ, যা যোগ্য আলেমগণ করবেন। কারণ, এর সাথে বহু ইসলামী বিধান জড়িত। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

'নবী ও ঈমানদারদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে; যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হয়। যেহেতু এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা নিশ্চিত জাহান্নামী।'[৩০৩]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেব যদিও তার ভরপুর সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। নবী সাল্লাল্লাহু

---

৩০১. সূরা যুমার, (৩৯) : ৭

৩০২. আল-বাহরুর রায়েক, ৫/২০৩; ফাতাওয়া আলমগীরী, ২/২৭১

৩০৩. সূরা তাওবা, (৯) : ১১৩

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন, আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধ করা না হয় ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় এবং এর দ্বারা তাঁকে আবু তালেবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়।

তা ছাড়া তাফসীরে তাবারী প্রভৃতি গ্রন্থে আছে যে, কতিপয় মুসলিম তাদের মুশরিক বাপ-দাদাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তো নিজ পিতার মাগফিরাত কামনা করেছিলেন, সুতরাং আমরাও তা করতে পারি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

ইমাম কুরতুবী রাহ. বলেন, 'এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, জীবিত কাফেরের জন্য ঈমানের তাওফীক লাভের নিয়তে দুআ করা জায়েয রয়েছে, যাতে সে মাগফিরাতের যোগ্য হতে পারে।'

উহুদ যুদ্ধে কাফেররা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে আঘাত করে, তখন তিনি নিজ হাতে গণ্ডদেশের রক্ত মুছতে মুছতে দুআ করেছিলেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ.

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, কারণ তারা অবুঝ।'[৩০৪]

কাফেরদের জন্য উক্ত দুআর উদ্দেশ্য হলো, তাদের যেন ঈমান ও ইসলামের তাওফীক লাভ হয় এবং তার ফলে যেন তারা মাগফিরাতের যোগ্য হয়।

আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

'তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জানাযা পড়বেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।'[৩০৫]

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের মুনাফিকি প্রকাশ পেলেও সে প্রকাশ্যে যেহেতু নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করত, তাই বাহ্যত তার সাথে মুসলিমদের মতোই আচরণ করা হতো। তার যখন মৃত্যু হলো, তখন তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাযা

৩০৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭৭; শারহু মুকিলিল আসার, হাদীস নং ২৪৮৮
৩০৫. সূরা তাওবা, (৯) : ৮৪

CamScanner

পড়ানোর জন্য অনুরোধ করলে তিনি জানাযা পড়ালেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় এবং তাঁকে মুনাফিকদের জানাযার নামাজ পড়াতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কখনো কোনো মুনাফিকের জানাযার নামাজ পড়াননি।

সুতরাং আয়াতদ্বয়ের বিধান হলো, কোনো কাফের ও মুনাফিকের জানাযার নামাজ পড়া এবং তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করা জায়েয নয়।

এভাবে কোনো কাফেরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা তা জিয়ারত করতে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য অথবা কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে হলে তা এর পরিপন্থী নয়। যেমন : 'আল-হিদায়াহ' গ্রন্থে রয়েছে, যদি কোনো মুসলমানের কোনো কাফের-আত্মীয় মারা যায় এবং তার কোনো ওলী-ওয়ারিশ না থাকে, তবে মুসলমান-আত্মীয় সুন্নাত নিয়মের প্রতি লক্ষ না করে তাকে সাধারণভাবে মাটিতে পুঁততে পারে।[৩০৬]

এখন আমাদের কাছে যদি মৃত ব্যক্তির কুফরের ব্যাপারে বিধানগত কোনো মানদণ্ড না থাকে, তাহলে কীভাবে আমরা এই বিধান পালন করব!

তবে কোনো কাফের ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি সহযোগী হলে তার মৃত্যুতে আমরা ব্যথাতুর হতে পারি। কিন্তু তার জন্য পরকালীন মুক্তি, কল্যাণ ও শান্তি কামনা করা বা 'ওপারে ভালো থাকা'র কথা বলা বৈধ নয়।

আর নিজের ঈমান-আকীদা এবং ইসলামী স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা রক্ষা করে সাধারণ অবস্থায় অমুসলিম আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্য যেকোনো বিধর্মীর সাথে সদাচরণ শরীয়তে বৈধ। এমনকি তাদেরকে নফল দান-সাদকা করাও জায়েয।

দুনিয়াতে কাফেরের কিছু প্রাপ্য

সংক্ষেপে বললে :

১. কাফেরের জন্য মাগফিরাতের দুআ করা যায় না।

২. কাফেরের জানাযা পড়া যায় না।

৩. কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যায় না। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

৪. কাফেরের সাথে মুসলিমের বিবাহ বৈধ না। আর কারও কাছে ঈমান ভঙ্গের সুনিশ্চিত কোনো কারণ পাওয়া গেলে বিবাহ ভেঙে যায়। তাওবা করে পুনরায় বিয়ে নবায়ন হয়। অন্যথায় যিনার গুনাহ হতে থাকে।

---

৩০৬. দ্র. বয়ানুল কুরআন, থানভী; মাআরিফুল কুরআন, মুফতী শফী

CamScanner

৫. কাফের মুসলিমের ওয়ারিশ হয় না। সন্তান ঈমানহারা হলে সে পিতার সম্পত্তি পাবে না।

৬. কাফেরকে মুসলিমদের মতো সালাম দেওয়া যায় না।

৭. মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যায় না।

৮. কাফেরকে যাকাত ও ফিতরা দেওয়া যায় না।

৯. কাফের মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারে না।

১০. ইসলাম ত্যাগ করে কেউ কাফের-মুরতাদ হলে এর বিধান প্রয়োগ করতে হয়। যেমন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কিছু লোক যাকাত আদায় অস্বীকার করলে হযরত আবু বকর রাযি. ও সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে মুরতাদ হওয়ার সিদ্ধান্ত আরোপ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করার ঘোষণা দেন। এভাবে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসায়লামাতুল কাযযাব ও তার অনুসারীদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদের সাথে জিহাদ করে শত শত সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন।

কাজেই ঈমান-কুফর শুধু আল্লাহর বিচার্য বিষয় না; বরং এটা দুনিয়াতেই বিচার্য বিষয় এবং তা নির্ণয় করা ইসলামী আইনের অংশ। যেমনটা সাহাবায়ে কেরাম কিছু লোককে মুরতাদ আখ্যা দিয়েছেন।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি কাফের কি না অথবা মুসলিম পরিবারে জন্ম হলেও পরবর্তী সময়ে কাফের-মুরতাদ হয়ে গেছে কি না, এটা দুনিয়াতেই বিচার্য বিষয়। তবে তা গণহারে সবাই করতে পারবে না; বরং উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম ও মুফতী সাহেবরা এটা করবেন।

আলেমদের কি ফতোয়া দেওয়ার আইনগত অধিকার নেই?

কিছু কূপমণ্ডূক বলে থাকে, 'আলেমদের ফতোয়া দেওয়ার আইনগত কোনো অধিকার নেই।'

অথচ ফতোয়া দেওয়ার শরয়ী ও যৌক্তিক আইনগত অধিকার একমাত্র বিজ্ঞ মুফতী ও উলামায়ে কেরামেরই রয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায়ের আদেশ অংশেও বলা হয়েছে, 'ধর্মীয় বিষয়ে শুধু যথাযথ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ফতোয়া দিতে পারবেন।'[৩০৭]

আর ধর্মীয় বিষয়ে যথাযথ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ হলেন একমাত্র বিজ্ঞ মুফতী ও উলামায়ে কেরাম। কাজেই তাঁরাই ফতোয়া দেবেন, অন্য কেউ নয়। হ্যাঁ, যখন পৃথিবীতে

---

৩০৭. প্রথম আলো, ২৬ জানুয়ারি ২০১৫

উলামায়ে কেরাম থাকবেন না, তখন অজ্ঞরাই ফতোয়া দেবে—এ কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

'আল্লাহ তাআলা আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদের নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হলে ইলমবিহীন ফতোয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।'[৩০৮]

সুতরাং যতদিন আলেমগণ থাকবেন ততদিন ফতোয়া বন্ধ করার অধিকার কারও নেই।

মুসলিম-কাফের পরকালে আল্লাহ বিচার করবেন, এ নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না

কিছু বুদ্ধিজীবী ও সুশীল বলে থাকে, 'কে মুসলিম আর কে কাফের, তা পরকালে আল্লাহ বিচার করবেন। এ নিয়ে আমাদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা উচিত না।'

তাদের প্রতি প্রশ্ন রইল, কে রাষ্ট্রদ্রোহী, কে চোর-ডাকাত আর কে ভুয়া ডাক্তার ও ভুয়া পুলিশ, তাও আল্লাহ বিচার করবেন। এ নিয়ে দেশের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা উচিত কি?

যদি বলেন, দেশের মধ্যে যদি এগুলোর বিচার করা না হয়, তাহলে এ দেশ-জগতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা থাকবে না। ভুয়া ডাক্তারের কাছে প্রতারণার শিকার হয়ে এবং ভুয়া পুলিশের খপ্পরে পড়ে সাধারণ মানুষ নিজের জীবন ও সর্বস্ব হারাবে।

আমরাও বলি, কে মুসলিম আর কে কাফের এটা যদি পার্থক্য করে জানিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে সাধারণ মুসলমানরা ভুয়া মুসলিমদের (যেমন : আহমদিয়া মুসলিম জামাত তথা কাদিয়ানী সম্প্রদায়) কাছে প্রতারণার শিকার হয়ে নিজের অমূল্য সম্পদ ঈমান হারিয়ে বসবে।

কাদিয়ানীরা কুফরের মাঝে ইসলামের লেবেল লাগায়, নিজেদের কুফরকে ইসলাম বলে পেশ করে। এরা ইসলামের নামে মূলত মদভরতি বোতলের ওপর যমযমের পানির লেবেল লাগিয়ে বাজারজাত করে, কুকুরের গোশতকে গরুর গোশত বলে বিক্রি করে, ওষুধের নামে বিষ খাইয়ে দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের ঈমানহারা ও ইসলামছাড়া করে।

৩০৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০০

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ

'আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তোমরা কি তাকে হেদায়েতের ওপর আনতে চাও?'[৩০৯]

কাজেই যে কাফের ও পথভ্রষ্ট, তাকে সঠিক পথের পথিক বলার কোনো সুযোগ নেই।

এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে, কেউ কাফের হয়ে মারা গেলে তাকে কাফের হিসেবেই বিবেচনা করার সাথে সাথে এই বিশ্বাসও রাখতে হবে যে, সে চিরকাল জাহান্নামী। কারণ, কুরআন-হাদীসের অকাট্য ঘোষণা হলো, জান্নাত কোনো কাফেরের জন্য বানানো হয়নি। প্রত্যেক কাফেরের ঠিকানা জাহান্নাম। এটাই মুসলিম হিসেবে আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

'যারা কাফের—হোক আহলে কিতাব কিংবা মুশরিক—নিশ্চয় ওরা জাহান্নামের আগুনে যাবে, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ওরাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব।'[৩১০]

মানুষ তিন স্তরে বিভক্ত

ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেছেন, 'আমাদের (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ) মতে মানুষ তিন স্তরে বিভক্ত :

১. নবীগণ জান্নাতী। আর নবীগণ যাদের ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার কথা বলেছেন, তারাও জান্নাতী।

২. যারা কাফের-মুশরিক। আমরা সাক্ষ্য দিই, তারা জাহান্নামী হবে।

৩. যাদের ঈমান-তাওহীদ ঠিক আছে। তাদের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত কিছু বলি না। সুতরাং তারা জাহান্নামী বলে সাক্ষ্য দিই না, আবার জান্নাতী বলেও সাক্ষ্য দিই না। তবে তাদের জন্য জান্নাতের আশা রাখি এবং জাহান্নামের ভয় করি।'[৩১১]

ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন,

---

৩০৯. সূরা নিসা, (৪) : ৮৮

৩১০. সূরা বায়্যিনাহ, (৯৮) : ৬

৩১১. আল-আলিমু ওয়াল মুতাআল্লিম-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৮৪

CamScanner

قلت: فإن قال: لا أدري أين مصير الكافر؟ قال: هو جاحد لكتاب الله تعالى وهو كافر.

'কেউ যদি বলে, কাফেরের ঠিকানা কোথায় আমি জানি না, তাহলে সে কিতাবুল্লাহকে অস্বীকারের কারণে কাফের হয়ে যাবে।'[৩১২]

নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার কিতাবে আছে,

من يقول: لا أَعْلَمُ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا بُعِثُوا هَلْ يُعَذَّبُونَ بِالنَّارِ؟

أفتى جميع مشايخنا ومشايخ بلخ: بأنه يكفر. كذا في العتابية.

'যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, ইহুদী-খ্রিষ্টানকে পরকালে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে কি না আমার জানা নেই। মাশায়েখগণ বলেছেন, ওই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।'[৩১৩]

সুতরাং যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের জন্য ওপারে ভালো থাকার দুআ করার অধিকার আমাদের নেই। তবে কোনো পাপী ব্যক্তি যদি ঈমানসহ মারা যায়, তার জন্য আমরা দুআ করতে পারি—আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন, ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। কিন্তু আল্লাহ যখন আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, পরকালে কাফেরদের জন্য কোনো শান্তির অবকাশ নেই, তখন আল্লাহর এই জানিয়ে দেওয়া তথ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে আপনি কীভাবে তার জন্য পরকালের শান্তি কামনা করছেন!

একটি সংশয় নিরসন :

'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' : ধর্ম পালনের সুযোগ ও স্বাধীনতা; স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা নয়

কতক সুশীল ও বুদ্ধিজীবী এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বিভিন্ন টকশো, জনসভা ও সংসদে বলে থাকেন, সকল ধর্মকে এক চোখে দেখতে হবে, কোনো ধর্মকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা যাবে না কিংবা অগ্রহণযোগ্য বলা যাবে না। কারণ, পৃথিবীর সকল ধর্ম সত্য। মানে আমার ইসলাম ধর্মও সঠিক, অন্য ধর্মও সঠিক। এ-জাতীয় বয়ানের প্রবক্তারা এর স্বপক্ষে কুরআন থেকে দলীলও হাযির করে।

তাদের প্রধান দলীল হচ্ছে,

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

'তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আমার ধর্ম আমার জন্য।'[৩১৪]

---

৩১২. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি আবু মুতী' (প্রচলিত আল-ফিকহুল আবসাত), আকীদা নং ২৫ ও ৩৪-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩১২ ও ৩১৮

৩১৩. আল-বাহরুর রায়েক, ৫/২০৬; ফাতাওয়া আলমগীরী, ২/২৮৫

৩১৪. সূরা কাফিরুন, (১০৯) : ৬

আরেকটি দলীল,

فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

'অতএব যার ইচ্ছা মুমিন হোক এবং যার ইচ্ছা কাফের হোক।'[৩১৫]

তারা আয়াতের অর্থ ও মর্ম কীভাবে অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি করে এসব বক্তব্য দেয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখানে সবচেয়ে বড় যে ভুল বা প্রতারণা করা হয় তা হলো, ভিন্ন দুটি বিষয়কে একসাথে মিলিয়ে একাকার করে ফেলা।

একটি হচ্ছে, ধর্ম পালনের সুযোগ ও স্বাধীনতা।

আরেকটি হচ্ছে, ধর্মের স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা।

কোনো ধর্ম পালনের সুযোগ ও স্বাধীনতা কখনো উক্ত ধর্মের স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা নয়।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে উভয়ের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট করছি। দুনিয়াতে পরীক্ষার হলে যেভাবে সঠিক উত্তর দেওয়ার সুযোগ ও স্বাধীনতা রয়েছে, তেমনইভাবে ভুল উত্তর দেওয়ারও সমান সুযোগ ও স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষকের কাছ থেকে একমাত্র সঠিক উত্তরদাতা স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে। ভুল উত্তরদাতা পরীক্ষার হলে পরীক্ষকের কাছ থেকে সুযোগ ও স্বাধীনতা পেলেও কখনো স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

এর সদ্য একটি উদাহরণ হচ্ছে, কওমী সনদ স্বীকৃতি। স্বীকৃতির পূর্বেও কওমী শিক্ষার সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু উক্ত শিক্ষার (দরকারি স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও) সরকারি স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তদ্রূপ প্রত্যেক ধর্ম পালনের সুযোগ ও স্বাধীনতা আর ধর্মের স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা ভিন্ন বিষয়।

দুনিয়া হলো দারুল ইমতিহান বা পরীক্ষার হল, যা এ বইয়ের শুরুতে উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু দুনিয়াকে পরীক্ষার হল বানিয়েছেন, তাই পরীক্ষার হলের মতো প্রত্যেককে সুযোগ ও স্বাধীনতা দিয়েছেন। আর এ সুযোগ ও স্বাধীনতার কথা উল্লেখ হয়েছে কুরআনে কারীমের উক্ত দুই আয়াতে।

যেমন : দুনিয়ার পরীক্ষার হলের স্বাধীনতার ইঙ্গিত দিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

'যার ইচ্ছা হয়, (সঠিক উত্তর দিয়ে) মুমিন হও। আর যার ইচ্ছা হয়, (ভুল উত্তর

৩১৫. সূরা কাহাফ, (১৮) : ২৯

দিয়ে) কাফের হও।'

এভাবে لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ-এর অর্থ হচ্ছে, এ দুনিয়াতে তোমাদের কুফর ধর্ম ও আমার ইসলাম ধর্ম পালনের সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেভাবে পরীক্ষার হলে সঠিক ও ভুল উত্তর প্রদানকারী উভয়কে সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

এ কারণেই অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

'(সত্য ও সঠিক) ধর্ম গ্রহণে জবরদস্তি নেই।'৩১৬

তথা সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য জবরদস্তি করা যাবে না। কারণ, পরীক্ষার হলে আপনাকে সঠিক ও ভুল উত্তর উভয়টির সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এ সুযোগ ও স্বাধীনতা মানে কখনো কোনো ধর্মের স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা নয়। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার কাছে কোন ধর্ম স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে, তা সুস্পষ্ট করে তিনি বলে দিয়েছেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ইসলামই (স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য) দ্বীন-ধর্ম।'৩১৭

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন-ধর্ম হিসেবে পছন্দ ও নির্বাচন করলাম।'৩১৮

পক্ষান্তরে কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তা আল্লাহ্ তাআলার কাছে স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা তো পাবেই না; বরং এর পরিণতিও জানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে, তা কখনো গ্রহণযোগ্যতা পাবে না; বরং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'৩১৯

---

৩১৬. সূরা বাকারা, (২) : ২৫৬। কেউ কেউ এর তরজমা করে, 'ধর্ম পালনে জবরদস্তি নেই।' এটা ভুল। কেননা, ধর্ম গ্রহণের পর পালনে জবরদস্তি আছে। তাই কোনো মুসলিম নামাজ না পড়লে কিংবা মদপান করলে, তার ওপর প্রশাসনকে শাস্তি জারি করতে বলা হয়েছে।

৩১৭. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৯

৩১৮. সূরা মায়েদা, (৫) : ৩

৩১৯. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ৮৫

এটা সাধারণ কোনো আকীদা নয়; বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণ আকীদা। কেননা, কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয় বা অন্য ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা যদি কারও কাছে থাকে, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কাফের হয়ে যাবে।

আর কুফর সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

'যদি তোমরা কুফর অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে কুফর পছন্দ করেন না।'[৩২০]

আরও এসেছে,

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ . اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

'এটাই সেই জাহান্নাম, যার ভয় তোমাদের দেখানো হতো। আজ তোমরা কুফরের কারণে এতে প্রবেশ করো।'[৩২১]

এত সুস্পষ্ট বিবরণ থাকার পরেও তারা ধর্ম পালনের সুযোগ ও স্বাধীনতাকে ধর্মের স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা বলে চালিয়ে দিচ্ছে!

সুতরাং 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' বলে প্রত্যেককে যার যার ধর্ম পালনের সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে; স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা দেওয়া হয়নি।

'ওয়াহদাতুল আদইয়ান' ও 'হিওয়ারুল আদইয়ান' বা ইন্টারফেইথ তথা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ : বিধান ও সতর্কতা

সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, ইসলামের দুশমন ও চক্রান্তকারীরা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সময়ে সময়ে মুসলমানদের ঈমান-আকীদাবিধ্বংসী বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়ে থাকে। এগুলোর অন্যতম হলো, 'ওয়াহদাতুল আদইয়ান' (وحدة الأديان) তথা 'সর্বধর্ম মিলন' মতবাদ। এটাকে কখনো বলা হয়, 'তাওহীদুল আদইয়ান' তথা সকল ধর্মের ঐক্য, 'ওয়াহদাতুদ দ্বীনিল ইলাহী' তথা ঐশী ধর্মসমূহের ঐক্য, 'ওয়াহদাতুল কুতুবিস সামাবীয়্যাহ' তথা আসমানী কিতাবসমূহের ঐক্য ইত্যাদি।

যে নামেই বলা হোক না কেন, এ মতবাদের আকীদা-বিশ্বাস ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। কেননা, এর প্রবক্তাদের চিন্তা-চেতনা হলো, কোনো ধর্মকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা যাবে না বা অগ্রহণযোগ্য বলা যাবে না; বরং পৃথিবীর সকল ধর্ম সত্য, এক ধর্ম অন্য ধর্মের চাইতে কোনো অংশে কম নয় এবং মর্যাদার দিক থেকে সব ধর্মই সমান।

---

৩২০. সূরা যুমার, (৩৯) : ৭
৩২১. সূরা ইয়াসীন, (৩৬) : ৬৩-৬৪

CamScanner

যার সারকথা হলো, ইসলাম ধর্মও সঠিক, অন্য ধর্মও সঠিক। এটা যে স্পষ্ট কুফর, তা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং কোনো আলেম তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও যদি ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম বাতিল মনে না করে, তাহলে তার ঈমান থাকবে না।

যতদূর জানা যায়, 'সকল ধর্মই হক ও সঠিক এবং ধর্মের দৃষ্টিতে আসমানী ধর্মসমূহে কোনো বিবেদ নেই।' ইহুদীদের চটকদার এই ঘৃণ্য চক্রান্তে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম-বিশ্বে এই কুফরী মতবাদ প্রচার করা হয়। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিমকে হেফাজত করুন।

আর 'ঐশী ধর্ম বা আসমানী কিতাবসমূহের ঐক্য'-এর স্লোগান ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। কেননা :

প্রথমত, বর্তমান ইসলাম ধর্ম ও 'আল-কুরআন' ব্যতীত অন্য ঐশী ধর্ম ও আসমানী কিতাবসমূহ বিকৃত ও পরিবর্তিত।[৩২২]

দ্বিতীয়ত, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুরআন ও ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের পর পৃথিবীর সকল ধর্ম বাতিল ও রহিত হয়ে গেছে।

হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযি. বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ؛ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, এ উম্মতের যে কেউ আমার ব্যাপারে শুনেছে, সে ইহুদী হোক আর খ্রিষ্টান হোক, অথচ আমি যেই দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, এর ওপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।'[৩২৩]

আরেকটা হলো, 'হিওয়ারুল আদইয়ান' (حوار الأديان) বা 'ইন্টারফেইথ (interfaith) ডায়ালগ' তথা 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ'। এটাকে 'আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি' বা 'আন্তঃধর্মীয় ঐক্য'ও বলা হয়।

কেউ কেউ 'ইন্টারফেইথ' মানেই 'ওয়াহদাতুল আদইয়ান' বা 'সর্বধর্ম মিলন' মনে করে। ফলে ইন্টারফেইথে কেউ অংশ নেওয়া মানেই তিনি সব ধর্ম মিলিয়ে এক ধর্ম

---

৩২২. এ বিষয়ে সবিস্তারে জানতে দেখুন, বাইবেল বিকৃতি : তথ্য ও প্রমাণ, মাওলানা আব্দুল মতিন; খৃষ্টধর্মের স্বরূপ, মুফতী তাকী উসমানী; বাইবেল কি আল্লাহর বাণী?, আহমদ দিদাত; পবিত্র বাইবেল : পরিচিতি ও পর্যালোচনা, ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ.

৩২৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩

CamScanner

বানাতে চাচ্ছেন এমন মনে করে, অথচ ব্যাপারটা এমন না।

এ ধরনের সংলাপের ব্যাপারে মূলকথা হলো, স্থান-কাল-পাত্র এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তিতে এর বিধান নির্ণীত হবে।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামে বিধর্মীদের সাথে সদাচরণ ও সহাবস্থানের বিধান রয়েছে এবং মুসলমানরাও তা বিশ্বাস করে। কাজেই এ ধরনের সংলাপ যদি এ-জাতীয় কোনো কারণে হয়, তাহলে এতে অংশগ্রহণে দোষের কিছু নেই।

কিন্তু বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। কারণ, এ ধরনের সংলাপে অংশগ্রহণকারী মুসলিম স্কলাররা নিজেদের বিশ্বাস ও আদর্শ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পারেন না; বরং কেউ কেউ ইনিয়ে-বিনিয়ে অস্বীকৃতি, বিকৃতি বা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেন। এমনকি বিধর্মীরা ইসলামবিরোধী কিছু বললে তার প্রতিবাদ বা এ ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ও অবস্থান সুস্পষ্ট করতে পারেন না।

যেমন : আন্তঃধর্মীয় সংলাপের এক অনুষ্ঠানে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি পরস্পরের সম্প্রীতি ঠিক রাখার দাবি জানিয়ে জুমআর দিন প্রতিটি মসজিদের মিম্বার থেকে সকল ধর্মের ভালো দিকগুলো আলোচনা করার আহ্বান জানান। অথচ মুসলমানদের পক্ষে অংশগ্রহণকারী এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

এ ধরনের সংলাপের আরও কিছু বাস্তবতা হলো :

১. ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে ইকদামী জিহাদকে অস্বীকার করা হয় কিংবা জিহাদ বা ইসলামের অন্য কোনো কঠোর বিধানের অপব্যাখ্যা করা হয়।

এর কারণ হিসেবে বলা হয়, সকল ধর্মের মৌলিক শিক্ষায় কোনো উগ্রতা ও বাড়াবাড়ি নেই। তাই সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে আমাদেরকে প্রত্যেক ধর্মের মৌলিক শিক্ষায় ফিরে যেতে হবে। এখন শান্তি ও সম্প্রীতির সংজ্ঞা নির্ধারণে পশ্চিমাদের বানানো প্রচলিত হিউম্যান রাইটসের মতবাদকে মূল বানানো হয়। ফলে অনেক সময় ইন্টারফেইথ জিহাদকে স্বীকৃতি দেওয়ার বদলে উগ্রতা বলে দেয়। কাজেই ইন্টারফেইথ যখন বলে, সব ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের ধর্মের পাবন্দ হলেই দুনিয়া থেকে উগ্রতা ও হানাহানি দূর হবে, তা ভাঁওতাবাজি ছাড়া কিছু নয়।

২. শিক্ষাক্রমে সব ধর্ম রাখার প্রস্তাব রাখা হয়।

৩. সূক্ষ্মভাবে ইসলামবিরোধী বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাফেরদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করে কাফেরদের দালালিতে নাম লেখাতে বলা হয়।

৪. 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' বলে সকল ধর্মের স্বীকৃতি বা প্রত্যেক ধর্মই সঠিক হওয়ার কথা শোনা যায়। আবার কখনো অন্য ধর্মগুলোর কুফর সম্পর্কে অস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করা হয়।

৫. ইহুদী-খ্রিষ্টানরা যে চিরস্থায়ী জাহান্নামী, তা অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়।

৬. কোনো মুসলিম কখনোই কাফেরকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে না পারার কথা চেপে যাওয়া হয়।

সর্বোপরি কুফরের প্রতি মুসলমানের স্বভাবজাত ঘৃণা যে ঈমানের অংশ, তা এ ধরনের সংলাপের মাধ্যমে মুসলিমদের অন্তর থেকে শেষ করে দিয়ে তাওহীদ-শিরক একাকার করে ফেলার এবং ঈমান-কুফরের সীমানা মুছে দেওয়ার আয়োজন করা হয়।

প্রসঙ্গ : ধর্ম যার যার উৎসব সবার

আমাদের দেশে বহুল আলোচিত একটি স্লোগান হলো 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'। ওপরের আলোচনা থেকে অনেকটা পরিষ্কার যে, এটার বিধান কী হবে এবং এটা বিশ্বাস করলে বা পালন করলে ঈমানের ক্ষতি হবে কি না?

এরপরও কিছু আলোচনা করি। আমাদের জন্য অন্য ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জায়গায় যাওয়া নিষেধ। কুরআনে কারীমে আল্লাহর নেক বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ.

অর্থাৎ 'যারা মুশরিকদের উৎসবে অংশগ্রহণ করে না।'[৩২৪]

তাওস, মুজাহিদ, রবী' বিন আনাস, ইবনে সীরীনসহ সালাফের এক জামাআত বলেছেন, الزور هو: أعياد المشركين অর্থাৎ, এখানে (যূর) শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে, মুশরিকদের উৎসব।[৩২৫]

ইমাম যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেন,

وقد مدح الله من لا يشهد أعياد الكافرين ولا يحضرها، قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ... فمفهومه أن من يشهدُها ويحضرها يكون مذموماً ممقوتاً، لأنه يشهد المنكر ولا يُمكنه أن يُنكره، وقد قال النبي ﷺ: مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

---

৩২৪. সূরা ফুরকান, (২৫) : ৭২

৩২৫. আয়াতটির ব্যাখ্যা দেখুন, তাফসীরে বাগাবী, কুরতুবী, ইবনে কাসীর ও আদ-দুররুল মানসূর

CamScanner

'আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা, যারা কাফেরদের উৎসব প্রত্যক্ষ করে না এবং উপস্থিত হয় না, তাদের প্রশংসা করেছেন।

এর অর্থ হলো, যে কেউ এটি প্রত্যক্ষ করবে এবং এতে উপস্থিত থাকবে, সে নিন্দনীয় এবং ঘৃণার পাত্র হবে। কারণ, সে মন্দকে প্রত্যক্ষ করছে এবং তা প্রতিহত করতে পারছে না। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনো অন্যায় কাজ দেখবে, তখন যদি তার সামর্থ্য থাকে তাহলে হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, আর যদি সে শক্তিটুকুও না থাকে, তাহলে অন্তর দ্বারা তা ঘৃণা করবে, আর এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।'[৩২৬]

তাদের কুফর ও পূজায় সম্মানবোধ দেখিয়ে কিংবা তাদের কুফর ও শিরকে সন্তুষ্ট হয়ে এমন করলে ঈমান চলে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

'তোমরা ওই সকল কাফেরদের সাথে বসবেও না, যতক্ষণ না তারা (এসব কুফরী) আলোচনা পরিহার না করে; নতুবা তোমরা তাদের মতোই (কাফেরে পরিণত) হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন।'[৩২৭]

ইমাম কুরতুবী রাহ. (মৃ. ৬৭১ হি.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,

فَدَلَّ بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُنْكَرٌ، لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ فَقَدْ رَضِيَ فِعْلَهُمْ، وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ). فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَعَهُمْ فِي الْوِزْرِ سَوَاءً، وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ إِذَا تَكَلَّمُوا بِالْمَعْصِيَةِ وَعَمِلُوا بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّكِيرِ عَلَيْهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ.

'এতে বোঝা যায় যে, গুনাহগারদের সাহচর্য পরিত্যাগ করা ওয়াজিব, যখন তাদের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হবে। কেননা, যে তাদের পরিত্যাগ করবে না, সে যেন তাদের কাজে সন্তুষ্ট রয়েছে। আর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফর। আল্লাহ বলেন, "নতুবা তোমরা তাদের মতো হয়ে যাবে।"

সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের আসরে বসবে, কিন্তু তাদের ওপর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে না, সে গুনাহের ক্ষেত্রে তাদের মতোই সমান গুনাহগার হবে। তাই

৩২৬. তাশাব্বুহুল খাসীস বি-আহলিল খামীস, যাহাবী, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫, দারু আম্মার
৩২৭. সূরা নিসা, (৪) : ১৪০

করণীয় হচ্ছে, তাদের অন্যায় কথা ও কাজের প্রতিবাদ করা; আর যদি এতে সামর্থ্য না থাকে, তবে সেখান থেকে উঠে চলে আসা, যাতে এই আয়াতের (কঠিন বিধানের) অন্তর্ভুক্ত হতে না হয়।'[৩২৮]

হযরত উমর রাযি. বলেছেন,

وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ كَنَائِسِهِم يومَ عِيدِهِم، فإنَّ السُّخْطَةَ تنزِلُ عليهِم.

'তোমরা মুশরিকদের উপাসনালয়ে তাদের উৎসবের দিনে প্রবেশ কোরো না। কারণ, (সেই সময়) তাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়।'[৩২৯]

তিনি আরও বলেন,

اجْتَنِبُوا أَعْدَاءَ اللهِ فِيْ عِيدِهِمْ.

'তোমরা আল্লাহর শত্রুদের উৎসব থেকে দূরে থাকো।'[৩৩০]

আর বিজাতির উৎসব, সংস্কৃতি ও নিদর্শনাবলির ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের বলে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌলিক হেদায়েত দিয়ে ইরশাদ করেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

'যে কেউ যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের বলে গণ্য হবে।'[৩৩১]

আরেক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكًا لِمَنْ عَمِلَهُ.

'যে ব্যক্তি কোনো জাতির দল ভারী করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে। আর যে কোনো সম্প্রদায়ের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, সে উক্ত কাজের অংশীদার বলে ধর্তব্য হবে।'[৩৩২]

একটি আপত্তি ও তার জবাব :

অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবে অংশগ্রহণের ব্যাপারে একটি আপত্তি তোলা হয় যে, 'আমরা তো সেখানে তাদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ বা তাদের মতো পূজা করতে যাই না, আমরা একটু আনন্দ করতে যাই।'

---

৩২৮. তাফসীরে কুরতুবী, ৫/৪১৮

৩২৯. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস নং ১৬০৯, সনদ সহীহ; আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী, ১৮৮৬১

৩৩০. আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী, ১৮৮৬২, শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, ৮৯৪০

৩৩১. আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১, সনদ হাসান

৩৩২. দ্র. মুসনাদে আবু ইয়ালার সূত্রে নাসবুর রায়াহ, ৪/৩৪৬; আল-মাতালিবুল আলিয়া, ৮/৩১৯; কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারক, পৃষ্ঠা ৪৪৭; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১৩/৩৭; আল-মাকাসিদুল হাসানা, সাখাবী।

CamScanner

এই আপত্তি ও তার জবাব বহু পূর্বে ইমাম যাহাবী রাহ. দিয়েছেন। তিনি লেখেন,

فإن قال قائل: إنا لا نقصد التشبه بهم؟

فيقال له: نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام... إذ لو قصده كفر.

'কেউ যদি বলে, "মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়।"

এর উত্তরে তাকে বলা হবে, কেবল তাদের সাথে উৎসব ও পার্বণে সাযুজ্য গ্রহণ এবং অংশগ্রহণ করাটাই হারাম।... আর তাদের মতো উদ্দেশ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করলে তো কাফের হয়ে যাবে।'[৩৩৩]

ধর্মীয় স্বাধীনতার মানে এটা নয় যে, সকলে মিলে সকলের ধর্ম সেলিব্রেট ও উইশ করব এবং সকল ধর্মের অনুষ্ঠান ও উৎসব সবাই পালন করব। এতে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য থাকে না এবং এটা সকল ধর্মকে সত্য/সঠিক মনে করার প্রস্তাবনা, যা ইসলামবিদ্বেষীদের চেতনা।

সূরা কাফিরুন নাযিলের শানে নুযুল ও প্রেক্ষাপট থেকে জানা যায়, মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ-জাতীয় ধর্মীয় স্বাধীনতা ও উৎসব পালনের প্রস্তাব করলে আল্লাহ তাআলা এই সূরা নাযিল করে জানিয়ে দেন, 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য পালনীয়, আর আমার ধর্ম আমার জন্য পালনীয়।'

আর অসাম্প্রদায়িকতা মানে এই নয় যে, আপনি আমার মসজিদ ও ঈদগাহে নামাজ দেখতে যাবেন এবং কুরবানীর সময় গরুর গোশত খাবেন। আর আমি আপনার মন্দির ও মণ্ডপে পূজা দেখতে যাব এবং প্রসাদ খাব কিংবা সাগরপাড়ে প্রতিমা বিসর্জন দেখব, অথবা পূজা উপলক্ষে উইশ করব এবং শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানাব।

এগুলো অসাম্প্রদায়িকতা নয়, বরং অধার্মিকতা। নিরপেক্ষতা নয়, বরং অজ্ঞতা। সরলতা নয়, বরং শিথিলতা। সহনশীলতা নয়, বরং অকৃতজ্ঞতা। সহমর্মিতা নয়, বরং অবাধ্যতা। উদারতা নয়, বরং উদাসীনতা। এগুলো স্পষ্ট হারাম, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈমান-বিধ্বংসী কাজ।

সহীহ হাদীসে হযরত ছাওবান রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِيْنَ.

'অচিরেই আমার উম্মতের কিছু লোক মূর্তিপূজা করবে, আর কিছু লোক মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে।'[৩৩৪]

---

৩৩৩. তাশাব্বুহুল খাসীস বি-আহলিল খামীস, যাহাবী, পৃষ্ঠা ৩০

৩৩৪. ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৫২, সহীহ

বিধর্মী-মুশরিকদের ধর্মীয় উৎসবে শুভেচ্ছা জানানোর বিষয়টি মূর্তিকে সিজদা করার জন্য শুভেচ্ছা জানানোর নামান্তর! আর মূর্তিকে সিজদা করার জন্য শুভেচ্ছা জানানো যিনা করার জন্য শুভেচ্ছা জানানোর চেয়েও মারাত্মক। কারণ, এটা হলো শিরক। আর শিরকের চেয়ে জঘন্য কোনো অপরাধ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

'নিশ্চয় শিরক জঘন্যতম জুলুম ও অপরাধ।'[৩৩৫]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেন,

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يُهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تَهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلِمَ قائله من الكفر فهو من المحرّمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشدّ مَقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدِّين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنّأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كُفْر: فقد تعرّض لمقت الله وسخطه.

'কুফর-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুভেচ্ছা জানানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যেমন : তাদের উৎসব ও উপবাস পালন উপলক্ষে এমন বলা যে, "তোমাদের উৎসব শুভ হোক" কিংবা "তোমার উৎসব উপভোগ্য হোক"—এ-জাতীয় কথা।

যদি এ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা কুফর পর্যন্ত না-ও পৌঁছে, তবু এটি হারামের অন্তর্ভুক্ত। এটা ক্রুশকে সিজদা দেওয়ার জন্য কাউকে শুভেচ্ছা জানানোর পর্যায়ভুক্ত; বরং এটা আল্লাহর কাছে মদপান, হত্যা ও যিনা ইত্যাদির জন্য কাউকে অভিনন্দন জানানোর চেয়ে মারাত্মক ও জঘন্য গুনাহ।

যাদের কাছে ইসলামের যথাযথ মর্যাদা নেই, তাদের অনেকে এ গুনাহতে লিপ্ত হয়ে পড়ে; অথচ তারা এ গুনাহের কদর্যতা উপলব্ধি করে না। যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ বা বিদআত কিংবা কুফরী কর্মের জন্য কাউকে অভিনন্দন জানায়, সে নিজেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির সম্মুখীন করে।'[৩৩৬]

কোনো অপরাধের আয়োজনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন যুক্তিগতভাবেও নিন্দনীয় কাজ। অথচ যিনা করার জন্য শুভেচ্ছা জানানোকে অপরাধ মনে হলেও এর চেয়ে বড় অপরাধের শুভেচ্ছা জানানোকে কিছুই মনে করা হচ্ছে না! বরং এটাকে অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারতা আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

বর্তমান মুসলিম সমাজে কুফর, শিরক ও অবাধ্যতা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এগুলোর

৩৩৫. সূরা লুকমান, (৩১) : ১৩
৩৩৬. আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ১/৪৪১

প্রতি মুসলিমদের সহজাত ঘৃণাবোধ দূর হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ব্যাপারে বলেছেন,

وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.

'...আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা সুশোভিত করেছেন। আর তোমাদের কাছে কুফর, গুনাহ ও অবাধ্যতাকে ঘৃণিত করেছেন। তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে।'[৩৩৭]

দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া,

غیر مسلم حضرات کے تہوار وغیرہ ان کے مشرکانہ اعتقاد پر مبنی ہوتے ہیں؛ اس لیے ہمارے لیے مشرک سے برأت اور بے تعلقی کا اظہار ضروری ہے، اور چونکہ مبارکبادی دینے میں ان کے فکر وعقیدے کی توثیق و تائید ہوتی ہے؛ اس لیے اس سے احتراز ضروری ہے، بسا اوقات یہ سلبِ ایمان کا بھی باعث ہوسکتا ہے۔

'অমুসলিমদের উৎসব ইত্যাদি তাদের শিরকী বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। কাজেই আমাদের জন্য মুশরিকদের থেকে দূরত্ব এবং সম্পর্ক ছিন্নতার ঘোষণা দেওয়া আবশ্যক। আর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানোর দ্বারা যেহেতু তাদের চিন্তা-ভাবনা ও আকীদার সমর্থন হয়, তাই এটা থেকে দূরে থাকা জরুরি। কখনো কখনো এটি ঈমান ভঙ্গের কারণ হতে পারে।'[৩৩৮]

দারুল উলূম করাচির ফতোয়া,

کرسمس ہو یا دیوالی، غیر مسلموں کی کوئی بھی مذہبی عید یا تہوار ہو، مسلمانوں کے لیے اس میں حاضر ہونا ان کے جلسوں محفلوں میں شرکت کرنا یا ان کی عبادت گاہوں میں جانا اور ان کے ساتھ شرکت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس موقع پر ان کو اس تہوار کی تعظیم کی خاطر مبارکباد دینا یا ان کو ہدایا دینا جائز نہیں۔ بلکہ اگر اس سے ان کی دین کی تعظیم مقصود ہو تو اس میں کفر کا قوی اندیشہ ہے بلکہ بعض مشائخ نے ایسے شخص کو کافر فرمایا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کرسمس وغیرہ میں نصاریٰ کے ساتھ یکجہتی یا محبت کی غرض سے شرکت سے مکمل اجتناب کریں ورنہ سخت گناہ ہوگا اور اس میں کفر کا بھی قوی اندیشہ ہے ۔

'ক্রিসমাস হোক বা দিওয়ালি, অমুসলিমদের যেকোনো ধর্মীয় ঈদ বা উৎসবই হোক, মুসলমানদের জন্য সেখানে উপস্থিত হওয়া, তাদের মজলিসে অংশগ্রহণ করা বা তাদের উপাসনালয়ে গিয়ে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করা জায়েয নেই। অনুরূপ এই

৩৩৭. সূরা হুজরাত, (৪৯) : ৭

৩৩৮. দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ, ফতোয়া নং ১৪৫৬৪৯, তারিখ : ১৭/১১/২০১৬; দারুল ইফতা, বানূরী টাউন, ফতোয়া নং ১৪৪২০৪২০০৪১৩, তারিখ : ২৬/১১/২০২০

উৎসবকে সম্মান করার জন্য তাদের অভিনন্দন জানানো বা হাদিয়া দেওয়া জায়েয নেই; বরং এই কাজগুলো দ্বারা যদি তাদের দ্বীনকে সম্মান করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ব্যক্তির কুফর হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। কোনো কোনো শায়খ এমন ব্যক্তিকে কাফের বলেছেন।

অতএব মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য হলো, একাত্মতা বা ভালোবাসার উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টানদের সাথে ক্রিসমাস ও ইত্যাদিতে অংশ নেওয়া সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলা। অন্যথায় এটি একটি গুরুতর পাপ হবে এবং এতে কুফরের প্রবল আশঙ্কাও রয়েছে।'[৩৩৯]

আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমানী গায়রত দান করুন।

আশ্চর্য হচ্ছে, যারা 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' বলে অবুঝ মুসলিমদের ভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠান ও উৎসবে অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন, তারা কিন্তু ভিন্ন ধর্মের মানুষদের ইসলামের ইবাদতগুলোতে অংশগ্রহণের আওয়াজ তোলেন না![৩৪০] এটা কি তাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, নাকি ইসলামবিদ্বেষ?

এভাবে 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' মুসলমানদের কুরবানীর গরু জবাই করার সময় হিন্দুদের তো বলা হয় না। কারণ, হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে গরু জবাই করা অপরাধ। অথচ একইভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে পূজা করাটা সবচেয়ে বড় অপরাধ। সুতরাং একজন ঈমানদার কখনোই পূজার অনুষ্ঠানে যেতে পারে না।

আর 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এই কথাটা ওই সময় বলা যাবে, উৎসবটি যদি ধর্মীয় উৎসব না হয়। কিন্তু ধর্মকে কেন্দ্র করেই যেই উৎসব, সেই উৎসব অন্য ধর্মের হতে পারে না। এটা শুধু নিজ ধর্মের জন্যই হবে। অর্থাৎ 'ধর্ম যার যার ধর্মীয় উৎসবও তার তার।'

এবার সহজে বোঝার জন্য উদাহরণ পেশ করি।

ধরুন, একটি দলের অনুষ্ঠানে আপনার নেতাকে অপমান করা হচ্ছে। এখন আপনি ওই অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন? আপনি বাধাপ্রাপ্ত হবেন। কারণ, আপনার 'রাজনৈতিক ঈমান' আপনাকে বাধা দেবে। এ কারণেই জাতীয় সংসদে কোনো দলের নেতাকে অপমান করা হলে উক্ত দলের সংসদ সদস্যরা ওয়াক আউট করেন।

এখন আপনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের অনুষ্ঠানে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হন বা থাকতে পারেন না। কারণ, সেখানে আপনার রাজনৈতিক নেতাকে অপমান করা হচ্ছে। অথচ হিন্দুদের পূজার অনুষ্ঠানে শিরকের মাধ্যমে আপনার রবকে অপমান করা

৩৩৯. দারুল উলূম করাচির ওয়েবসাইট থেকে, ফতোয়া নং ৩৭, তারিখ : ২৫/৯/২০১৬

৩৪০. যদিও ইসলামে এ ধরনের কোনো সুযোগ নেই। এবং অমুসলিমরা সদলবলে ইসলামের ইবাদতগুলোতে অংশগ্রহণ করলেও মুসলিমদের জন্য তাদের সেখানে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

CamScanner

হলেও আপনি সেখানে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হন না!

কোনো একটি অনুষ্ঠানে আপনার নেতার নামে বদনাম করা হচ্ছে। কিন্তু আপনি আপনার নেতার কর্মী হওয়া সত্ত্বেও সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। তাহলে বোঝা গেল, আপনার নেতার প্রতি 'ঈমান' নেই।

ঠিক তেমনই কোথাও পূজা হচ্ছে, কোথাও যিশুখ্রিষ্টের কথা বলা হচ্ছে, কোথাও শিরকের অনুষ্ঠান হচ্ছে। আর আপনি সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে উপভোগ করলেন, কোনো কষ্ট পেলেন না। তাহলে আপনি প্রমাণ করলেন, আপনার ভেতর ঈমান নেই!

শিরক দেখে বেদনা অনুভব না করে, রবের জঘন্যতম অবমাননা দেখে হৃদয়ে অস্থিরতা বোধ না করে, আনন্দ বোধ করে আপনি নিজেকে কীভাবে মুমিন দাবি করতে পারেন!

কাজেই 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' হতে পারে না; বরং 'ধর্ম যার যার উৎসব তার তার'।

তবে বিধর্মীরা যেহেতু কিছু বিষয়কে পূজনীয় ভাবে, ভক্তি করে, যেমন : মন্দির, গির্জা, দেবতা ও ধর্মগ্রন্থ—এগুলোর মানহানির উদ্দেশ্যে মনঃকষ্টকর শব্দাবলি ব্যবহার করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে নিষেধ করে বলেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

'(হে মুসলিমগণ!) আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের পূজা করে, তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না। অন্যথায় তারাও অজ্ঞতাবশত সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহকে গালি দিতে শুরু করবে।'[৩৪১]

অর্থাৎ ওদের ধর্মের খণ্ডনে অথবা তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে তোমরা রাগান্বিত হয়ে ওদের উপাস্য ও অনুসরণীয় ব্যক্তিদের গালাগালি করলে ফল এই হবে যে, ওরা এর উত্তরে তোমাদের সত্য মাবুদ সম্পর্কে বেয়াদবি করবে এবং মূর্খতাবশত গালি দেবে। এমতাবস্থায় নিজেদের মান্যবর মাবুদের মানহানির কারণ তোমরা নিজেরা হবে। অতএব এ থেকে সর্বদা বিরত থাকা উচিত।

আল্লাহ তাআলার শানে নিজে যেমন বেয়াদবি করা হারাম, তেমনই বেয়াদবির 'কারণ' হওয়াও হারাম।

যুক্তিসংগত উপায়ে কোনো ধর্মের ভ্রান্তি প্রকাশ করা অথবা প্রামাণ্য পদ্ধতিতে তার দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক করা ভিন্ন জিনিস। কিন্তু মানহানির উদ্দেশ্যে কোনো জাতির

৩৪১. সূরা আনআম, (৬) : ১০৮

পুরোহিত ও উপাস্যদের সম্পর্কে মনঃকষ্টকর শব্দাবলি ব্যবহার করাকে পবিত্র কুরআন কখনোই জায়েয রাখেনি।[৩৪২]

এভাবে অমুসলিমদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করা এবং আপন আপন গণ্ডিতে শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব পালন করার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, সে নিজে তাতে বাধা দেবে না, কোনো রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা করবে না এবং অন্য কাউকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সুযোগ দেবে না। আর মুসলিমরা এসব অনুষ্ঠানে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না।

অমুসলিমদের খাবার বা হাদিয়া গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কে জরুরি মাসআলা

১. সাধারণ অবস্থায় বা বিশেষ কোনো কারণে, যেমন : প্রতিবেশী হওয়া, সন্তান জন্ম লাভ করা, পরীক্ষায় পাস করা, ভালো চাকরি পাওয়া, বিবাহ উপলক্ষে—এ-জাতীয় কারণে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে পাঠানো খাবার বা হাদিয়া গ্রহণ করা কিংবা তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা জায়েয।

তবে শর্ত হচ্ছে, নিজ ধর্মের কোনো ক্ষতি না হতে হবে এবং তা হারাম ও অপবিত্র বস্তু হতে পারবে না। যেমন : তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত ও মদ অথবা খাবারে কোনো নাপাকী বা মুসলমানদের জন্য হারাম এমন কোনো জিনিস মিশ্রিত থাকা।

২. প্রতিবেশী বা আত্মীয়তার কারণে কিংবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অথবা বৈধ কোনো প্রয়োজনে অমুসলিমদের হাদিয়া প্রদান বা দাওয়াত দেওয়া জায়েয।

৩. অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব উপলক্ষে যদি কোনো খাবার বা হাদিয়া আসে, আর তা যদি দেব-দেবী বা মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হয়—যেমন : প্রসাদ বা মিষ্টান্ন কিংবা ফলমূল, এমনকি পানিই হোক না কেন—তা হারাম। সেই খাবার খাওয়া বা হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। এভাবে কোনো মূর্খ মুসলিম যদি তা ওলী-আওলিয়াদের নামে করে, তাও হারাম।

বলাবাহুল্য, উৎসর্গকৃত বস্তু প্রাণী হতে হবে এমন না; বরং যেকোনো কিছু হলেই হবে। কাজেই প্রসাদ বা প্রাণীজাতীয় বস্তু হারাম আর মিষ্টান্ন বা ফলমূল হারাম নয়—এ ধরনের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না।

৪. কারও নামে উৎসর্গকৃত নয় এমন হালাল ও পবিত্র খাবার বা হাদিয়া যদি অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব উপলক্ষে আসে অথবা বিধর্মী কোনো মালিক তার কাছে চাকরিরত মুসলিমদের যদি এই উপলক্ষে কিছু দেয়, তা গ্রহণ করা নিরাপদ

৩৪২. দ্র. তাফসীরে উসমানী

CamScanner

নয়। হযরত আলী রাযি. ও উমর বিন আবদুল আযীয রাহ. তা গ্রহণ করতেন না। বর্তমানে এর ওপরই আমল করা উচিত।

তবে কারও কারও মতে তা গ্রহণ করার সুযোগ আছে। শর্ত হচ্ছে, নিজের ধর্মের ক্ষতি না হতে হবে এবং প্রায় প্রতি উৎসবে তা হতে পারবে না; বরং প্রয়োজনে বা ঠ্যাকায় পড়ে যদি দু-একবার গ্রহণ করতে হয়, তাহলে বৈধ। যেখানে ফিকহের কিতাবে মুশরিক-বিধর্মীদের সাথে প্রয়োজনে দু-একবার ছাড়া একসাথে খানা খেতে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে তাদের প্রায় প্রতি উৎসবে তাদের কাছ থেকে কিছু খাওয়া কীভাবে বৈধ হতে পারে? তা ছাড়া এটা তো ঈমানী গায়রতেরও প্রশ্ন!

কাজেই তাদের কাছ থেকে প্রায় প্রতি পূজায় নারকেলের নাড়ু আর খইভাজা বা অন্য কিছু খাওয়া জায়েয নয়।

৫. কারও নামে উৎসর্গকৃত নয় এমন হালাল ও পবিত্র খাবার বা হাদিয়া যদি অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব উপলক্ষে তারা এটা মনে করে দেয় যে, পরস্পরে আনন্দ ভাগাভাগি করা বা মুসলমানরাও আমাদের এই উৎসবে অংশীদার অথবা এটা তাদের ওপর আমাদের অনুগ্রহ, তখন উক্ত খাবার বা হাদিয়া গ্রহণ করা নাজায়েয।

৬. কোনো মুসলিমের জন্য অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব উপলক্ষে তাদেরকে সহযোগিতা করা হারাম। সুতরাং পূজার জন্য টাকা বা অন্য কিছু দেওয়া নাজায়েয।

৭. অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব উপলক্ষে তাদের মতো উক্ত অনুষ্ঠান ও উৎসবকে সম্মান মনে করে তাদেরকে কিছু দেওয়া কুফর।

ইমাম আবু হাফস কাবীর রাহ. বলেন,

لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ اللهَ خَمْسِينَ سَنَةً ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ، وَأَهْدَى لِبَعْضِ الْمُشْرِكِينَ بَيْضَةً يُرِيدُ بِهِ تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ كَفَرَ، وَحَبِطَ عَمَلُهُ.

'কেউ যদি ৫০ বছর ইবাদত করে, এরপর কোনো মুশরিককে তার ধর্মীয় উৎসবের দিনকে সম্মান করে একটা ডিম হাদিয়া দেয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে।'

তবে অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব ব্যতীত অন্য কারণে হলে কুফর হবে না।

'ফাতাওয়া তাতারখানিয়া' গ্রন্থে রয়েছে,

اجتمع المجوس يوم النيروز فقال مسلم – خوب رسم نهاده اند أو قال نيك آئين نهاده اند – خيف عليه الكفر.

'নাইরোয তথা অগ্নিপূজকদের ধর্মীয় উৎসবের দিন সমবেতকে দেখে যদি কোনো মুসলিম বলে, "এটি খুব ভালো অনুষ্ঠান" অথবা "এটি ভালো প্রভাব ফেলল", তাহলে তার ব্যাপারে কুফরীর আশঙ্কা রয়েছে।'

এতে আরও রয়েছে,

واتفق مشايخنا أن من رأى أمر الكفار حسنا فهو كافر.

'আমাদের উলামায়ে কেরামের সম্মিলিত বক্তব্য হলো, কেউ যদি (কুফরের প্রশংসার নিয়তে ও কুফরকে ভালো হিসেবে দেখানোর জন্য) কাফেরদের কোনো বিষয়কে ভালো বলে, তাহলে সে কাফের।'

৮. অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব উপলক্ষে যদি এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে কিছু দেয়, আর এতে অমুসলিমদের মতো উক্ত অনুষ্ঠান ও উৎসবের সম্মান মনে করে দেয়, তাহলে কুফর হবে।

তবে যদি ওই দিনকে সম্মান ছাড়া কোনো অভ্যাস বা সামাজিক কারণে তা দেয়, তাহলে কুফর না হলেও নাজায়েয, যা থেকে বেঁচে থাকে জরুরি।

ফকীহ মুহাম্মাদ সামারকান্দী রাহ. (মৃ. ৪৫০ হিজরীর পর) বলেন,

وَلَكِنْ مَا اعْتَادَهُ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَكْفُرُ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ خَاصَّةً، وَيَفْعَلُهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ كَيْ لَا يَكُونَ تَشَبُّهًا بِأُولَئِكَ الْقَوْمِ.

'হাদিয়া যদি ওই দিনের সম্মানের কারণে না হয়; বরং কিছু মানুষের অভ্যাসগত কারণে হয়, তাহলে কাফের হবে না। তবে মুসলমানদের ওই বিশেষ দিন এমন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। আগে বা পরে অন্য কোনো দিন দেবে, যাতে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতা সৃষ্টি না হয়।'[৩৪৩]

আল-ওয়ালা ওয়াল বারা : কারও সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদের বিধান

মুসলমানদের জন্য একটি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো, ঈমানের ভিত্তিতে কারও সাথে বন্ধুত্ব করা এবং সম্পর্কচ্ছেদ করা। অথচ অনেক মুসলিম ভাই তা জানেই না। কারও সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব হবে ঈমানের ভিত্তিতে, সম্পর্ক ছিন্ন হবে ঈমানের

---

৩৪৩. দেখুন, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, ২৪৮৫৬, ২৪৮৫৭, ৩৩৩৮৯; আত-তারিখুল কাবীর, ইমাম বুখারী, হাদীস নং ১৩১৯; আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী, হাদীস নং ১৮৮৬৫; আল-খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ৯৯; আস-সিয়ারুল কাবীর, ইমাম মুহাম্মাদ, ১/১৪৬; আল-মাবসূত, সারাখসী, ২৪/৫০; আল-মুহীতুল বুরহানী, ৫/৩৬২; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ৭/৩৪৭-৪৮; তাবয়ীনুল হাকায়েক, ৬/২২৮; ফাতাওয়া বায্যাযিয়্যা, ১২/১৮৬; আল-বাহরুর রায়েক, ৫/২০৮; ফাতাওয়া শামী, ১০/৪৮৫-৮৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ৫/৩৪৭; ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৮/৫৬৩, ৯/৪২৯-৩০; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১৮/১৭৫; আহসানুল ফাতাওয়া, ৮/১৬২; ফাতাওয়া কাসেমিয়া, ২৪/২৪৮ ও মাআরিফুল কুরআন, মুফতী শফী, ১/৪২৪।

CamScanner

ভিত্তিতে। অমুসলিমদের কাছে ভূখণ্ড, সংস্কৃতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, ভাষা ও রাজনৈতিক দল ইত্যাদি বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ধারিত হয়, আর এই জাতীয়তাই তাদের কাছে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদ এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মানদণ্ড হয়ে থাকে।

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এটা জাহিলিয়াত। কেননা, ইসলাম বলে, সকল মুমিন এক জাতি, তারা যে শ্রেণি-পেশারই হোক, যে বংশেরই হোক, যে দেশেরই হোক, যে ভাষারই হোক। ইসলামের শিক্ষায় বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদের মানদণ্ড ঈমান। আর পরস্পর সহযোগিতার মানদণ্ড ভালো কাজ ও খোদাভীরুতা।

মনে রাখতে হবে, মুমিন ও বিশ্বাসীদের বন্ধু আল্লাহ তাআলা। ইরশাদ হয়েছে,

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'আল্লাহ তাদের বন্ধু, যারা ঈমান আনে।'[৩৪৪]

তো যেই বিশ্বাসীর বন্ধু আল্লাহ তাআলা, সেই বিশ্বাসীর বন্ধু খোদ আল্লাহকে অবিশ্বাসকারী কীভাবে হতে পারে? কাজেই অবিশ্বাসী ও কাফেররা কখনো মুমিনের বন্ধু হতে পারে না।

সুতরাং মুমিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু মুমিন। যার ঈমান নেই, তার সাথে কোনো মুমিনের অন্তরঙ্গতা হতে পারে না, সে আন্তরিক বন্ধু হতে পারে না। কাফের ও অমুসলিমদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন মারাত্মক গুনাহ; বরং কুফরের প্রতি মুগ্ধ হয়ে কাফেরকে বন্ধু বানানো ঈমান ভঙ্গের কারণ ও নিঃসন্দেহে কুফর।

আবার সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে,

من قَتَلَ مُعَاهَدًا لم يَرَحْ رَائحةَ الجنة.

'কেউ যদি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।'[৩৪৫]

বলাবাহুল্য, কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদের অর্থ তার ওপর জুলুম করা নয়, বিপদগ্রস্ত হলে সহযোগিতার হাত না বাড়ানো নয় এবং তাকে মাজলুম অবস্থায় দেখে চুপ থাকা নয়; বরং সামর্থ্য থাকলে বিপদগ্রস্তকে সহযোগিতা করা এবং জুলুম থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসতে হবে।

কাজেই এ বিষয়ে বিধান জানা জরুরি।

---

৩৪৪. সূরা বাকারা (২) : ২৫৭
৩৪৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯১৪

অমুসলিম ও কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ও আচরণের চার অবস্থা :

১. মুওয়ালাত তথা বন্ধুত্ব।

২. মুদারাত তথা বাহ্যিক সদাচরণ ও সৌজন্যমূলক আচরণ।

৩. মুওয়াসাত তথা সহানুভূতি, অনুগ্রহ ও উপকার সাধন।

৪. মুআমালাত তথা লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য।

প্রথমটার ব্যাখ্যা : মুওয়ালাত তথা বন্ধুত্ব

কাফেরদের সাথে মুওয়ালাত-বন্ধুত্ব করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা একে অন্যের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যকার যে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।'[৩৪৬]

অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আমার দুশমন ও তোমাদের দুশমনকে এমন মিত্র বানিয়ো না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে...।'[৩৪৭]

ব্যাখ্যা : ولي (বহুবচনে أولياء)-এর অর্থ করা হয়েছে 'মিত্র'। এর দ্বারা এমন বন্ধুত্ব ও আন্তরিক ভালোবাসাকে বোঝানো হয়, যার ফলে দুজন লোকের জীবনের লক্ষ্য ও লাভ-লোকসান অভিন্ন হয়ে যায়। মুসলিমদের এ-জাতীয় সম্পর্ক কেবল মুসলিমদের সাথেই হতে পারে। অমুসলিমদের সাথে তা কখনো হতে পারে না।

এ আয়াতদ্বয়ে কঠোরভাবে তা নিষেধ করা হয়েছে। এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সূরা নিসার ১৩৯ ও ১৪৪, সূরা মায়েদার ৫৭ ও ৮১, সূরা তাওবার ২৩ ও সূরা মুজাদালার ২২ নং আয়াতসমূহে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, ইসলাম কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন এত কঠোরভাবে নিষেধ করে কেন? কোনো অবস্থাতেই এরূপ সম্পর্ক

---

৩৪৬. সূরা মায়েদা, (৫) : ৫১

৩৪৭. সূরা মুমতাহিনা, (৬০) : ১

জায়েয না রাখার রহস্য কী?

এর একটি বিশেষ কারণ হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন একটি উদ্দেশ্যমূলক জীবন। মানুষের খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ, এমনকি জন্ম-মৃত্যু সবই একটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত। এসব কাজকর্ম যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে, ততক্ষণই তা সঠিক ও বিশুদ্ধ। পক্ষান্তরে এই উদ্দেশ্যের বিপরীত হয়ে গেলেই তা অশুদ্ধ।

আল্লাহ তাআলার ইবাদতই যখন মানবজীবনের লক্ষ্য, তখন জগতের কাজ-কারবার, রাজ্য-শাসন, রাজনীতি ও পারিবারিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীন। অতএব যে মানব এ লক্ষ্যের বিরোধী, সে মানবতার প্রধান শত্রু। সহীহ হাদীসে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لله، وَأَعْطَى لله، وَمَنَعَ لِلَّهِ: فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

'যে ব্যক্তি (কাউকে) আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য দুশমনী করে, আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর জন্য দান থেকে বিরত থাকে, সে নিশ্চিত তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।'[৩৪৮]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুত্ব ও শত্রুতাকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করে দেয়, সে স্বীয় ঈমানকে পূর্ণতা দান করে।

এতে বোঝা গেল, স্বীয় ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতাকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করে দিলেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অতএব মুমিনের আন্তরিক বন্ধুত্ব এমন ব্যক্তির সাথেই হতে পারে, যে এই উদ্দেশ্য হাসিলে তার সঙ্গী এবং আল্লাহর অনুগত। এ কারণে কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ওরা কাফেরদেরই অন্তর্ভুক্ত।'[৩৪৯]

শায়খুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. (মৃ. ১৩৬৯ হি.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ওঠাবসার কারণে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত হয়ে ওদের ধর্ম অবলম্বন করে ফেলতে পারে। আর তা না হলেও অন্তত কুফরের নিদর্শন ও শিরকের রীতিনীতিতে যে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির মনোভাব থাকা অপরিহার্য, তাতে শৈথিল্য দেখা দিতে পারে। যদি এমনই ঘটে, তবে এহেন মুসলমানদের ক্ষেত্রেও فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে)-এর প্রয়োগ হতে পারে। যেমন : হাদীসে এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে বলা হয়েছে,

৩৪৮. আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৮১
৩৪৯. সূরা মায়েদা, (৫) : ৫১

CamScanner

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

"যে যাকে (দুনিয়াতে) ভালোবাসবে, সে (পরকালে) তারই সাথে থাকবে।"[৩৫০]

আয়াতটির শেষাংশে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ জালেমদের হেদায়েত দান করেন না।"

অর্থাৎ যারা ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে নিজেদের প্রতি ও মুসলমানদের প্রতি অন্যায় করে এবং মুসলমান জাতির পরাজিত ও পরাভূত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, এমন দুর্ভাগা, অবাধ্য ও ধোঁকাবাজ সম্প্রদায় সম্পর্কে এই আশা বৃথা যে, ওরা কখনো হেদায়েতের রাস্তায় আসবে।'[৩৫১]

কাজেই ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বে লিপ্ত হয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা যাবে না। আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। অন্তরের অবস্থা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

সুতরাং বাস্তবে কেউ কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব রেখে মুখে তা অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু সবার অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কে যেহেতু আল্লাহ তাআলা ওয়াকিফহাল, তাই অস্বীকৃতি ও অপকৌশল তাঁর সামনে অচল।

দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা : মুদারাত তথা বাহ্যিক সদাচরণ

কাফেরদের সাথে বাহ্যিক সদাচরণ ও সৌজন্যমূলক আচরণ নিম্নোক্ত তিন অবস্থায় বৈধ। যথা :

ক. তাদের অনিষ্টতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য।

খ. তাদের হেদায়েতের আশায়।

গ. তাদের মেহমানদারী করার উদ্দেশ্যে এবং প্রতিবেশী হলে।

তবে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে তথা সম্পদ কিংবা সম্মান কামনায় বৈধ নয়। বিশেষত এর মাধ্যমে যদি দ্বীনী ক্ষতির আশঙ্কা বোধ হয়, তবে কোনোক্রমেই জায়েয নয়।

ইরশাদ হয়েছে,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদেরকে (নিজেদের) মিত্র না বানায়। যে

৩৫০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৬৮
৩৫১. দ্র. তাফসীরে উসমানী

এরূপ করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে তাদের (জুলুম) থেকে বাঁচার জন্য যদি আত্মরক্ষামূলক কোনো পন্থা অবলম্বন করে, সেটা ভিন্ন কথা।'[৩৫২]

কাজেই তাদের থেকে কোনো রকমের অনিষ্টের আশঙ্কা হলে বাহ্যিক সদাচরণ ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার ও নমনীয়তা প্রদর্শন করা যাবে।[৩৫৩]

আর কাফেরের হেদায়েতের আশায় সদাচরণ ও নমনীয় ব্যবহার করার দলীল হলো, সূরা আবাসায় উল্লেখিত আল্লাহ তাআলার বাণী : فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى 'আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন।'[৩৫৪]

আর মেহমান অবস্থায় কাফেরকে সম্মান করার দলীল হলো নিম্নোক্ত হাদীস :

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সাকীফকে মসজিদে অবস্থান গ্রহণের সুযোগ প্রদান করেছিলেন, যাতে তাদের অন্তর নমনীয় হয়।'[৩৫৫]

আর নিজের উপকার বা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে তথা সম্মান কামনায় কিংবা সম্পদ লাভের আশায় তাদের সঙ্গে সদাচরণ ও সৌজন্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল হলো : আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

'তারা কি তাদের কাছে শক্তি খোঁজে? (অথচ) সমস্ত শক্তি তো আল্লাহর কাছে।'[৩৫৬]

তৃতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা : মুওয়াসাত তথা কল্যাণকামিতা ও উপকার সাধন

যে কাফের মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত (তথা আহলে হারব), তাদের প্রতি সহানুভূতি, কল্যাণকামিতা, অনুগ্রহ ও উপকার করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়।

তবে যে কাফের যুদ্ধরত নয়, তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার ও তার উপকার করা কেবল জায়েযই নয়, বরং এটাই কাম্য। যেমন : কুরআন মাজীদে সূরা মুমতাহিনায়

---

৩৫২. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ২৮

৩৫৩. এখানে মুওয়ালাত-বন্ধুত্ব দ্বারা মুদারাত তথা বাহ্যিক সদাচরণ উদ্দেশ্য। এ জন্য বন্ধুত্বের হুকুমে তাদের অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার হুকুমকে পৃথক করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার বাণী إلا أن تتقوا منهم تقاة দ্বারা। আর তাদের অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার সূরত ব্যতীত মুওয়ালাত-বন্ধুত্ব তার নিজ অর্থেই প্রয়োগ হবে। মোটকথা, কেবল তাদের থেকে কোনো রকমের অনিষ্টের আশঙ্কা হলে বন্ধুত্বকে বাহ্যিক সদাচরণ ও সৌজন্যবোধের অর্থে প্রয়োগ করা যাবে, অন্যথায় নয়।

৩৫৪. সূরা আবাসা, (৮০) : ৬

৩৫৫. আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০২৮

৩৫৬. সূরা নিসা, (৪) : ১৩৯

CamScanner

পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে,

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।'[৩৫৭]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতিও এটা ছিল যে, এরূপ লোকদের সাথে তিনি সর্বদা সদয় আচরণ করেছেন।

চতুর্থ প্রকারের ব্যাখ্যা : মুআমালাত তথা লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য

অমুসলিমদের সাথে লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরি বিষয়ে সম্পর্ক স্থাপন জায়েয এবং এমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতামূলক চুক্তি বা ব্যবসায়িক কারবারও করা যেতে পারে, যাকে অধুনা পরিভাষায় 'মৈত্রী চুক্তি' বলে।

তবে শর্ত হচ্ছে, এরূপ চুক্তি ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি ও স্বার্থবিরোধী হতে পারবে না এবং তাতে শরীয়তের পরিপন্থী কোনো কর্মপন্থা অবলম্বন করা যাবে না।

সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা সব অমুসলমানের সাথে জায়েয। তবে মুসলমানদের ক্ষতি হলে জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ফিকাহবিদগণ এ কারণেই যুদ্ধরত কাফেরদের হাতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধু স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের চাকরি প্রদান করা অথবা তাদের কলকারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা সবই জায়েয।

আয়েশা রাযি. বলেন,

اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ইহুদী হতে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনেছিলেন এবং তার কাছে নিজের বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।'[৩৫৮]

হযরত আনাস রাযি. বলেন,

---

৩৫৭. সূরা মুমতাহিনা, (৬০) : ৮
৩৫৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫১৩; মুসলিম হাদীস, নং ১৬০৩

CamScanner

كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ ﷺ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

'এক ইহুদী কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তখন সে মুসলমান হয়ে গেল।'[৩৫৯]

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা কোনো কাফেরের সাথে কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। তবে অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও উপকার সাধন যুদ্ধরত কাফের ছাড়া সবার বেলায় জায়েয। এমনইভাবে বাহ্যিক সদাচরণ ও সৌজন্যমূলক আচরণ সবার সাথেই জায়েয রয়েছে; তবে এর উদ্দেশ্য অতিথির আতিথেয়তা কিংবা অমুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হয়ে জগতে আগমন করে অমুসলিমদের সাথে যেরূপ অনুগ্রহ, উপকার সাধন ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন, তার নযির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যে শত্রুরা তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল, তিনি স্বয়ং তাদের সাহায্য করেন।

এরপর মক্কা বিজিত হলে সব শত্রু তাঁর করতলগত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি এ কথা বলে সবাইকে মুক্ত করে দেন যে,

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ.

'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।'

অর্থাৎ আজ তোমাদের শুধু ক্ষমাই করা হচ্ছে না; বরং অতীত উৎপীড়নের কারণে তোমাদের কোনোরূপ অভিযোগ ও ভর্ৎসনা করা হবে না।[৩৬০]

অমুসলিম যুদ্ধবন্দি হাতে আসার পর তিনি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতেন, যা অনেক পিতাও পুত্রের সাথে করেন না। কাফেররা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর হাত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কখনো উত্থিত হয়নি।

অমুসলিম বনু সাকীফের প্রতিনিধি দলকে তিনি মসজিদে নববীতে অবস্থান করতে দেন, যা ছিল মুসলমানের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থান। হযরত উমর রাযি.

৩৫৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৫৬, ৫৬৫৭

৩৬০. সূরা ইউসুফ, (১২) : ৯২; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১৭৪, মুআসসাসাতুর রিসালাহ; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী, ১/৩৬৯, দারুল গরবিল ইসলামী; আল-ইসাবাহ, ইবনে হাজার, ৩/২১৩, দারুল জীল, বৈরুত

মুসলমানদের মতো অমুসলিম দরিদ্র জিম্মিদেরও সরকারি ধনাগার থেকে ভাতা প্রদান করতেন। খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের কাজ-কর্মের মধ্যে এ-জাতীয় অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো ছিল অনুগ্রহ, সৌজন্য ও লেনদেনমূলক ব্যবহার, যা নিষিদ্ধ বন্ধুত্ব নয়।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, ইসলামে অমুসলিমদের জন্য কতটুকু উদারতা ও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা রয়েছে।[৩৬১]

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করা ও গুপ্তচরবৃত্তি করা ঈমান ভঙ্গের কারণ কি না

কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করা ও গুপ্তচরবৃত্তি করা নিঃসন্দেহে হারাম ও বড় ধরনের কবীরা গুনাহ। এতে কারও দ্বিমত নেই। আল্লাহ তাআলা এগুলো থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, যা ওপরে উল্লেখ হয়েছে।

এখন জানার বিষয় হলো, এগুলো ঈমান ভঙ্গের কারণ কি না?

উত্তর হচ্ছে, মুতলাকভাবে বা এককথায় এগুলোর কোনোটাই ঈমান ভঙ্গের কারণ নয়। চার মাযহাবের ইমামগণ সাধারণত এগুলোকে ঈমান ভঙ্গের কারণ বলেননি।

তবে শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী রাহ. (মৃ. ১২০৬ হি.) তাঁর বহুল আলোচিত 'নাওয়াকিদুল ইসলাম' নামক পুস্তিকায় ঈমান ভঙ্গের যে দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে ৮ নম্বরে 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করা'কে ঈমান ভঙ্গের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সম্ভবত এখান থেকেই বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং অনেকেই এটি ঈমান ভঙ্গের কারণ হিসেবে আলোচনা করেন বা লেখায় উল্লেখ করেন।

অথচ তাহকীক ও গবেষণার আলোকে বলা যায়, ইসলামের হাজার বছরের ইতিহাসে অধিকাংশ মুফাসসিরের বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর, মুহাদ্দিসগণের হাদীসের ব্যাখ্যা এবং ফকীহ ইমামগণের আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, মুতলাকভাবে বা এককথায় এগুলোর কোনোটাই ঈমান ভঙ্গের কারণ নয়; বরং শর্তসাপেক্ষে ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষে কুফর ও ঈমান ভঙ্গের কারণ হয়।

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব গড়া বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করা ও গুপ্তচরবৃত্তি করা যদি তাদের কুফরীর কারণে হয় বা কুফরের প্রতি সন্তুষ্টি হয়ে

---

৩৬১. দ্র. বয়ানুল কুরআন; আহকামুল কুরআন; মাআরিফুল কুরআন ও তাওযীহুল কুরআন, সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াতের তাফসীর; ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৯/৪২৯-৩০

CamScanner

কিংবা কুফরকে সঠিক মনে করার কারণে হয়, তাহলে এগুলো কুফর ও ঈমান ভঙ্গের কারণ হবে; অন্যথায় নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰةً

'মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো ভয়ের আশঙ্কা থাকে।'[৩৬২]

এ আয়াতের তাফসীরে প্রখ্যাত মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী রাহ. (মৃ. ৮৫০ হি.) বলেছেন,

وَمَعْنَى ذَلِكَ: لَا تَتَّخِذُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارَ ظَهْرًا وَأَنْصَارًا، تُوَالُونَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ، وَتُظَاهِرُونَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَدُلُّونَهُمْ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ؛ يَعْنِي بِذَلِكَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ، وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ بِارْتِدَادِهِ عَنْ دِينِهِ، وَدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ...

'আয়াতের অর্থ হলো, হে মুমিনগণ! তোমরা কাফেরদেরকে এমন সহায়তাকারী ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ কোরো না যে, **তাদের ধর্মের ওপর (সন্তুষ্ট হয়ে)** তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করছ এবং মুসলিমদের গোপনীয় বিষয়াবলি তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছ।

কেননা, যে ব্যক্তি এমনটা করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ, সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কহীন, আল্লাহও তার থেকে সম্পর্কহীন। কেননা, সে দ্বীন থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে কুফরে প্রবেশ করেছে।'[৩৬৩]

আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে মুমিন কাফেরের বন্ধু হওয়ার তিনটি ধরন উল্লেখ করে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহ. (মৃ. ৬০৬ হি.) বলেন,

مَعْنَى الْآيَةِ: فَلَيْسَ مِنْ وَلَايَةِ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ الْكُفْرَ فِي تَحْرِيمِ مُوَالَاةِ الْكَافِرِينَ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى أَنْزَلَ آيَاتٍ كَثِيرَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنْهَا...

وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ الْمُؤْمِنِ مُوَالِيًا لِلْكَافِرِ يَحْتَمِلُ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بِكُفْرِهِ وَيَتَوَلَّاهُ لِأَجْلِهِ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُصَوِّبًا لَهُ فِي ذَلِكَ الدِّينِ، وَتَصْوِيبُ الْكُفْرِ كُفْرٌ، وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَبْقَى مُؤْمِنًا مَعَ كَوْنِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ...

---

৩৬২. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ২৮

৩৬৩. জামিউল বায়ান বা তাফসীরে তাবারী, ৬/৩১৩

CamScanner

وثانيها: الْمُعَاشَرَةُ الْجَمِيلَةُ فِي الدُّنْيَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ كَالْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، هُوَ أَنَّ مُوَالَاةَ الْكُفَّارِ بِمَعْنَى الرُّكُونِ إِلَيْهِمْ وَالْمَعُونَةِ، وَالْمُظَاهَرَةِ، وَالنُّصْرَةِ: إِمَّا بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ، أَوْ بِسَبَبِ الْمَحَبَّةِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ دِينَهُ بَاطِلٌ، فَهَذَا لَا يُوجِبُ الْكُفْرَ؛ إِلَّا أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَدْ تَجُرُّهُ إِلَى اسْتِحْسَانِ طَرِيقَتِهِ وَالرِّضَا بِدِينِهِ، وَذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَلَا جَرَمَ هَدَّدَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ فَقَالَ: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ.

'আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহর সাথে তার কোনো বন্ধুত্ব নেই। আর এটা কুফরকে আবশ্যক করে না। যদিও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব হারাম।

আর জেনে রাখুন, মুমিন কাফেরের বন্ধু হওয়ার তিনটি ধরন হতে পারে :

১. তার কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া এবং কুফরের কারণেই তার সাথে বন্ধুত্ব গড়া। এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ, যারা এমন করবে, তারা প্রত্যেকেই ওই কুফরী ধর্মকে সঠিক বিবেচনাকারী। আর কুফরকে সঠিক বিবেচনা করা কুফর এবং কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াও কুফর। কাজেই এমতাবস্থায় সে মুমিন থাকা অসম্ভব (অর্থাৎ সে কাফের হয়ে যাবে)।

২. দুনিয়াতে বাহ্যিক সৌজন্যমূলক আচরণ করা। এটা নিষিদ্ধ নয়।

৩. তৃতীয় প্রকার হলো, প্রথম দুই প্রকারের মাঝামাঝি। তা হলো, কাফেরদের এ ধরনের বন্ধু হওয়া যে, তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়া ও সাহায্য-সহযোগিতা করা আত্মীয়তা বা সম্প্রীতির কারণে। তবে এই বিশ্বাস আছে যে, তার ধর্ম বাতিল। এটা কুফরকে আবশ্যক করে না, তবে তা নিষিদ্ধ। কারণ, এটাও তাকে কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেবে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ধমকি দিয়ে বলেছেন, যে এ কাজ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই।'[৩৬৪]

আয়াতটির তাফসীরে অনুরূপ কথা অষ্টম শতাব্দীর মুফাসসির ইবনে আদিল হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৭৭৫ হি.) এবং নবম শতাব্দীর মুফাসসির নেযামুদ্দীন নীসাবুরী রাহ. (মৃ. ৮৫০ হি.) বলেছেন।[৩৬৫]

উল্লিখিত তিন প্রকারের তৃতীয়টা যে কুফর নয়, তা ইবনে তাইমিয়াও বলেছেন। শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্কের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,

---

৩৬৪. মাফাতীহুল গায়ব বা আত-তাফসীরুল কাবীর, ৮/১১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

৩৬৫. আল-লুবাব ফী উলূমিল কিতাব, ইবনে আদেল, ৫/১৪৩; গারায়িবুল কুরআন, নীসাবুরী, ২/১৩১

CamScanner

وَقَدْ تَحْصُلُ لِلرَّجُلِ مُوَادَّتُهُمْ لِرَحِمٍ أَوْ حَاجَةٍ، فَتَكُونُ ذَنْبًا يَنْقُصُ بِهِ إِيمَانُهُ وَلَا يَكُونُ بِهِ كَافِرًا، كَمَا حَصَلَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بلتعة، لَمَّا كَاتَبَ الْمُشْرِكِينَ بِبَعْضِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ}. وَكَمَا حصل لِسَعْدِ بْنِ عبادة لَمَّا انْتَصَرَ لِابْنِ أُبَيٍّ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ.

'কখনো কাফেরদের সঙ্গে কারও ভালোবাসা থাকে আত্মীয়তার কারণে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে। এটা গুনাহ, এর দ্বারা ঈমানে ঘাটতি আসে; কিন্তু এর দ্বারা সে কাফের হয়ে যায় না। যেমনটা হাতিব বিন আবী বালতাআ রাযি. করেছেন। তিনি মুশরিকদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বিষয় জানিয়ে দিতে চিঠি লিখেছিলেন,[৩৬৬] যার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়, "হে মুমিনগণ, তোমরা আমার দুশমন ও তোমাদের দুশমনকে এমন মিত্র বানিয়ো না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে।"...'[৩৬৭]

সূরা মুমতাহিনার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.) বলেন,

ولو كان ذلك الذنب يكفره ويخرجه عن الإيمان: لم يكن ذلك الكافر عدوًّا له؛ بل يكون وليًّا له بقوله: (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)، ولأجل أنه قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا): سماه: مؤمنًا، والدليل على أن ذلك الذنب كان كبيرة...

'যদি ওই গুনাহ তাকে (হাতিব বিন আবী বালতাআ রাযি.) ঈমান থেকে খারেজ করে কাফের বানিয়ে দিত, তাহলে তিনি কাফেরদের দুশমন হতেন না; বরং মিত্র হতেন। তা ছাড়া "হে মুমিনগণ" শব্দের মধ্যে তাকে মুমিন বলা হয়েছে।'[৩৬৮]

---

৩৬৬. বুখারী (হাদীস নং ৩০০৭) ও মুসলিম (হাদীস নং ৭৮)-সহ বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী রাযি. বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং জুবায়ের ও মিকদাদকে প্রেরণ করে বললেন, "তোমরা রওনা হও। খাখ নামক স্থানে একজন উষ্ট্রারোহী নারীকে পাবে। তার কাছে একটি চিঠি আছে। সেটি তার কাছ থেকে নিয়ে নাও।" আমরা গিয়ে সেটি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তাতে একটি চিঠি ছিল হাতিব ইবনে আবী বালতাআ রাযি.-এর পক্ষ থেকে মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশে। সে চিঠিতে তিনি মক্কার মুশরিকদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বিষয় জানিয়ে দিয়েছিলেন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "হে হাতিব, এটা কী?"
তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে জলদি করবেন না। (আসল কারণ হচ্ছে,) কুরাইশ গোত্রে আমি একজন বহিরাগত ব্যক্তি। আপনার সঙ্গী মুহাজিরদের সেখানে অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে। তারা এদের পরিবার-পরিজনকে হেফাজত করে। আমার মনে হলো, বংশীয় দিক দিয়ে যেহেতু আমার এই সুযোগ নেই, কাজেই তাদের কোনো সহযোগিতা করে, তাদের মাঝে একটা অবস্থান করে নিই; তাতে তারা আমার পরিবার-পরিজনের হেফাজত করবে। এটা দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া বা কুফরের প্রতি সন্তুষ্টিবশত করিনি।"
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে তোমাদের কাছে সত্যই বলেছে।"'
৩৬৭. মাজমূউল ফাতাওয়া, ৭/৫২২-২৩; সূরা মুমতাহিনা, (৬০) : ১
ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর বক্তব্য আর তার অনুসারী হিসেবে পরিচিতদের বক্তব্যের মাঝে কত ব্যবধান! তারা কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই বলে, 'কাফেরদের সঙ্গে যার ভালোবাসা থাকবে, সে কাফের হয়ে যাবে।'
৩৬৮. তাফসীরে মাতুরীদী, ৯/৬০৮

CS CamScanner

এর তাফসীরে ইমাম ইবনুল আরাবী মালেকী রাহ. (মৃ. ৫৪৩ হি.) এবং প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী মালেকী রাহ. (মৃ. ৬৭১ হি.) বলেন,

مَنْ كَثُرَ تَطَلُّعُهُ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَيُنَبِّهُ عَلَيْهِمْ، وَيُعَرِّفُ عَدُوَّهُمْ بِأَخْبَارِهِمْ: لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ كَافِرًا إِذَا كَانَ فِعْلُهُ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ، وَاعْتِقَادُهُ عَلَى ذَلِكَ سَلِيمٌ، كَمَا فَعَلَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ حِينَ قَصَدَ بِذَلِكَ اتِّخَاذَ الْيَدِ وَلَمْ يَنْوِ الرِّدَّةَ عَنِ الدِّينِ.

'যে ব্যক্তি মুসলমানদের গোপন ও দুর্বল বিষয়সমূহের প্রতি বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং মুসলমানদের তথ্য ও সংবাদ তাদের দুশমনদের অবহিত করে, আর এটা যদি দুনিয়ার কোনো স্বার্থে করে এবং তার আকীদা (ইসলামের ওপর) অটুট থাকে, তাহলে এর কারণে সে কাফের হবে না। যেমনটা হাতিব বিন আবী বালতাআ রাযি. করেছেন...।'[৩৬৯]

হাতিব বিন আবী বালতাআ রাযি.-এর হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণের মতামত

ইমাম খাত্তাবী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৩৮৮ হি.) বলেন,

معالم السنن ٢٧٤/٢: وفيه دليل على أن الجاسوس إذا كان مسلما لم يقتل.

'গুপ্তচর যদি মুসলিম হয়, তাকে হত্যা করা হবে না।'

ইমাম ইবনুল জাওযী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.) লেখেন,

كشف المشكل من حديث الصحيحين ١٤٢/١: وَقد دلّ هَذَا الحَدِيث على أَنه الجاسوس الْمُسلم لَا يقتل.

'মুসলিম গুপ্তচরকে হত্যা করা যাবে না।'

ইবনে বাত্তাল মালেকী রাহ. (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেন,

شرح البخارى ١٦٣/٥، ١٦٤: وفيه أن الجاسوس قد يكون مؤمنًا، وليس تجسسه مما يخرجه من الإيمان... ومن قال بقتل الجاسوس المسلم: فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين من العلماء، فلا وجه لقوله.

'গুপ্তচর কখনো মুমিন হয়ে থাকে। আর গুপ্তচরবৃত্তি করা ঈমান থেকে খারেজ করে না। আর যে মুসলিম গুপ্তচরকে হত্যা করার কথা বলে, সে হাদীস ও পূর্ববর্তী আলেমগণের বিরোধিতা করে। কাজেই তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়।'

আল্লামা আইনী হানাফী রাহ. (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেন,

عمدة القاري ٢٥٧/١٤: وَفِيه أَن الجاسوس لَا يُخرجهُ تجسسه من الْإِيمَان.

---

৩৬৯. আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরবী, ৪/২২৫; তাফসীরে কুরতুবী, ১৮/৫২

CamScanner

'গুপ্তচরবৃত্তি করা ঈমান থেকে খারেজ করে না।'

ইমাম কুরতুবী মালেকী রাহ. (মৃ. ৬৫৬ হি.) বলেন,

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٤٣٣/٦: وفي حديث حاطب هذا أبواب من الفقه، فمن جملة ما فيه من الفقه: أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفرًا.

'কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া কুফর নয়।'

ইমাম নববী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেন,

شرح مسلم ٥٥/١٦: وَفِيهِ أَنَّ الْجَاسُوسَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِ الذُّنُوبِ الْكَبَائِرِ لَا يَكْفُرُونَ بِذَلِكَ.

٦٧/١٢: وَأَمَّا الْجَاسُوسُ الْمُسْلِمُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: يُعَزِّرُهُ الْإِمَامُ بِمَا يَرَى مِنْ ضَرْبٍ وَحَبْسٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ.

'গুপ্তচর ও অন্য কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা কাফের নয়।... ইমাম শাফেয়ী, আওযায়ী, আবু হানীফা রাহ. ও কিছু মালেকী এবং অধিকাংশ আলেম বলেছেন, মুসলিম গুপ্তচরকে রাষ্ট্রপ্রধান তা'যীর করবেন, তাকে হত্যা করা বৈধ নয়।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,

فتح الباري ٣١٠/١٢: وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ كَفَّرَ الْمُسْلِمَ بِارْتِكَابِ الذَّنْبِ... وَقَدْ نَقَلَ الطَّحَاوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْجَاسُوسَ الْمُسْلِمَ لَا يُبَاحُ دَمُهُ.

'এ হাদীস দ্বারা ওই ব্যক্তির ওপর খণ্ডন হয়, যে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে মুসলিমকে তাকফীর করে (কাফের বলে)।... ইমাম তাহাবী রাহ. মুসলিম গুপ্তচরকে হত্যা করা বৈধ না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন।'

ইবনে হাজার হাইতামী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৯৭৪ হি.) কবীরা গুনাহ কয়টা ও কী কী-এর ওপর একটি কিতাব লিখেছেন। এতে তিনি বলেন,

الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢٩٦/٢: الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ: الدَّلَالَةُ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، دَلِيلُهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: أَنَّ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ...

'৪৫ নং কবীরা গুনাহ হলো, মুসলমানদের গুপ্ত ও দুর্বল বিষয় জানিয়ে দেওয়া।'

প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমামগণের বক্তব্য

ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. (মৃ. ১৮২ হি.) বলেন,

وَسَأَلْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْجَوَاسِيسِ يُوجَدُونَ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

وَالْمَجُوسِ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَعْرُوفِينَ فَأَوْجِعْهُمْ عُقُوبَةً، وَأَطِلْ حَبْسَهُمْ حَتَّى يُحْدِثُوا تَوْبَةً.

সারাংশ : 'মুসলমানদের মধ্য থেকে গুপ্তচর ধরা পড়লে তাকে কঠিন শাস্তি দেবে এবং তাওবা করা পর্যন্ত বন্দি করে রাখবে।'[৩৭০]

ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. (মৃ. ১৮৯ হি.) বলেন,

وَإِذَا وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ عَيْنًا لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَكْتُبُ إِلَيْهِمْ بِعَوْرَاتِهِمْ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ طَوْعًا: فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ، وَلَكِنَّ الْإِمَامَ يُوجِعُهُ عُقُوبَةً.

'মুশরিকদের গুপ্তচর হিসেবে মুসলমান দাবিদার কেউ ধরা পড়লে, যে মুসলমানদের ত্রুটি ও দুর্বলতার তথ্য তাদের অবহিত করে, আর এটা যদি সে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না, তবে রাষ্ট্রপ্রধান তাকে কঠিন শাস্তি দেবে।'

শামসুল আইম্মাহ সারাখসী রাহ. (মৃ. ৪৮৩ হি.)-এর ভাষ্যগ্রন্থে লেখেন,

وَقَدْ أَشَارَ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي كَلَامِهِ إِلَى أَنَّ مِثْلَهُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا حَقِيقَةً... إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ مَا بِهِ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ، فَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي الظَّاهِرِ مَا لَمْ يَتْرُكْ مَا بِهِ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى مَا صَنَعَ الطَّمَعُ، لَا خُبْثُ الِاعْتِقَادِ، وَهَذَا أَحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ.

وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ فَإِنَّهُ كَتَبَ إِلَى قُرَيْشٍ... فَلَوْ كَانَ بِهَذَا كَافِرًا مُسْتَوْجِبًا لِلْقَتْلِ مَا تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَدْرِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ بَدْرِيٍّ. وَكَذَلِكَ لَوْ لَزِمَهُ الْقَتْلُ بِهَذَا حَدًّا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِقَامَتَهُ عَلَيْهِ. وَفِيهِ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممتحنة: ١]. فَقَدْ سَمَّاهُ مُؤْمِنًا، وَعَلَيْهِ دَلَّ قِصَّةُ أَبِي لُبَابَةَ حِينَ اسْتَشَارَهُ بَنُو قُرَيْظَةَ فَأَمَرَّ أُصْبُعَهُ عَلَى حَلْقِهِ يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ لَوْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتَلَهُمْ. وَفِيهِ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ} [الأنفال: ٢٧].

সারাংশ : 'ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. এমন ব্যক্তিকে (মুশরিকদের গুপ্তচর হিসেবে ধৃত ব্যক্তিকে) প্রকৃত মুসলিম নয় বলেছেন। তবে তাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়নি; বরং এটা সে কোনো কিছুর লোভে করেছে। অতঃপর এর স্বপক্ষে হাতিব বিন আবী বালতাআ রাযি.-এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, যদি তিনি এটার কারণে কাফের ও হত্যাযোগ্য হতেন, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছেড়ে দিতেন না।'

সারাখসী রাহ. অন্যত্র বলেন,

---

৩৭০. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা ২০৭

وَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا كَانَ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ يُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَلَبُهُ. لِأَنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُبَاحَ الْقَتْلِ وَلَكِنَّ سَلَبَهُ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ، لِأَنَّهُ مَالُ الْمُسْلِمِ، وَمَالُ الْمُسْلِمِ لا يَكُونُ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ بِحَالٍ كَأَمْوَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ.

'মুশরিকদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এমন কোনো মুসলিমকে যদি (মুসলিম সৈন্যবাহিনীর) কেউ হত্যা করে, তাহলে তার সাথে থাকা জিনিসপত্রের মালিক সেই হত্যাকারী হবে না। কারণ, এই ব্যক্তিকে হত্যা করা যদিও বৈধ, কিন্তু তার মাল গনীমত নয়। কেননা, এটা মুসলিমের মাল। আর মুসলমানের মাল মুসলমানদের জন্য গনীমত সাব্যস্ত হয় না। যেভাবে মুসলিম বিদ্রোহীদের মাল গনীমত সাব্যস্ত হয় না।'[৩৭১]

এখানে মুশরিকদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত ব্যক্তিকে মুসলিম বলা হয়েছে এবং মুসলিম হওয়ার কারণে তার মাল গনীমতের মধ্যে গণ্য হবে না বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ২০৪ হি.) এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন,

قيل للشافعي رحمه الله: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم، هل يحل ذلك دمه، ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل، أو يزني بعد إحصان، أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر، وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر – بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين– بكفر بين.
فقلت للشافعي: أقلت هذا خبرا أم قياسا؟

قال: قلته بما لا يسع مسلما علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب.

فقيل للشافعي: فاذكر السنة فيه... فاستدلَّ عليه بحديث حاطب بن أبي بلتعة.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال، من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أعلم أحدا أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده. فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه على ما عاب عليه من ذلك

৩৭১. শারহুস সিয়ারিল কাবীর, ৫/২২৯, ২/২০৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

CS CamScanner

غير مستعمل عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه.

সারাংশ : 'ইমাম শাফেয়ীকে মুশরিকদের পক্ষের মুসলিম গুপ্তচরকে হত্যা করা বৈধ কি না জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, কোনো মুসলিমকে তিন কারণে হত্যা করা বৈধ : ১. খুনি হলে, ২. বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে, ৩. সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার পর এর ওপর অনড় থাকলে। আর কোনো মুসলিমের গোপন তথ্য জানিয়ে দেওয়া বা কোনো কাফেরকে সাহায্য করা স্পষ্ট কুফর নয়।[৩৭২]

প্রশ্ন : তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ কী?

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।'[৩৭৩]

উত্তর :

উল্লিখিত মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুজতাহিদ ইমামগণের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আর আয়াতটির দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

مَنْ دَخَلَ فِي دِينِ قَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ.

'যে ব্যক্তি যেই জাতির ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।'[৩৭৪]

আর কোনো জাতি বা কাফেরের ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করার একটি পদ্ধতি হচ্ছে, তাদের ধর্মীয় বিষয়ে বা কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা। যা কিছু পূর্বে 'মুমিন কাফেরের বন্ধু হওয়ার তিনটি ধরন হতে পারে' আলোচনার বিবরণে প্রথমটাতে উল্লেখ হয়েছে। কাজেই যে কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

---

৩৭২. আল-উম্ম, ৫/৬০৯-১০, তাহকীক : ড. রিফআত ফাওযী, দারুল ওফা, দারুল ফিকরের ৪/২৬৪; আরও দেখুন, আল-আওসাত ফী সুনান ওয়াল ইজমা' ওয়াল ইখতিলাফ, ইবনুল মুনযির, ১১/২৮২-৮৩

৩৭৩. সূরা মায়েদা (৫) : ৫১

৩৭৪. তাফসীরে তাবারী, ১০/৪০১; এই ব্যাখ্যার সনদ নির্ভরযোগ্য। তবে কেউ কেউ মনে করেছেন, ইবনে আব্বাস ও তাঁর থেকে বর্ণনাকারী আলী বিন আবী তালহার মাঝে ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে সনদটি যয়ীফ ও অগ্রহণযোগ্য। অথচ এই সনদটাকে ইমাম বুখারী, ইবনে আবী হাতেম, ইমাম যাহাবী ও হাফেজ ইবনে হাজার রাহ.-সহ অনেকে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। সবিস্তারে জানতে দেখুন,
التفسير والمفسرون للدكتور حسين الذهبي ٥٩/١، ١١٣، الأحاديث والآثار الواردة في أحكام القرآن للكيا الهراسي تخريجا ودراسة للباحث صالح بن فريح البهلال ١٣/٤، ٢٩ (المكتبة الشاملة) تحت الأثر رقم (١٠٢) (١١١).

এ কারণেই ইমাম তাবারী রাহ. (মৃ. ৩১০ হি.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

فَإِنَّ مَنْ تَوَلَّاهُمْ وَنَصَرَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ: فَهُوَ مِنْ أَهْلِ دِينِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يَتَوَلَّى مُتَوَلٍّ أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ بِهِ وَبِدِينِهِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ رَاضٍ، وَإِذَا رَضِيَهُ وَرَضِيَ دِينَهُ: فَقَدْ عَادَى مَا خَالَفَهُ وَسَخِطَهُ، وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ.

'যে ব্যক্তি কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে, সে তাদের ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে গণ্য হবে। আর কেউ কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না; তবে তার প্রতি, তার ধর্মের (কুফরের) প্রতি ও তার মতাদর্শের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ করে। যেহেতু সে তার প্রতি ও তার ধর্মের ওপর সন্তুষ্ট, কাজেই সে ওই ধর্মের (ইসলামের) সাথে শত্রুতা করল, যার বিরোধী সে হলো এবং যার ওপর অসন্তুষ্ট হলো। এবং তার বিধান ও ওই ব্যক্তির (যার ধর্মের ওপর সন্তুষ্ট) বিধান একই হবে।'[৩৭৫]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারীকে তাদের ধর্মের মধ্যে গণ্য করার ক্ষেত্রে কাফেরের প্রতি ও তার ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইমাম ইবনুল জাওযী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.) আয়াতটির ব্যাখ্যায় লেখেন,

فيه قولان: أحدهما: من يتولهم في الدين، فإنه منهم في الكفر. والثاني: من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر.

'এতে দুই ব্যাখ্যা : ১. ধর্মের মাধ্যমে (বা কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে) তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা। এতে সে কুফরের দিক থেকে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. চুক্তির মাধ্যমে তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়া। এতে সে (আল্লাহর) আদেশের নাফরমানীর ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৩৭৬]

বলাবাহুল্য, এখানে আয়াতটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা উল্লেখ হয়েছে। তথা চুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর আদেশের নাফরমানীর ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ এটা ধর্মের মাধ্যমে বা কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা নয়; বরং ধর্ম ও ঈমান-আকীদা ঠিক রেখে কেবল সাহায্য-সহযোগিতার চুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর আদেশের নাফরমানী ও ঘৃণা-ভর্ৎসনার ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে প্রসিদ্ধ মুফাসসির ইমাম ইবনে আতিয়্যা মালেকী রাহ. (মৃ.

---

৩৭৫. তাফসীরে তাবারী, ১০/৪০০

৩৭৬. যাদুল মাসীর, ইবনুল জাওযী, ১/৫৫৮

৫৪২ হি.) আয়াতটির তাফসীরে বলেন,

ومن تولاهم بمعتقده ودينه: فهو منهم في الكفر واستحقاق النقمة والخلود في النار، ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإيمان: فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه.

'যে ব্যক্তি কাফেরদের সাথে ধর্ম ও আকীদাগতভাবে হৃদ্যতা পোষণ করবে, সে কুফরের মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শাস্তি ও চিরস্থায়ী জাহান্নামের উপযুক্ত হবে। আর যে ঈমান-আকীদা ঠিক রেখে কেবল সাহায্য-সহযোগিতা বা এ-জাতীয় অন্য কোনো কাজের মাধ্যমে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে (কাফের হবে না, তবে) ঘৃণা-ভর্ৎসনার ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৩৭৭]

ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৪৫০ হি.) ও আল্লামা আবু হাইয়ান আন্দালুসী রাহ.-ও (মৃ. ৭৪৫ হি.) এমন তাফসীর করেছেন।[৩৭৮]

'তাফসীরে উসমানীতে' আয়াতটির ব্যাখ্যায় এসেছে, 'মুওয়ালাত তথা বন্ধুত্বপূর্ণ ও

---

৩৭৭. আল-মুহাররারুল ওয়াজীয, ২/২০৪
গত শতাব্দীর বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা তাহের বিন আশূর (মৃ. ১৩৯৪ হি.) তার তাফসীরগ্রন্থ 'আত তাহরীর ওয়াত তানবীর' (৬/২৩০)-এ বলেন, আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুফরের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ এবং তার ওপর কাফেরদের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব ছাড়া মুওয়ালাতের (বন্ধুরূপে গ্রহণ করার) অন্য কোনো স্তর ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না। তবে সেটাও অনেক বড় গোমরাহী এবং মুসলিমদের অবস্থার ভিন্নতা ও বন্ধুত্বের পরিমাণ হিসেবে এই গোমরাহীর অনেক স্তর রয়েছে।
এগুলোর সর্বোচ্চ স্তরের একটি উদাহরণ হলো, গ্রানাডার অধীবাসী কতক মুসলমানের ঘটনাটি। ঘটনাটি হলো, আন্দালুসিয়ার একদল সৈন্য (খ্রিষ্টান রাষ্ট্র) কাশতালার প্রধানের আশ্রয় নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তার আশ্রয়ে খ্রিষ্টান ভূখণ্ডে বসবাস করে।
এ ব্যাপারে গ্রানাডার তৎকালীন ফকীহদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে মুহাম্মাদ আল-মাউওয়াক, মুহাম্মাদ ইবনুল আরযাক, আলী ইবনে দাউদ, মুহাম্মাদ আল-জাদালাহ, মুহাম্মাদ আল-ফাখখার, আলী আল-কালসাভী, আবু হামেদ ইবনুল হাসান, মুহাম্মাদ ইবনে সারহুনাহ, মুহাম্মাদ আল-মিশযালী, আবদুল্লাহ আয-যালীজী, মুহাম্মাদ আল-হাযযাম, আহমাদ ইবনে আব্দুল জালীল, মুহাম্মাদ ইবনে ফাতহ, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল বার এবং আহমাদ অন্যতম।
তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোনো মুসলিমের জন্য ওই সৈন্যদলকে সহযোগিতা করা এবং কোনো শহর বা দুর্গের অধীবাসীদের জন্য তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া জায়েয হবে কি না?
উত্তরে তারা বলেন, কাফেরদের নিকট তাদের আশ্রয়গ্রহণ এবং কাফেরদের সহযোগিতা প্রার্থনার মাধ্যমে তারা وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ আয়াতের ধমকির মধ্যে দাখেল হয়ে গেছে।
অতএব যে তাদের সহযোগিতা করবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানীতে সহযোগী সাব্যস্ত হবে। যতদিন তারা তাদের কর্মে অনড় থাকবে, ততদিন এই হুকুম বলবৎ থাকবে। কিন্তু যদি তারা তাদের বিরোধ-বিচ্ছিন্নতা ত্যাগ করে তাওবা করে, তাহলে মুসলমানদের কর্তব্য হলো তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করা। (জামিউল মি'য়ার)
উত্তরে এ আয়াতের মাধ্যমে তাদের প্রমাণ পেশ করার দ্বারা বোঝা যায়, তারা আয়াতের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন যে, ঘৃণা-ভর্ৎসনার উপযুক্ত হওয়ার দিক থেকে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।
যেই কাজটা ওই সৈন্যবাহিনী করেছিল এবং যে সম্পর্কে ফকীহগণ ফতোয়া দিয়েছিলেন, কুফরী মুওয়ালাতের পর অন্যান্য মুওয়ালাতের মধ্যে এটাই হলো সর্বোচ্চ স্তর।
৩৭৮. তাফসীরে মাওয়ারদী, ২/৪৬; তাফসীরুল বাহরিল মুহীত, ৪/২৯১

CamScanner

পরস্পর ভ্রাতৃত্বসুলভ সাহায্য-সহযোগিতার সম্পর্ক তো কোনো মুসলমানই কোনো অমুসলিমের সাথে করার অধিকার রাখে না, এটা সম্পূর্ণ নিষেধ। তবে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে এমন সাধারণ সম্পর্ক রাখার অবকাশ আছে।

কোনো ব্যক্তি যদি ইহুদী ও নাসারা বা যেকোনো কাফের সম্প্রদায়ের সাথে এই কারণে বন্ধুত্ব করে বা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে যে, ওরা ইসলামের শত্রু, তবে সে ব্যক্তির কুফরের মধ্যে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না।'

সারকথা, কাফেরদের ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে বা কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা, সহযোগিতা করা বা গুপ্তচরবৃত্তি করা নিঃসন্দেহে কুফর। এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা, সহযোগিতা করা বা গুপ্তচরবৃত্তি করা হারাম ও মারাত্মক কবীরা গুনাহ।

তাতারিদের সাথে যোগদানকারীদের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া

তাতারিদের সাথে যারা স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে অন্যান্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের শ্রেণিকরণ করে শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন,

وَأَيْضًا لَا يُقَاتِلُ مَعَهُمْ غَيْرُ مُكْرَهٍ إِلَّا فَاسِقٌ، أَوْ مُبْتَدِعٌ، أَوْ زِنْدِيقٌ... فَإِنَّهُ لَا يَنْضَمُّ إِلَيْهِمْ طَوْعًا مِنَ الْمُظْهِرِينَ لِلْإِسْلَامِ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ زِنْدِيقٌ أَوْ فَاسِقٌ فَاجِرٌ، وَمَنْ أَخْرَجُوهُ مَعَهُمْ مُكْرَهًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ عَلَى نِيَّتِهِ.

'তাতারিদের সাথে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের কতক ফাসেক, কতক বিদআতী বা মুনাফিক, আর কতক যিন্দীক।'[৩৭৯]

বলাবাহুল্য, যদি ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর নিকট কাফেরদের সাথে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কোনো ব্যাখ্যা ও শর্ত ছাড়াই কুফর হতো, তাহলে তিনি এদের কতককে ফাসেক, আর কতককে বিদআতী বলতেন না; বরং সবাইকে কাফের বলতেন।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَكُلُّ مَنْ قَفَزَ إِلَيْهِمْ مِنْ أُمَرَاءِ الْعَسْكَرِ وَغَيْرِ الْأُمَرَاءِ فَحُكْمُهُ حُكْمُهُمْ، وَفِيهِمْ مِنَ الرِّدَّةِ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ بِقَدْرِ مَا ارْتَدَّ عَنْهُ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.

'সামরিক নেতৃত্ব এবং অন্যদের মধ্য থেকে প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যে তাদের (তাতারদের) সাথে যোগ দিয়েছে, তার হুকুম তাদের (তাতারদের) মতোই এবং তাদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত থেকে রিদ্দাহ বা বিধান ত্যাগের হুকুম দেওয়া হবে,

---

৩৭৯. মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫৫২, ৫৩৫

যতটুকু তারা ইসলামী শরীয়ত থেকে রিদ্দাহয় পতিত হয়েছে।'[৩৮০]

এখানে তিনি বলেছেন, 'তাদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত থেকে রিদ্দাহর হুকুম দেওয়া হবে, যতটুকু তারা ইসলামী শরীয়ত থেকে রিদ্দাহয় পতিত হয়েছে।'

ইলমের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের কাছে স্পষ্ট যে, 'রিদ্দাহ আনিল ইসলাম' আর 'রিদ্দাহ আন শারাঈয়িল ইসলাম' এক নয়। দুটির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি হলো আসল ও আকীদাগত রিদ্দাহ, যা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়। আর দ্বিতীয়টি হলো হুকমী ও আমলী রিদ্দাহ, যা ইসলামের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়, কিন্তু ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না। এখানে তিনি মূলত এই আমলী রিদ্দাহর কথাই বলেছেন, যা কোনো ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

স্মর্তব্য, কোনো বিজ্ঞ আলেম বিশেষ প্রেক্ষাপটে কোনো নির্দিষ্ট যুদ্ধকে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত ঈমান-কুফরের লড়াই মনে করে ক্ষেত্রবিশেষে বা ওই নির্দিষ্ট যুদ্ধে কাফেরদের সহায়তাকারীকে তাকফীর করতে পারেন। যেমন : শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী, শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম, মাওলানা নেযামুদ্দিন শামযায়ী রাহ.-সহ কেউ কেউ এমন করেছেন। তবে তা আমভাবে সর্বত্র গ্রহণ করা যাবে না এবং একটাকে আরেকটার ওপর কিয়াস করা যাবে না।

ঈমান ভঙ্গের চৌদ্দতম কারণ

ইবাদতের ক্ষেত্রে বা আকীদার ক্ষেত্রে বিধর্মীদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণ করা। কথা বা কাজে তাদের ধর্মীয় প্রতীক ও সংস্কৃতির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করা।

কাফেরদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণের প্রকার ও বিধান

১. ইবাদতের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য গ্রহণ করা কুফর। অর্থাৎ যে উপাসনা বা ইবাদতগুলো কাফেররা করে থাকে, এতে সাদৃশ্য গ্রহণ করলে কাফের হয়ে যাবে। যেমন : মূর্তিকে সিজদা করা ইত্যাদি।

২. অনুরূপ আকীদার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য গ্রহণ করা কুফর। অর্থাৎ যে সকল প্রতীক, সংস্কৃতি বা বিশেষ চিহ্ন কাফের, মুশরিক, হিন্দু, ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্য কোনো অমুসলিমের আকীদার প্রমাণ বহন করে, এ ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণ করা কুফর। এমন সাদৃশ্য গ্রহণ করলে কাফের সাব্যস্ত হবে। যেমন : খ্রিষ্টানদের ন্যায় গলায় ও বুকে ক্রুশ ঝোলানো বা ঘর-অফিসে ক্রুশ রাখা[৩৮১] এবং হিন্দুদের মতো

৩৮০. মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫৩০
৩৮১. খ্রিষ্টানরা গলার মধ্যে ক্রুশের চিহ্ন লাগায় ও ক্রুশকে ডিজাইন করে রাখে একটা কুফরী বিশ্বাসের কারণে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সত্য নবী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে স্বশরীরে জীবন্ত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে

পৈতা লাগানো। কেননা, কাফেরদের ইবাদত বা কুফরী প্রতীক, সংস্কৃতি বা ধর্মীয় বিশেষ চিহ্ন গ্রহণ করা আন্তরিক সমর্থনের নিদর্শন।

৩. কাফেরদের ধর্মীয় প্রথার অনুকরণ হারাম। অর্থাৎ কিছু বিষয় আছে ধর্মীয় প্রথা, সরাসরি তাদের ইবাদত বা আকীদার প্রতীক না। এগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য গ্রহণ করাও হারাম। যেমন : হিন্দু মেয়েদের মতো মাথায় সিঁদুর দেওয়া, কপালে টিপ দেওয়া বা হাতে শাঁখা পরা। এগুলো তাদের ধর্মীয় প্রথা। তাই এ ধরনের অনুকরণ হারাম। কোনো মুসলিম নারী এটা গ্রহণ করতে পারে না। এভাবে বৌদ্ধরা গেরুয়া বসন পরে, এটা তাদের ধর্মীয় সাজ। সান্তাক্লজ খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় সাজ। কোনো মুসলমান এ সাজ নিতে পারে না। এটা হারাম। ধর্মীয় প্রথার ক্ষেত্রে অমুসলমানের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম।

৪. জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাস এবং সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুকরণ মাকরূহে তাহরীমী। অর্থাৎ কিছু বিষয় আছে, যা মূলত ধর্মীয় না; বরং তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, জাতিগত প্রথা। জাতি হিসেবে করে, ধর্মীয় হিসেবে না। ওই সমস্ত বিষয়ে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা মাকরূহে তাহরীমী তথা হারামের কাছাকাছি।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নিজস্ব পোশাক, যা তারা ব্যবহার করে থাকে। আর এসবের ব্যবহারকারীকে সেই সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে মনে করা হয়। যেমন : হিন্দুরা ধুতি পরে। এটা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। জাতি হিসেবে তারা এটা পরে। কোনো মুসলমান এই ধুতি পরতে পারে না। এসব নাজায়েয ও নিষিদ্ধ। এগুলো ব্যবহার করাকে বিজাতীয় অনুকরণ হিসেবে শামিল করা হয়।

কাযী ইয়ায রাহ. (মৃ. ৫৪৪ হি.) লেখেন,

نُكَفِّرُ بِكُلِّ فِعْلٍ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ كَافِرٍ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُصَرِّحًا بِالْإِسْلَامِ مَعَ فِعْلِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ كَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ، وَلِلشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالصَّلِيبِ، وَالنَّارِ، وَالسَّعْيِ إِلَى الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ مَعَ أَهْلِهَا، وَالتَّزَيِّي بِزِيِّهِمْ من شد الزنانير. فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ هَذَا لا يُوجَدُ إِلَّا مِنْ كَافِرٍ وَأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ عَلَامَةٌ عَلَى الْكُفْرِ، وَإِنْ صَرَّحَ فَاعِلُهَا بِالْإِسْلَامِ.

'আমরা ওই সকল কাজের কারণে কাফের সাব্যস্ত করি, যা মুসলমানদের ঐকমত্যে

নিয়েছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। এটা কুরআন-সুন্নাহর কথা। এই আকীদা না রাখলে সে মুসলমান না।

এর বিপরীত খ্রিষ্টানরা আকীদা বানিয়ে নিয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি আত্মাহুতি দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত খ্রিষ্টান-জগতের যত পাপ, সব পাপ মোচন করে ফেলেছেন। এখন খ্রিষ্টানরা যত পাপ করবে কোনো পাপ হবে না। কারণ, সব পাপের কাফফারা হয়ে গেছে! এটা তাদের আকীদায়ে কাফফারা। যার কারণে ক্রুশের চিহ্ন তারা গলার মধ্যে লাগায়। এটা কুফরী আকীদার চিহ্ন ও প্রতীক। কোনো মুসলমান যদি এই ক্রুশ পরে, ক্রুশ ঝোলায়, ক্রুশকে শ্রদ্ধা করে, এটা আকীদার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যগ্রহণ, যা সরাসরি কুফর।

CS CamScanner

কাফের ব্যতীত অন্য কারও থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। যদিও সে ব্যক্তি উক্ত কাজ করার সাথে সাথে নিজেকে সুস্পষ্টভাবে মুসলিম বলে। যেমন : মূর্তি, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদিকে সিজদা করা, খ্রিষ্টানদের (বা অন্য কোনো বিধর্মীর) সাথে গির্জার (বা উপাসনালয় ও মন্দিরের) দিকে ধাবিত হওয়া, বিধর্মীদের বিশেষ ফিতা বা বেল্ট বাঁধা।

সুতরাং মুসলমানরা এ বিষয়ে একমত যে, এ সকল কাজ কাফের ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না এবং এগুলো কুফরের আলামত। যদিও এ সকল কাজের কর্তা পরিষ্কারভাবে (নিজেকে) মুসলিম বলে।'[৩৮২]

ইমাম মাওসিলী হানাফী রাহ. (মৃ. ৬৮৩ হি.) লেখেন,

أن الإتيان بخاصية الكفر يدل على الكفر، فإن من سجد لصنم أو تزيا بزنار أو لبس قلنسوة المجوس: يحكم بكفره.

'কুফরের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা কুফরের ওপর প্রমাণ বহন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মূর্তিকে সিজদা করবে, বিধর্মীদের বিশেষ ফিতা বা বেল্ট ব্যবহার করবে কিংবা অগ্নিপূজারিদের টুপি পরিধান করবে, তাকে কাফের বলা হবে।'[৩৮৩]

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের আদেশ দিয়ে বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে-সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।'[৩৮৪]

উল্লেখ্য, আমেরিকার র‍্যান্ড কর্পোরেশনের পরিভাষায় পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশকারীর নাম হলো 'ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিম' বা মৌলবাদী মুসলিম।[৩৮৫]

আয়াতটির শানে নুযুল :

ছা'লাবা ইবনে ইয়ামীন ও আছাদ প্রমুখ ইহুদী হতে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু তারা পুরাতন ধারণার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমরা ইহুদী থাকা অবস্থায় শনিবারের দিনকে সম্মান করতাম, এখন মুসলমান হওয়ার পরও আমাদেরকে শনিবার দিনকে সম্মান করার অনুমতি দিন।

---

৩৮২. আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, ২/৬১১

৩৮৩. আল-ইখতিয়ার লি-তা'লীল মুখতার, ৪/১৫০; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১/৪৬

৩৮৪. সূরা বাকারা, (২) : ২০৮

৩৮৫. আমেরিকার র‍্যান্ড কর্পোরেশন সকল মুসলমানকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে : ১. ফান্ডামেন্টালিস্ট বা মৌলবাদী, ২. ট্র্যাডিশনালিস্ট বা ঐতিহ্যবাদী, ৩. মডারেট বা মধ্যপন্থী, ৪. সেকুলারিস্ট বা ধর্মনিরপেক্ষ।

তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[৩৮৬]

সুতরাং আকীদা-বিশ্বাসে, চিন্তা-চেতনায়, দেহ-মনে, লেবাস-পোশাকে, সংস্কৃতি-উৎসবসহ সব ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। এ ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় প্রতীক ও সংস্কৃতি অবলম্বন করলে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর পথ হারিয়ে শয়তানের পথে চলে যাবে।

ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের বলে গণ্য হবে।'[৩৮৭]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. বলেছেন,

مَنْ بَنَى فِي بِلَادِ الْأَعَاجِمِ، فَصَنَعَ نَوْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ، حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ: حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'কেউ যদি মুশরিকদের দেশে ঘর বানায়, অতঃপর তাদের নববর্ষ ও উৎসব পালন করে এবং তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, এমনকি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাদের সাথে হাশর হবে।'[৩৮৮]

দুনিয়াবি বিষয়ে কাফেরদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণ করার বিধান

হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রাহ. 'সীরাতুল মুস্তাফা' গ্রন্থে লেখেন, 'নতুন আবিষ্কার, ব্যবস্থাপনা, দ্রব্যসামগ্রী, যুদ্ধাস্ত্র—এসব ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয আছে। যেমন : কামান, বন্দুক প্লেন, মোটরগাড়ি, মেশিনগান ইত্যাদি। কেননা, ইসলামী শরীয়ত আবিষ্কারের পদ্ধতি নির্দেশ করেনি। আবিষ্কার, শিল্প প্রযুক্তি, লিপিকলা—এসব মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয়তার ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

তবে এসব ব্যবহারে বিধি-নির্দেশ রয়েছে। কোন শিল্প, লিপিচিত্র জায়েয, কতটুকু জায়েয, কী পদ্ধতিতে তা ব্যবহার করা হবে, তা শরীয়তে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। একজন চিকিৎসক জুতা বানানোর পদ্ধতি শিক্ষা দেন না, তবে তিনি এই শিক্ষা দেন যে, এভাবে জুতা পরে চললে মগজের ক্ষতি হতে পারে অথবা পা জখম হতে পারে। তেমনইভাবে ইসলাম আবিষ্কার শিক্ষা দেয় না, তবে এটা শিক্ষা দেয় যে, আবিষ্কার

---

৩৮৬. দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর ও রুহুল মাআনী

৩৮৭. আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১, সনদ হাসান

৩৮৮. আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ১৮৮৬৪, শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, ১২/১৯; সনদ সহীহ, ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, ইবনে তাইমিয়া, ১/৫১৩

CamScanner

যেন এমন না হয়, যার দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি হতে পারে।

এসব হচ্ছে ওইসব আবিষ্কারের হুকুম, যেগুলোর বিকল্প মুসলমানদের কাছে নেই। যদি মুসলমানদের কাছে অনুরূপ আবিষ্কার বা সামগ্রী থাকে, সে ক্ষেত্রে এই অনুকরণ মাকরূহ হবে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের ফারসি তীর-ধনুক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, আরবী ধনুক ও ফারসি ধনুক কার্যকারিতার ক্ষেত্রে একই মানের ছিল, শুধু কাঠামোগত পার্থক্য ছিল।

ইসলামে গোঁড়ামি নেই, মর্যাদাবোধ আছে। এ জন্য যে সামগ্রী মুসলমান-কাফের উভয়ের কাছে রয়েছে এবং তার মধ্যে বাহ্যিক কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া কোনো পার্থক্য নেই, সেসব ক্ষেত্রে কাফেরদের অনুসরণ নিষেধ। উপরন্তু এটা অপরাধ ও মর্যাদার পরিপন্থী। কেননা, এতে বিনা কারণে কিংবা অযৌক্তিক প্রয়োজনে অমুসলিম সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী ও অনুসরণ করতে হবে।

বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ নেই। তারা নিজেদের ঘর সম্পর্কে বেখবর হয়ে আছে; বরং নিজেদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে অন্যদের সমাজ ও প্রথার অনুসরণ ও আনুগত্য শুরু করেছে।

তবে হ্যাঁ, যেসব নতুন আবিষ্কার ও নতুন অস্ত্র বা সামগ্রী মুসলমানদের হাতে নেই, সেসব (আবিষ্কার) মুসলমানগণ তাদের জরুরি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার ও ভোগ করতে পারবে, তা জায়েয। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, এসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাফেরদের মতো নিয়ত ও মনোভাব হতে পারবে না। কেবল নিজস্ব প্রয়োজনে এসব নতুন আবিষ্কার ও সামগ্রী ব্যবহার করার অনুমতি ইসলামী শরীয়তে আছে। কাফেরদের অনুকরণের উদ্দেশ্যে হলে এসব নতুন আবিষ্কারের সামগ্রী ব্যবহারকে শরীয়ত অনুমোদন করে না।

মদপান করার পদ্ধতিতে দুধ পরিবেশন ও পান করাতেও শরীয়ত অনুমতি দেয় না। দুধ খেতে মদ খাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করার মানে হচ্ছে সাকীর হৃদয়ে মদের প্রতি আসক্তি রয়েছে, যা সে হৃদয়ে লুক্কায়িত রেখেছে। তেমনইভাবে কোনো বৈধ দ্রব্যের ব্যবহার যদি কাফেরদের পদ্ধতিতে করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার অন্তরে কাফেরদের প্রথা ও পদ্ধতির প্রতি আসক্তি ও অনুরাগ রয়েছে।

যা হোক, যেভাবে কাফেরদের অনুকরণ কাম্য নয়, তেমনইভাবে আল্লাহ তাআলারও প্রত্যাশা হচ্ছে যে, তাঁর প্রিয় বান্দাগণ তাঁর দুশমনের অনুকরণ করবে না। তাদের অনুসরণের কোনো কাজ করবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ

'এবং (হে মুসলিমগণ) তোমরা নাফরমানদের প্রতি ঝুঁকবে না; নতুবা জাহান্নামের আগুন তোমাদেরও স্পর্শ করবে।'[৩৮৯]

কাফেরদের অনুকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

দ্বীন-ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। অতীতের সকল মতবাদ, বিধান ও জাতীয় আদর্শকে রহিত করে ইসলাম এসেছে। ইসলাম তার অনুসারীদের এই অনুমতি দেয় না যে, তারা রহিত মতবাদের অনুসারীদের অনুকরণ করবে। শুধু তা-ই নয়, অন্যদের অনুকরণ আত্মমর্যাদাবোধেরও পরিপন্থী।

যেভাবে প্রতিটি জাতির ও মতবাদের মৌলিক কাঠামো পৃথক, তেমনইভাবে এর প্রকৃতির একটি ভিন্ন রূপ রয়েছে। পৃথিবীতে প্রকাশ্য আকার-আকৃতি ও বেশভূষা পৃথক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যম। এসবের ভিত্তিতেই জাতি ও সম্প্রদায় পারস্পরিকভাবে সামাজিকতা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আলাদা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিগণিত হয়।

যখন কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ গ্রহণ করে ও আকার-আকৃতি ধারণ করে, তখন তাদের নিজস্ব জাতীয়তা ও আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, নিজ জাতীয় আদর্শ এবং ব্যক্তিত্বকে অন্য জাতীয় আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের নিকট বিসর্জন দেওয়া আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। এর আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদতের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ইসলাম কোনো কিছুর অধীন ও অনুসারী নয়। তেমনইভাবে ইসলামের সামাজিক বিধান ও সংস্কৃতিও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, এ ক্ষেত্রে সে কারও অধীন বা অনুগামী নয়।

এটি বৈধ নয় যে, কোনো সেনাবাহিনী দুশমনের সৈন্যদের ইউনিফর্ম পরিধান করবে অথবা শত্রুর ঝান্ডা নিজ বাহিনীর সাথে বহন করবে; বরং কোনো সৈনিক এমনটি করলে তাকে হত্যাযোগ্য মনে করা হবে।

তদ্রূপ আল্লাহর সেনাবাহিনী মুসলমানদের জন্যও এই অনুমতি হতে পারে না যে, তারা শয়তানের বাহিনীর আকৃতি ধারণ করবে, যা দেখে দর্শকদের সন্দেহ হবে।

অবাক হওয়ার মতো বিষয় হচ্ছে, যেকোনো ব্রিটিশ জেনারেল ব্যক্তি রুশ ইউনিফর্ম ব্যবহারকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দেবে। কারণ, রুশ ব্রিটিশের শত্রু। কিন্তু আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি এই ঘোষণা দেওয়ার অধিকার নেই যে, আল্লাহর দুশমনদের বেশভূষা অনুকরণ করা অপরাধ?

من تشبه بقوم فهو منهم.

---

৩৮৯. সূরা হুদ, (১১) : ১১৩

CamScanner

অর্থাৎ যারা আল্লাহর দুশমনদের অনুকরণ করবে, তাদের পোশাক পরবে, নিঃসন্দেহে তারাও আল্লাহর দুশমন হিসেবেই গণ্য হবে।

ইসলাম হচ্ছে নূর - আর কুফর হচ্ছে অন্ধকার।

ইসলাম হচ্ছে হক - আর কুফর হচ্ছে বাতিল।

ইসলাম সুন্দর অনুপম - কুফর অসুন্দর কুৎসিত।

ইসলাম হচ্ছে দিনের আলো - কুফর হচ্ছে রাতের অন্ধকার।

ইসলাম হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদা - কুফর হচ্ছে অপমান ও লাঞ্ছনা।

এ জন্যই ইসলাম তার অনুসারীদের অন্ধকার, অপমান ও বাতিলের পোশাক পরতে ও সম আকৃতি ধারণ করতে অনুমতি দেয় না। যেন তারা তাদের সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে যায়।

ইসলামের হাকীকত তথা মৌলিকত্ব কুফরের হাকীকত থেকে আলাদা। এভাবে ইসলাম চায় তার অনুসারীরা আকৃতি-প্রকৃতি, পোশাক-বেশভূষায় শত্রুদের থেকে আলাদা থাকুক।

সারকথা, শরীয়তে অন্যের অনুকরণের নিষেধাজ্ঞা কোনো গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতার ভিত্তিতে হয়নি; বরং আত্মমর্যাদাবোধ, নিরাপত্তা, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের ভিত্তিতে হয়েছে। কোনো সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত আলাদা সম্প্রদায় বলা যাবে না, যতক্ষণ না তারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধারণে আলাদা হবে।

ইসলামী উম্মাহকে কুফর, ধর্মদ্রোহিতা, নাস্তিকতা থেকে নিরাপদ রাখার কোনো উপায় নেই, যতক্ষণ না ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বসমূহকে ধরে রাখা যাবে এবং কাফেরদের অনুকরণ থেকে রক্ষা করা যাবে। কেননা, অনুকরণের অর্থ হচ্ছে, নিজ অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে অন্যের অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন করে দেওয়া। ইরশাদ হয়েছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা কাফেরদের মতো হয়ো না।'[৩১০]

মুমিন আল্লাহর বন্ধু, আর কাফের আল্লাহর তাআলার দুশমন। অতএব কাফেরদের থেকে আলাদা ও পৃথক থাকা এবং পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক। সরকারের অনুগতদের জন্য এটা মানায় না যে, তারা বিদ্রোহীদের অনুকরণে একই রং ধারণ করবে এবং একই পোশাক পরিধান করবে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

---

৩১০. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৫৬

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সেই সমস্ত লোকদের মতো হবে না, যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছিল।'[৩৯১]

কুরআনে কারীমে মুসলমানদের কাফেরদের সাথে ওঠাবসা করতে নিষেধ করার পর বলেছেন, إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ 'তাহলে তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে।'[৩৯২]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

'যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে পরিগণিত হবে।'[৩৯৩]

আর হাদীসে আছে, যারা যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে, তারা তাদের মধ্যেই শামিল হবে।

অন্যদের অনুকরণ ও বেশভূষা গ্রহণ করার ভয়াবহ ক্ষতি

১. ইসলাম ও কুফরের মাঝে পৃথক কোনো সত্তা অবশিষ্ট থাকবে না। হক আদর্শ বাতিল মতবাদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে।

সত্য কথা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টান বা অন্যদের অনুকরণ করার মানে হচ্ছে, (নাউযুবিল্লাহ!) নাসারা বা তাদের মতবাদের দরজা ও বারান্দায় প্রবেশ করা।

২. অন্যদের অনুকরণ করা আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী। জাতীয় নিদর্শন ও পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে এই ব্যক্তি অমুক সম্প্রদায়ের। বস্তুত এটি ইসলামী মর্যাদাবোধের জন্য অপরিহার্য যে, আমরা নিজেদের বেশভূষার অনুসরণ করব এবং অন্যদের মোকাবিলায় আমাদের বিশেষ পরিচিতি হবে।

৩. কাফেরদের সভ্যতা ও পোশাক গ্রহণ করা প্রকারান্তরে তাদের নেতৃত্ব ও আচরণকে মেনে নেওয়া। শুধু তা-ই নয়, বরং এটা নিজেদের হীনম্মন্যতা ও তাদের অধীন হওয়ার স্বীকৃতি ও ঘোষণা, যার অনুমতি ইসলাম দেয় না। অন্যের বেশভূষা গ্রহণ করা মানেই হীনম্মন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রজা শাসকের আনুগত্য করতে বাধ্য হয়ে থাকে, তাকে খুশি করার জন্য সে শাসকের অনুগত ও অনুসারীর মতো পোশাক পরে। যেখানে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও আলাদা স্বাধীন আদর্শ, সেখানে তাদের অনুসরণ আনুগত্য করা হবে কেন?

---

৩৯১. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৬৯

৩৯২. সূরা নিসা, (৪) : ১৪০

৩৯৩. সূরা মায়েদা, (৫) : ৫১

৪. কাফেরদের অনুকরণের আরও খারাপ দিক হচ্ছে, ধীরে ধীরে তাদের প্রতি অন্তর আকৃষ্ট হতে থাকবে, তাদের মতো হওয়ার জন্য চাহিদা পয়দা হবে, যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

এটা কি জুলুম নয় যে, ঈমান-ইসলামের দাবি করা হবে, আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বতের ঘোষণা করা হবে, আর আকার-আকৃতি ও বেশভূষায় আল্লাহর দুশমনদের মতো হবে?

কোনো সরকার এটা বরদাশত করবে না যে, সরকারের আনুগত্যের ঘোষণা দিয়ে সরকারের শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব রাখা হবে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক হবে। এসব কাজ অপরাধ।

তদ্রূপ আহকামুল হাকিমীনের দুশমন এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের অস্বীকারকারী ও বিরোধিতাকারীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও তাদের সাথে মাখামাখি, বেশভূষা ও আকৃতিতে পোশাকের অনুকরণকে যদি নিষেধ করা হয়, তাহলে নাক কুঞ্চিত করা হবে কেন?

৫. এরপর আস্তে আস্তে ইসলামী পোশাক ও ইসলামী সভ্যতাকে উপহাস করার সুযোগ পাবে। ইসলামী পোশাককে অবহেলা করবে এবং পরিধানকারীদেরও তুচ্ছ মনে করবে।

৬. ইসলামী বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে। মুসলমানদের চেহারা-সূরত কাফেরদের মতো দেখে মনে করা হবে যে, এরা ইহুদী, নাসারা বা হিন্দু। যদি কখনো কোনো লাশ পাওয়া যায়, সূরত দেখলে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যেতে হবে যে, এর জানাযা পড়া হবে? কিংবা তাকে করবস্থানে দাফন করা হবে?

৭. যখন ইসলামী পরিচিতি বর্জন করে অন্যদের বেশভূষা গ্রহণ করা হয়, তখন নিজ সমাজে তার কোনো মর্যাদা থাকে না। নিজ সমাজে যার ইজ্জত থাকে না, তখন অন্যদের কি ঠ্যাকা পড়েছে যে, তারা তাকে সম্মান করবে! নিজের সমাজে যার ইজ্জত থাকে, অন্য সমাজের কাছেও তার সম্মান থাকে।

৮. অন্য জাতির পোশাক গ্রহণ করা নিজ সমাজের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রমাণ।

৯. পরিতাপের বিষয় হলো, ইসলামের দাবি করা হচ্ছে, অথচ পোশাক, সামাজিক সভ্যতা, ভাষা, সাংস্কৃতিক জীবনধারা সবকিছুই ইসলামের দুশমনদের মতো। এই অবস্থায় ইসলামের দাবির কী প্রয়োজন আছে? যারা ইসলামের শত্রুদের অনুকরণকে নিজেদের জন্য ইজ্জত-সম্মান ও গর্বের বিষয় মনে করে, ইসলামে এ-জাতীয় মুসলমানের প্রয়োজন নেই।

কাফেরদের বেশভূষা গ্রহণ করার কী প্রয়োজন? বিনা প্রয়োজনে তাদের পোশাক গ্রহণ করার ইচ্ছা এমনটি হতে পারে যে, আমরাও কাফের হতে চাই। নাউযুবিল্লাহ!

CamScanner

আকৃতিতে হলেও কাফের হয়ে যাব। অথবা এভাবেও বলা যায়, আমরা তথাকথিত প্রগতিশীল হওয়ার জন্য আমাদের শত্রুদের পোশাক, বেশভূষা, সভ্যতা, আকার-আকৃতি ও সংস্কৃতি গ্রহণ করতে চাচ্ছি![৩৯৪]

ঈমান ভঙ্গের পনেরোতম কারণ

কুরআনকে বিকৃত বা অরক্ষিত মনে করা। পুরো কুরআন হোক বা আংশিক হোক। ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'বস্তুত এ উপদেশবাণী (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।'[৩৯৫]

যদিও কুরআন মাজীদের আগে বহু আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। তাই আল্লাহ তাআলা সেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করার গ্যারান্টি দেননি। সেগুলো হেফাজত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেমন সূরা মায়েদায় (৫ : ৪৪) বলা হয়েছে।

কিন্তু কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব। কিয়ামতকাল পর্যন্ত এর কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে। তাই এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এর ভেতর কোনো রদবদলের সম্ভাবনা নেই।

আল্লাহ তাআলা এমনভাবে এ গ্রন্থ সংরক্ষণ করেছেন যে, ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত পূর্ণ কিতাব মুখস্থ করে নিজেদের বক্ষদেশে সুরক্ষিত করে রাখে। কথার কথা, যদি শত্রুগণ কুরআন মাজীদের সমস্ত কপি খতম করে ফেলে (নাউযুবিল্লাহ!), তবুও ছোট ছোট শিশুরাও এ কুরআন পুনরায় লিপিবদ্ধ করাতে পারবে এবং তাতে এক হরফেরও হেরফের হবে না। এটা কুরআন মাজীদের এক জীবন্ত মুজিযা।[৩৯৬]

তাই যে সকল শিয়া সম্প্রদায় এবং অন্য যারা কুরআন বিকৃত বা অরক্ষিত বিশ্বাস রাখে, তারা কাফের।[৩৯৭]

---

৩৯৪. সীরাতুল মুস্তফা, ৩/৩৪১-৩৪৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঈষৎ পরিমার্জিত।
৩৯৫. সূরা হিজর, (১৫) : ৯
৩৯৬. দ্র. তাওযীহুল কুরআন।
৩৯৭. ইনআমুল বারী, তাকী উসমানী, ১/৩৩২

শুধু কুরআন মানা, হাদীস-সুন্নাহ তথা নবীজীর বক্তব্য, কর্ম ও সমর্থন না মানা।

আর এ না মানাটা কয়েকভাবে হতে পারে :

১. হাদীস-সুন্নাহকে শরীয়তের আলাদা উৎস না মানা বা দ্বিতীয় প্রধান দলীল মনে না করা। তা এ কারণে যে, কুরআন মানলেই হাদীস মানা হয়ে যায় মনে করা!

২. হাদীসকে দলীল হিসেবে মানা। তবে সব হাদীসকে নয়; বরং হাদীসকে শরীয়তের আলাদা দলীল হিসেবে না মানার কারণে যেই হাদীস কুরআনের সাথে মিল থাকবে তা মানা; আর যে হাদীসে অতিরিক্ত বিধান থাকবে, তা না মানা। অর্থাৎ সব বিষয়ে কুরআনের রেফারেন্স চাওয়া।

৩. হাদীসকে ঐতিহাসিক রেকর্ড হিসেবে মানা, কিন্তু বিধান শুধু কুরআন থেকে নেওয়া, বিধান হবে শুধু আল্লাহর মনে করা।

৪. রাসূলের আনুগত্যকে তাঁর জীবদ্দশায় প্রযোজ্য মনে করা।

৫. হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা। তবে কোন হাদীস প্রমাণিত আর কোনটা অপ্রমাণিত—এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদগণের সর্বসম্মত উসূল অনুসরণ না করে বরং কমনসেন্স, বিজ্ঞান, প্রচলিত বা ধারণাপ্রসূত ভদ্রতা ও সামাজিকতার সাথে সাংঘর্ষিক কি না তা দেখা। ফলে হাদীসের সংকলনগুলো সামগ্রিকভাবে অগ্রহণযোগ্য মনে করা।

৬. মুতাওয়াতির ছাড়া না মানা। কারণ, খবরে ওয়াহিদগুলো যন বা ধারণামাত্র।

শেষটা ব্যতীত সবগুলো কুফর।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'(হে নবী!) আপনার রবের কসম! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না নিজেদের ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক বানাবে, অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা থাকবে না এবং (তা) সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে।'[৩৯৮]

এ আয়াতের তাফসীরে এসেছে,

وَفِي هَذِهِ الآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْ أَوَامِرِ اللهِ تَعَالَى أَوْ أَوَامِرِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الإِسْلَامِ.

---

৩৯৮. সূরা নিসা, (৪) : ৬৫

'এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, কেউ যদি আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের কোনো বিধান প্রত্যাখ্যান করে, সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাবে।'[৩৯৯]

হাদীসের প্রামাণিকতা অস্বীকারকারীদের খণ্ডনে ইমাম সুয়ূতী রাহ. (মৃ. ৯১১ হি.) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة নামে স্বতন্ত্র একটি রিসালা লিখেছেন। এতে তিনি লিখেছেন,

من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم – قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول – حجة: كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فرق الكفرة.

'যে রাসূলের হাদীসের প্রামাণিকতা অস্বীকার করবে, সে কাফের ও ইসলাম থেকে খারেজ। তার হাশর হবে ইহুদী-খ্রিষ্টান বা অন্য কাফের সম্প্রদায়ের সাথে।'[৪০০]

ইমাম আবু মানসুর আবদুল কাহের বাগদাদী রাহ. (মৃ. ৪২৯ হি.) বলেন,

ومن رد حجة القرآن والسنة فهو الكافر.

'যে কেউ কুরআন ও সুন্নাহর দলীলকে রদ করবে, সে কাফের।'[৪০১]

ইবনে আমীর হাজ রাহ. (মৃ. ৮৭৯ হি.) বলেন,

(بخلاف حجية القرآن) والسنة (فإنه) أي: إنكارها (كفر) فإنه من ضروريات ملة الإسلام.

'কুরআন ও সুন্নাহর প্রামাণিকতা অস্বীকার করা কুফর। কারণ, তা জরুরিয়াতে দ্বীন তথা সর্বজনবিদিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।'[৪০২]

হানাফী ফকীহ মাহমুদ বিন মাজাহ বুখারী রাহ. (মৃ. ৬১৬ হি.) বলেন,

إن المتواتر واجب العمل به قطعا، يكفر جاحده... وما كان من خبر الآحاد يخطأ جاحده.

'মুতাওয়াতির হাদীস অকাট্যভাবে পালনীয়, যার অস্বীকারকারী কাফের। আর খবরে ওয়াহিদ অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট।'[৪০৩]

ফাতাওয়ার কিতাবসমূহে রয়েছে,

---

৩৯৯. আহকামুল কুরআন, জাসসাস, ২/২৬৮; আত-তাফসীরুল কাবীর, রাযী, ১০/১২৪ ও আল-লুবাব ফী উলূমিল কিতাব, ইবনে আদিল, ৬/৪৫৬

৪০০. মিফতাহুল জান্নাহ, পৃষ্ঠা ৫

৪০১. উসূলুদ্দীন, বাগদাদী, পৃষ্ঠা ১৬৩

৪০২. আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, ৩/৩০৩; আরও দেখুন, ইরশাদুল ফুহুল, শাওকানী, ১/৯৭; ফাতাওয়া আযীযী, পৃষ্ঠা ৪৪১ (উর্দু); ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৩/৩৭; আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ইউসুফ লুধিয়ানবী, ২/৫১; ফাতাওয়া উসমানী, তাকী উসমানী, ১/৭৮; ইনআমুল বারী, তাকী উসমানী, ১/৩৩৪

৪০৩. আল-মুহীতুল বুরহানী, ৮/৮

CS CamScanner

ومن أنكر المتواتر فقد كفر، ومن أنكر المشهور يكفر عند البعض، وقال عيسى بن أبان: يضلل ولا يكفر، وهو الصحيح، ومن أنكر خبر الواحد لا يكفر، غير أنه يأثم بترك القبول، هكذا في الظهيرية.

'কেউ যদি মুতাওয়াতির হাদীস অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের। আর যে মাশহুর হাদীস অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট। আর খবরে ওয়াহিদ অস্বীকারকারী গুনাহগার।'[৪০৪]

আরও এসেছে,

ويكفر بإنكار أصل الوتر والأضحية.

'মূল বিতিরের নামাজ ও কুরবানী অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।'[৪০৫]

এর কারণ হচ্ছে, উক্ত বিষয়দ্বয় কুরআনে সুস্পষ্টভাবে না থাকলেও মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত। আর মুতাওয়াতির অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের। তবে কেউ বিষয়দ্বয় অস্বীকার না করে, বরং ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করলে কাফের হবে না। কারণ, এটা ইজতিহাদী বিষয়।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) লেখেন,

وما لم يجيء هذا المجيء، بل نقل آحادا... يكفّر الشاهد بإنكاره سؤال الملكين وإيجاب صدقة الفطر، ويفسّق الغائب به ويضلّل..؛ لأنه لمّا لم يسمعه مِن فيه: لم يكن ثبوته من النبي ﷺ قطعا، فلم يكن إنكاره تكذيبا له؛ بل للرواة، أو تغليطا لهم، وهو فسق وضلالة؛ اللهم إلا أن رده استخفافا؛ إذ كان إنما قاله النبي ﷺ، فيكفر.

'যে সকল বিষয় অকাট্য নয়, বরং খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত, যেমন : কবরে (মুনকার ও নাকীর) দুই ফেরেশতার প্রশ্ন করা এবং সাদকায়ে ফিতরা ওয়াজিব হওয়া, এমন বিষয় রাসূল থেকে প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে। আর অপ্রত্যক্ষকারী (সরাসরি না জানা) ব্যক্তি অস্বীকার করলে তাকে ফাসেক ও গোমরাহ বলা হবে। কেননা, সে সরাসরি রাসূলের মুখ থেকে শোনেনি। তাই তার নিকট এটা রাসূল থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়।

সুতরাং তার এ-জাতীয় বিষয় অস্বীকার করাটা রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর নয়; বরং বর্ণনাকারীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা ভুলের শিকার হয়েছে মনে করা। কাজেই এটা ফাসেকী ও গোমরাহী।

তবে হ্যাঁ, এ-জাতীয় বিষয় যদি রাসূলের বক্তব্য হওয়ার কারণে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা

৪০৪. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ৭/৩০৫; ফাতাওয়া আলমগীরী, ২/২৭৭; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া, ১২/১৮৩; শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ২৭৬

৪০৫. আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, ২/৮৭; আল-বাহরুর রায়েক, ৫/২০৪; ফাতাওয়া শামী, ২/৪৪০

CamScanner

করে অস্বীকৃতি করা হয়, তখন কাফের হয়ে যাবে।’[৪০৬]

আহলে কুরআনের হাদীস-সুন্নাহ অস্বীকারের রহস্য ও জবাব

কুরআনিস্ট বা আহলে কুরআন (?) বলছে, কুরআন ছাড়া অন্য কিছু বা কুরআনের অতিরিক্ত কোনো কিছু মানা যাবে না। কুরআনের বাইরে হাদীস, সুন্নাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ কোনো কিছুই গ্রহণ করা যাবে না।

অথচ যেই কুরআন মানার কথা তারা বলছে, তা পরিপূর্ণভাবে তারা মানে না। কারণ, কুরআন পরিপূর্ণ মানলে সেখানে কুরআনের বহু আয়াতে

أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ

তথা আল্লাহ তাআলার সাথে রাসূলকে মানা ও আনুগত্য করার কথা বলা হয়েছে। এমনকি এক আয়াতে مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ

‘রাসূলের আনুগত্য করাকে নিশ্চিত আল্লাহর আনুগত্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।’[৪০৭]

শুধু তা-ই নয়, আল্লাহ তাআলা যেভাবে কিতাব নাযিল করেছেন, তিনি হিকমতও নাযিল করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ.

‘আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনাকে এমন সব বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনি জানতেন না।’[৪০৮]

অন্যত্র বলেন,

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ

‘আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদের উপদেশদানের লক্ষ্যে তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন, তা স্মরণ রেখো।’[৪০৯]

অতএব কিতাব ও হিকমত দু-ই আল্লাহর নাযিলকৃত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কিতাব শিখিয়েছেন, হিকমতও শিখিয়েছেন; বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ায় পাঠানোর প্রধান যে চারটি উদ্দেশ্য, তন্মধ্যে একটি হলো হিকমত শিক্ষা দেওয়া। আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

৪০৬. আল-মুসায়ারাহ (খাতিমা), পৃষ্ঠা ২৯৯
৪০৭. সূরা নিসা, (৪) : ৮০
৪০৮. সূরা নিসা, (৪) : ১১৩
৪০৯. সূরা বাকারা, (২) : ২৩১

CS CamScanner

'তিনিই উম্মীদের (নিরক্ষরদের) মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে।'[৪১০]

আর হিকমত হলো কুরআনের ব্যাখ্যা ও শরীয়তের সকল বিধি-বিধান।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌলিক দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে, কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যা প্রদান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ.

'(হে নবী!) আমি আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে সেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।'[৪১১]

অতএব কুরআনের কোন আয়াতের কী মর্ম-ব্যাখ্যা, কোন আয়াতে কী বিধি-বিধান, এবং সেই বিধান পালনের নিয়ম-পদ্ধতি কী—এগুলো শিক্ষা দেওয়া তাঁর অন্যতম দায়িত্ব, যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও সুন্নাহ বা শরীয়াহ নামে পরিচিত।

এ জন্য অন্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে, তিনি উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করবেন এবং নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الْاُمِّیَّ الَّذِیْ یَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِیْلِ ؗ یَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ یَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰٓىِٕثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِیْ كَانَتْ عَلَیْهِمْ ؕ فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

'যারা এই রাসূল তথা উম্মী নবীর অনুসরণ করবে, যার কথা তারা তাদের নিকট থাকা তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ পাবে, যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করবেন ও মন্দ কাজে নিষেধ করবেন এবং তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করবেন ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করবেন এবং তাদের থেকে ভার ও গলার বেড়ি নামাবেন, যা তাদের ওপর চাপানো ছিল। সুতরাং যারা তার (অর্থাৎ নবীর) প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান করবে, তার সাহায্য করবে এবং তার সঙ্গে যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে

---

৪১০. সূরা জুমুআহ, (৬২) : ২; সূরা বাকারা (২) : ১২৯; সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৬৩
৪১১. সূরা নাহল, (১৬) : ৪৪

CamScanner

তার অনুসরণ করবে, তারাই হবে সফলকাম।'[৪১২]

এটাকে অন্য আয়াতে সংক্ষিপ্ত ভাষায় এভাবে বলা হয়েছে,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

'রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো; আর তোমাদের যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।'[৪১৩]

আর সূরা আহযাবে রাসূলের সত্তা ও জীবনকেই মুমিনদের জন্য 'উসওয়াতুন হাসানা' তথা উত্তম আদর্শ বলা হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

'বস্তুত রাসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখিরাত-দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।'[৪১৪]

এগুলো আমাদের কাছে সীরাত, হাদীস, সুন্নাহ, দ্বীন ও শরীয়ত প্রভৃতি নামে পরিচিত।

সুতরাং রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, আনুগত্য করা ও উসওয়া হিসেবে গ্রহণ করার অর্থই হলো তাঁর সুন্নাহ, হাদীস ও সীরাতের অনুসরণ করা এবং তাঁর সকল কথা ও কাজ বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়ে তাঁর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশ করা।

প্রকৃতপক্ষে 'আহলে কুরআন' নামধারী হাদীস অস্বীকারকারীরা যদি পরিপূর্ণভাবে কুরআন মানত, তাহলে তো অবশ্যই রাসূলের নিঃশর্ত আনুগত্য করত এবং হাদীস, সুন্নাহ ও সীরাত ইত্যাদি সবই মানত। কেননা, কুরআনই তো এগুলোকে মানার জন্য বলেছে এবং এগুলো মানা কুরআনকে মানারই অংশ। কিন্তু তারা যেহেতু এগুলো মানছে না, কাজেই তারা কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে মানে না।

সর্বোপরি হাদীস-সুন্নাহ যদি মানা না হয়, তাহলে ঈমানের পর প্রধান আমল নামাজসহ সব আমল নিজেদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ও মনমতো পালন করার সুযোগ পাওয়া যাবে। এ জন্যই দেখা যাচ্ছে, সজল রোশন নামক হাদীস অস্বীকারকারী কুরআনিস্টের (?) মতে সালাতের অর্থ হচ্ছে, 'সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিধি-নিষেধ ছায়ার মতো অনুসরণ করা!' আবার তাদের আরেক গ্রুপ নতুন নিয়মে নামাজ চালু করেছে, যা ইসলামের চৌদ্দশ বছর ধরে অকাট্যভাবে ধারাবাহিক চলে আসা

৪১২. সূরা আরাফ, (৭) : ১৫৭
৪১৩. সূরা হাশর, (৫৯) : ৭
৪১৪. সূরা আহযাব, (৩৩) : ২১

CamScanner

সম্মিলিত পদ্ধতির বিপরীত। এভাবে সুদ, মদ, পর্দা ইত্যাদি বিধানের মনমতো ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাচ্ছে।

তাদের এমন বিকৃত ব্যাখ্যা করার ও মনমতো আমল করার সুযোগ পাওয়ার মূল কারণ হলো, হাদীস ও সুন্নাহকে না মানা। কেননা, কুরআনে নামাজসহ অন্যান্য আমলের বিবরণ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ আসেনি। ফলে হাদীস ও সুন্নাহকে যদি মানা না হয়, তাহলে ইসলামের নামে বিধি-বিধান ও আমলের নতুন ব্যাখ্যা দেওয়ার এবং নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে চালিয়ে দিতে আর কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হবে না।[৪১৫]

ঈমান ভঙ্গের সতেরোতম কারণ

সশস্ত্র জিহাদের বিধান অস্বীকার করা কিংবা রাসূলের যুগে জিহাদ থাকলেও এখন আর জিহাদের বিধান নেই মনে করা অথবা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত জিহাদকে জঙ্গীবাদ, বর্বরতা, মারামারি, উগ্রতা ও সন্ত্রাস ইত্যাদি বলা।

বলাবাহুল্য, জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে হত্যা করা বা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়; বরং সন্ত্রাস দমন করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আইন-কানুন মেনে নিতে বাধ্য করা।

এ জন্যই তো কোনো কাফের ইসলামী রাষ্ট্রে থাকতে চাইলে সামান্য জিযিয়া দিয়ে থাকতে পারে।

আর জিহাদের উদ্দেশ্য যদি কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হতো, তাহলে কাফেরদের নারী, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও জিহাদের বিধান থাকত। অথচ এদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান নেই।

জিহাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি কোনোটাই কাম্য নয়

জিহাদ মজলুম ও অবহেলিত এক ফরজ বিধান, কাছের-দূরের সবার কাছেই এক আতঙ্কের নাম। মুসলিম-অমুসলিম সবাই যাকে ভিন্ন চোখে দেখে, এর পক্ষে কেউ বলতে যাবে কোন সাধে?

কাফের-মুশরিকরা এটাকে সন্ত্রাস বলে প্রচার করেছে, কতিপয় মুসলিমরা জঙ্গীবাদ ও উগ্রবাদ নামে আখ্যায়িত করেছে, আর সাধারণ মানুষও সেটাই বুঝে নিয়েছে!

এ ছাড়া কতিপয় সালাফী, রাজনৈতিক ইসলামী দলের শায়খ ও কিছু তাবলীগী ভাই

---

৪১৫. 'আহলে কুরআন' নামধারী হাদীস অস্বীকারকারীদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে, বিশেষত শিক্ষিত মহলে। তাই এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া সময়ের দাবি। এ বিষয়ে আরবী ও উর্দু ভাষায় অনেক সমৃদ্ধ বই রয়েছে। বাংলা ভাষায় দেখতে পারেন উমেদ থেকে প্রকাশিত ২২৪ পৃষ্ঠার 'হাদীস মানতেই হবে' বইটি।

CamScanner

এতে তাহরীফ ও বিকৃতি করে সীমালঙ্ঘন করছে। এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সাথে দ্বীনের অন্যান্য শাখার চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে গুলিয়ে ফেলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

কেউ এর ফরজ হওয়ার শর্ত না পেয়ে খোদ বিধানটাকেই অস্বীকার করে বসছে। আবার কেউ এ ভেবে অস্বীকার করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন রহমতের নবী, যোদ্ধার নবী নয়।

কিছু লোক বলছে, মনের জিহাদই বড় জিহাদ। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে একটি রাজনৈতিক দল 'আমীরুল মুজাহিদীন' পরিভাষাটা নিজেদের দলীয় আমীরের উপাধি বানিয়ে নিয়েছে!

বস্তুত এ সবই অজ্ঞতা বা ভ্রষ্টতা!

সহীহ মুসলিমের হাদীসে আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ: مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, জীবদ্দশায় সে না কখনো জিহাদ করেছে, আর না জিহাদের তামান্না রেখেছে, সে যেন মুনাফিক হয়ে মারা গেল।'[৪১৬]

মোল্লা আলী কারী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) হাদীসটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'এর অর্থ হচ্ছে, যে লোক জিহাদের জন্য দৃঢ় সংকল্প করেনি এবং এ কথাও বলেনি যে, يا ليتني كنتُ مجاهدًا 'হায় যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে পারতাম!'... এরূপ ব্যক্তি মারা গেলে সে মুনাফিক এবং জিহাদ থেকে পিছপা গ্রহণকারী হিসেবে মরবে। কারণ, যে ব্যক্তি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে। অতএব প্রত্যেক মুমিনের উচিত জিহাদের নিয়ত করা, চাই জিহাদ ফরজে কিফায়া হোক কিংবা ফরজে আইন।'[৪১৭]

হযরত উমর রাযি. দুআয় বলতেন,

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ.

'হে আল্লাহ, আমাকে আপনার রাস্তায় শাহাদাতের মর্যাদা নসীব করুন।'[৪১৮]

হে আল্লাহ, আমাদেরও মুজাহিদদের কাতারে শামিল করুন এবং আপনার রাস্তায় শাহাদাতের মওত নসীব করুন! আমীন।

বলাবাহুল্য, কিছু সন্ত্রাসী জিহাদের নামে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে বেড়ায়; বরং

---

৪১৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১০

৪১৭. মিরকাতুল মাফাতিহ, ৬/২৪৭০

৪১৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯০

বোমাবাজি, ভাঙচুর ও মানুষের ক্ষতি করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

আবার কিছু অতি উৎসাহী ব্যক্তি ও দল রয়েছে, যারা জিহাদ ও তাওহীদুল হাকিমিয়া তথা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকেই 'মূল ইসলাম' বানিয়ে নিয়েছে। নামাজ-রোযাসহ সবকিছুর ওপরে বিষয়দ্বয়কে স্থান দিয়েছে।

অথচ বিষয়দ্বয় ইসলামের অন্যান্য ফরজের মতো ফরজ। এমনকি জিহাদের স্থানও ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের পর, যা অনেক ইমাম সুস্পষ্ট করে বলেছেন।

এভাবে কিছু বক্তা ও লেখক সাধারণ মুসলিম ও যুবকদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভুল প্রক্রিয়ায় জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে কিংবা অনুপযুক্ত পন্থায় দীক্ষিত করে। এমনকি তাদের কেউ কেউ দ্বীনের অন্যান্য অঙ্গনে মশগুল ব্যক্তিদের সঠিক পথে নেই মনে করে কিংবা আহলে ইলম ও বড়দের প্রতি অশ্রদ্ধা তৈরি করে এবং তাঁদের গোমরাহ, বরং 'তাগূতের দালাল' পর্যন্ত বলে!

তারা এর স্বপক্ষে বুখারী-মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদীস

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

'সর্বদা আমার উম্মতের একটি দল হকের ওপর জয়ী থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিরোধিতাকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না' পেশ করে বলে, এখানে একটি দল থেকে 'মুজাহিদগণ' উদ্দেশ্য।

অথচ ইমাম বুখারী রাহ. 'সহীহ বুখারী'তে এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'আহলে ইলম' উদ্দেশ্য। ইবনুল মুবারক ও ইমাম আহমদ রাহ. বলেছেন, 'মুহাদ্দিসগণ' উদ্দেশ্য।

তবে ইমাম নববী রাহ. (মৃ. ৬৭৬ হি.) যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা সবচেয়ে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য। তিনি মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন,

ويحتمل أن هذه الطائفة مفرَّقة بين أنواع المؤمنين، منهم: شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زُهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير.

'হতে পারে উক্ত দল মুমিনদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিক্ষিপ্ত। যাদের কেউ মুজাহিদ, কেউ ফকীহ, কেউ মুহাদ্দিস, কেউ পীর-দরবেশ, কেউ তাবলীগী বা সৎ কাজের আদেশকারী ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারী কিংবা অন্য কোনো ভালো কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তি।'[৪১৯]

কেননা, প্রত্যেক শ্রেণি দ্বারা দ্বীনের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকার হচ্ছে এবং সবারই মূল উদ্দেশ্য হলো, দ্বীনের সংরক্ষণ করা। আর এই সংরক্ষণে সবারই কম-বেশি ভূমিকা ও অবদান রয়েছে।

৪১৯. শারহে মুসলিম, ১৩/৬৭; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১৩/২৯৫

CamScanner

কাজেই আমিই হক পথে আছি এবং আমার কাজই সঠিক না বলে, বরং বলুন, আমিও হক পথে আছি এবং আমার কাজও সঠিক।

কেননা, আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত তথা যাদের আকীদা ও মানহাজ ঠিক আছে, তারা দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় খেদমত করছেন। কেউ শিক্ষা-দীক্ষায় কর্মরত, কেউ ওয়াজ-নসীহত নিয়ে অতিব্যস্ত, কেউ লেখালেখিতে সিদ্ধহস্ত, কেউ দাওয়াত-তাবলীগে আসক্ত, কেউ শাহাদাতের নেশায় জিহাদরত।

এগুলো সবই ইসলাম নামক গাছের এক-একটি শিকড়, যেগুলোর ভূমিকা ও অবদানে গাছটি বেঁচে আছে এবং ফল দিয়ে যাচ্ছে। এগুলো সবই দ্বীন নামক ইমারতের ইট, বালি ও সিমেন্ট, যা দিয়ে ইমারতটি তৈরি হয়েছে এবং সুন্দরভাবে বসবাস করতে ভূমিকা রাখছে।

সুতরাং দ্বীনের অন্যান্য ভালো কাজ যেমন প্রকৃত জিহাদ নয়, তেমনইভাবে জিহাদই একমাত্র ইসলাম নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের জিহাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি থেকে হেফাজত করুন।

ঈমান ভঙ্গের আঠারোতম কারণ

ইসলামী দণ্ডবিধি অস্বীকার করা, বর্বরতা বলা বা ঘৃণা করা।

ইসলামী দণ্ডবিধির মৌলিক প্রকার ও পরিচিতি

ইসলামী দণ্ডবিধির মৌলিকভাবে তিনটি ধারা রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের কোর্টে যাবতীয় বিচার ও দণ্ড এই তিনটি ধারার অধীনে করা হয় :

১. কিসাস।

২. হদ।

৩. তা'যীর।

কিসাস নিয়ে আলোচনা

কিসাস (قِصاص) অর্থ সমপরিমাণ বদলা নেওয়া। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু জুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

ইরশাদ হয়েছে,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۚ

'এবং আমি তাতে (তাওরাতে) তাদের জন্য বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের

বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান ও দাঁতের বদলে দাঁত। আর জখমেও (অনুরূপ) বদলা নেওয়া হবে। অবশ্য যে ব্যক্তি তা (অর্থাৎ বদল) ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা (গুনাহের) কাফফারা হয়ে যাবে।'[৪২০]

উল্লেখ্য, শরীয়তের বিধি-বিধানকে যদি কুরআন অথবা ওহী রহিত না করে, তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন : ইহুদীদের মোকদ্দমায় কিসাসের সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তাওরাতেও ছিল এবং অতঃপর কুরআনও তা হুবহু বহাল রেখেছে। এখানেও জখমের কিসাস সম্পর্কিত বিধান তাওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করে তা বহাল রাখা হয়েছে।

সূরা বাকারায় এসেছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'হে মুমিনগণ, যাদেরকে (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কিসাস (-এর বিধান) ফরজ করা হয়েছে—স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী (-কেই হত্যা করা হবে)। অতঃপর হত্যাকারীকে যদি তার ভাই (নিহতের ওলী)-এর পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, তবে ন্যায়ানুগভাবে (রক্তপণ) দাবি করার অধিকার (ওলীর) আছে। আর উত্তমরূপে তা আদায় করা (হত্যাকারীর) কর্তব্য। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক লঘুকরণ এবং একটি রহমত। এরপরও কেউ সীমালঙ্ঘন করলে সে যন্ত্রণাময় শাস্তির উপযুক্ত।'[৪২১]

এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে, কাউকে যদি ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় এবং হত্যাকারীর অপরাধ প্রমাণিত হয়, তাহলে নিহতের ওয়ারিশের এ অধিকার থাকে যে, সে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণের দাবি তুলবে। জাহেলী যুগেও কিসাস গ্রহণ করা হতো, কিন্তু তাতে ইনসাফ রক্ষা করা হতো না। হত্যাকারী যদি নিহত ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চস্তরের লোক হতো, যেমন : হত্যাকারী পুরুষ আর নিহত নারী, তবে হত্যাকারীর গোত্র বলত, আমাদের কোনো নারীকে হত্যা করো; পুরুষ হত্যাকারীর থেকে কিসাস নেওয়া যাবে না। আলোচ্য আয়াত জাহেলী যুগের এই অন্যায় প্রথার বিলোপ সাধন করেছে। কাজেই হত্যাকারী পুরুষ হোক বা নারী, স্বাধীন হোক বা গোলাম, সর্বাবস্থায় তার থেকেই কিসাস নেওয়া হবে।

---

৪২০. সূরা মায়েদা, (৪) : ৪৫
৪২১. সূরা বাকারা, (২) : ১৭৮

CamScanner

মাসআলা :

কিসাস গ্রহণ করার অধিকার আদায় করার জন্য সরকার বা প্রশাসনের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য আলেম ও ফিকাহবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 'কিসাস'-এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে।

মাসআলা :

হত্যাকারীকে যদি নিহতের ওলী বা ওয়ারিশ মাফ করে দেয়, তবে সে ব্যক্তি কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু রক্তের বদলাস্বরূপ 'দিয়াত' অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণ আর্থিক জরিমানা হত্যাকারীর ওপর ওয়াজিব হবে। এরূপ অবস্থায় তাদের কর্তব্য, সে অর্থের পরিমাণকে ন্যায়সংগত সীমার মধ্যে রাখা। আর হত্যাকারীর উচিত, উত্তম পন্থায় তা আদায় করে দেওয়া।

মাসআলা :

ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেওয়া না হয়, যেমন : এক পুত্র মাফ করে, কিন্তু অপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কিসাস-এর দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবির বদলায় অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে।

আর দিয়াতের পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ উট অথবা এক হাজার দীনার কিংবা দশ হাজার দিরহাম। বর্তমানকালের প্রচলিত ওজন অনুপাতে এক দিরহাম সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের পরিমাণ। আর পূর্ণ দিয়াতের পরিমাণ হবে দুই হাজার নয়শ তোলা আট মাসা রৌপ্য।

মাসআলা :

কিসাসের আংশিক দাবি মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়, তেমনই উভয় পক্ষ যদি কোনো নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপস-নিষ্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও 'কিসাস' মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফিকহের কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে।[৪২২]

জরুরি জ্ঞাতব্য

আদালত কোনো খুনিকে কিসাস হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিলে নিহতের ওলী বা ওয়ারিশ ব্যতীত আর কেউ হত্যাকারীকে মাফ বা তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করতে পারবে না। চাই তিনি রাষ্ট্রের যত বড় ক্ষমতাধরই হোন না কেন। কিন্তু আমাদের দেশসহ অনেক

৪২২. দ্র. মাআরিফুল কুরআন, মুফতী শফী, আয়াতদ্বয়ের তাফসীর

CamScanner

গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইলে তিনি খুনিকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ওয়ারিশ ও বিচারপ্রার্থীর ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই। প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত খুনিকে ক্ষমা করে দিলেও কারও কিছু বলার নেই!

অথচ বিধান চলবে শুধু বিধাতার। এই মর্মে ইসলামের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হচ্ছে,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ 'বিধান একমাত্র আল্লাহরই।'[৪২৩]

মানুষ শুধু বিধাতার অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্তনীয় বিধানের কার্যকর করতে পারে। এ ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে ব্যতিক্রম কিছু করার সুযোগ নেই। আর আল্লাহর প্রেরিত বিধি-বিধান সত্য নয়—এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসব বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা কুফর। তবে সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যত বিপরীত করা হয়, তবে তা জুলুম ও গুনাহ।[৪২৪] এ বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

হদ নিয়ে আলোচনা

হদ (حد) শব্দটির অর্থ নির্দিষ্ট সীমারেখা। শরীয়তে কতিপয় অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি উল্লেখ আছে। এগুলোকে একবচনে 'হদ', আর বহুবচনে 'হুদুদ' বলে।

হদের পারিভাষিক অর্থ হলো, যা 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে এসেছে,

الْحَدُّ هُوَ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَجَبَتْ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالَى.

'নির্ধারিত শাস্তি, যা আল্লাহ তাআলার হক হিসেবে ওয়াজিব।'

কিসাস ও হদের মধ্যে পার্থক্য

কিসাস ও হদ উভয়টিই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি। তবে কিসাসের মধ্যে বান্দার হক প্রবল, আর হদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হক প্রবল।

বলাবাহুল্য, হদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হক প্রবল হলেও বিচারকের নিকট এর অপরাধ প্রমাণিত হলে তা কখনো মাফ হয় না এবং এতে কোনো সুপারিশও করা যায় না। হাদীস শরীফে এ-জাতীয় সুপারিশের ক্ষেত্রে কঠোর ধমকি এসেছে।

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ: تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ

---

৪২৩. সূরা আনআম, (৬) : ৫৭; ইউসুফ, (১২) : ৪০ ও ৪৭

৪২৪. মাআরিফুল কুরআন, মুফতী শফী

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ: لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

'আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, মাখযূমিয়্যা গোত্রের এক মহিলার চুরি করার ব্যাপারটি কুরাইশকে চিন্তিত করল। তারা বলল, এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে কথা বলবে? তখন তারা বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়ভাজন উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া আর কে কথা বলার সাহস রাখে? উসামা ইবনে যায়েদ রাসূলের সাথে কথা বললেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবার (ভাষণ) মধ্যে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের এ কারণে ধ্বংস করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যদি কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি দুর্বল কেউ চুরি করত, তাহলে তার ওপর হদ কায়েম করত। আল্লাহ তাআলার কসম! যদি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদও চুরি করত, তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।'[৪২৫]

হদ পাঁচ প্রকার :

১. যিনার হদ। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহ.-এর নিকট সমকামিতাও হদের অন্তর্ভুক্ত এবং তা যিনার মতো।[৪২৬]

২. যিনার অপবাদের হদ।

৩. ডাকাতির হদ।

৪. চুরির হদ।

৫. মদপানের হদ। এতে নেশার হদও অন্তর্ভুক্ত।

যিনা, যিনার অপবাদ, চুরি ও ডাকাতি—এই চারটি অপরাধের হদ সরাসরি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আর মদপানের হদ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

হুদুদের মোট পাঁচটি আইন হচ্ছে :

১. যিনা বা ব্যভিচারীকে অবিবাহিত হলে ১০০টি বেত্রাঘাত করা, আর বিবাহিত হলে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করে হত্যা করা।[৪২৭]

২. মহিলা বা পুরুষ যে কারও ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আরোপকারীকে

৪২৫. বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭৫; মুসলিম, হাদীস নং ১৬৮৮
৪২৬. আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ, ২৩/৪৪
৪২৭. সূরা নূর, (২৪) : ২

৮০টি বেত্রাঘাত করা।[৪২৮]

৩. ডাকাত, সন্ত্রাসী কিংবা রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা-বিদ্রোহ সৃষ্টিকারীকে কতল করা বা শূলে চড়ানো অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেওয়া কিংবা দেশান্তরিত করা।[৪২৯]

৪. চোরের হাত কর্তন করা।[৪৩০]

৫. মদ্যপকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা।[৪৩১]

উল্লেখ্য, প্রতিটি অপরাধ প্রমাণের জন্য কিছু শর্ত আছে, ফিকহের কিতাবে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, যা ব্যতীত হদ বাস্তবায়ন করা যাবে না। এবং সরকার ও তার প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কেউ হদ বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

তা'যীর সম্পর্কে আলোচনা

তা'যীর (تعزير)-এর আভিধানিক অর্থ হলো শিক্ষামূলক শাস্তি। শরীয়তের পরিভাষায়, সেসব অন্যায় ও পাপ কর্মের শাস্তি দেওয়া, যে ব্যাপারে নির্ধারিত কোনো শাস্তির কথা কুরআন-সুন্নাহতে উল্লেখ নেই। কাজেই যেসব অপরাধে তা'যীর ওয়াজিব হয় সেগুলো হচ্ছে, শরীয়ত কর্তৃক ওইসব নিষিদ্ধ কাজ, যার জন্য ইসলামী শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো শাস্তি নির্ধারিত নেই। যেমন : ঘুষ খাওয়া, সুদ খাওয়া, এতীমের মাল আত্মসাৎ করা, আমানতের খিয়ানত করা, মৃত প্রাণী ভক্ষণ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, গুপ্তচরবৃত্তি করা, স্ত্রীকে নির্যাতন করা, ওজনে কম দেওয়া, গীবত করা ও অন্যান্য যেসব কাজ শরীয়ত হারাম করেছে তা করা কিংবা শরীয়ত যা অবশ্যপালনীয় করেছে, তা পরিত্যাগ করা।

আর তা'যীরের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দণ্ড সতর্ক করা এবং বেত্রাঘাত থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত রায় দেওয়া যায়। দণ্ড নির্বাচনে ও পরিমাণ নির্ধারণে বিচারক তার প্রবৃত্তি, স্বেচ্ছাচারিতা, আক্রোশ ও প্রতিশোধস্পৃহা এবং যুক্তিহীন ও তড়িঘড়ি করে অদূরদর্শিতার সাথে রায় দেবেন না। দণ্ড নির্বাচনে তিনি নির্ধারিত বিধি-বিধানের আলোকে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

ঈমান ভঙ্গের উনিশতম কারণ

আল্লাহ তাআলাকে দেহ ও শরীরবিশিষ্ট বা মাখলূকের মতো দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আকার-আকৃতিবিশিষ্ট মনে করা।[৪৩২]

---

৪২৮. সূরা নূর, (২৪) : ৪
৪২৯. সূরা মায়েদা, (৫) : ৩৩
৪৩০. সূরা মায়েদা, (৫) : ৩৮
৪৩১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭০৬
৪৩২. আন-নূরুল লামি', নাসিরী, পৃষ্ঠা ১৫৭; শারহুল আকীদাতিত তাহাবীয়্যাহ, বাবিরতী, পৃষ্ঠা ৩২

ফিকহে হানাফীর 'আদ-দুররুল মুখতার' গ্রন্থে রয়েছে,

(وَإِنْ) أَنْكَرَ بَعْضَ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً (كَفَرَ بِهَا) كَقَوْلِهِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ.

'কেউ যদি জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো কিছু অস্বীকার করে, তাহলে কাফের হয়ে যাবে। যেমন : আল্লাহ তাআলাকে দেহসমূহের মতো দেহবিশিষ্ট বলা।'

'ফাতাওয়া শামী'তে আরও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে,

(قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ: جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ) وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْ كَالْأَجْسَامِ.

'এভাবে কেউ যদি আল্লাহ তাআলাকে (দেহসমূহের মতো না বলে, বরং শুধু) দেহবিশিষ্ট বলে, তাও কাফের হয়ে যাবে।'

মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রাহ. 'খুলাসা' গ্রন্থ থেকে নকল করে বলেন,

وَالْمُشَبِّهِ إِذَا قَالَ: لَهُ تَعَالَى يَدٌ وَرِجْلٌ كَمَا لِلْعِبَادِ: فَهُوَ كَافِرٌ مَلْعُونٌ. وَإِنْ قَالَ: جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ: فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا إِطْلَاقُ لَفْظِ الْجِسْمِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُوهِمٌ لِلنَّقْصِ فَرَفَعَهُ بِقَوْلِهِ: لَا كَالْأَجْسَامِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مُجَرَّدُ الْإِطْلَاقِ، وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ تَنْتَهِضُ سَبَبًا لِلْعِقَابِ لِمَا قُلْنَا مِنَ الْإِيهَامِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ عَلَى التَّشْبِيهِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ. وَقِيلَ: يُكَفَّرُ بِمُجَرَّدِ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا، وَهُوَ حَسَنٌ، بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالتَّكْفِيرِ.

'সাদৃশ্যবাদী যদি বলে, আল্লাহ তাআলার হাত ও পা আছে বান্দার মতো, তাহলে সে অভিশপ্ত কাফের। আর যদি বলে, আল্লাহ তাআলা দেহবিশিষ্ট, তবে অন্য দেহসমূহের মতো নয়, তাহলে সে বিদআতী।'[৪৩৩]

ফকীহ ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী রাহ. (মৃ. ৯৭০ হি.) বলেন,

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَكْفُرُ فِي لَفْظَيْنِ: هُوَ جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ، هُوَ جِسْمٌ، وَيَصِيرُ مُبْتَدِعًا فِي الثَّالِثِ هُوَ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ.

সারকথা : 'দুইভাবে বললে কাফের হয়ে যাবে : ১. আল্লাহ তাআলাকে দেহসমূহের মতো দেহবিশিষ্ট বলা, ২. তাঁকে শুধু দেহবিশিষ্ট বলা।

আর যদি বলে, আল্লাহ তাআলা দেহবিশিষ্ট, তবে অন্য দেহসমূহের মতো নয়, তাহলে সে বিদআতী।'[৪৩৪]

ঈমান ভঙ্গের বিশতম কারণ

আল্লাহ তাআলাকে কোনো স্থানে বা আসমানে কিংবা আরশে অবস্থানকারী মনে করা।

---

৪৩৩. ফাতহুল কাদীর, ১/৩৫০

৪৩৪. আল-বাহরুর রায়েক, ১/৬১২

CamScanner

ফকীহ ইবনে নুজাইম মিসরী রাহ. (মৃ. ৯৭০ হি.) বলেন,

وَيَكْفُرُ... بِإِثْبَاتِ الْمَكَانِ للهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَالَ: اللهُ فِي السَّمَاءِ، فَإِنْ قَصَدَ حِكَايَةَ مَا جَاءَ فِي ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ: لَا يَكْفُرُ، وَإِنْ أَرَادَ الْمَكَانَ: كَفَرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ: كَفَرَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

'আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্ত করার দ্বারা কাফের হয়ে যাবে। অবশ্য কেউ যদি বলে, "আল্লাহ আসমানে" কথা দ্বারা সে কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনাকে উদ্ধৃত করতে চায়, তাহলে সে কাফের হবে না।

তবে যদি সে (আল্লাহ তাআলা) স্থানে আছেন বলে উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। এমনকি তার যদি কোনোরূপ নিয়তই না থাকে, তাহলেও অধিকাংশের দৃষ্টিতে সে কাফের হয়ে যাবে। এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত এবং এর ওপরই ফতোয়া।'[৪৩৫]

'ফাতাওয়া শামী' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِأَهْلِ الْبِدَعِ) عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِلْكَرَّامِيَّةِ. إلخ. فَالْمُرَادُ هُنَا بِالْبِدَعِ الْمُكَفِّرَاتُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَالْكَرَّامِيَّةِ) فِرْقَةٌ مِنَ الْمُشَبِّهَةِ نُسِبَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَى أَنَّ مَعْبُودَهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتِقْرَارٌ، وَأَطْلَقَ اسْمَ الْجَوْهَرِ عَلَيْهِ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُ الْمُبْطِلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

মূলকথা, 'বিদআতীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে যাকাত প্রদান করা জায়েয নেই, যেমন : সাদৃশ্যবাদী কাররামিয়্যা ফেরকা। তাদের প্রধান বলেছে, "তার মাবুদ আরশের ওপর অবস্থানকারী"। আল্লাহ তাআলা বাতিলপন্থীদের এ-জাতীয় কথা থেকে পবিত্র।'

হানাফী ফকীহ মাহমুদ বিন মাযাহ বুখারী রাহ. (মৃ. ৬১৬ হি.) বলেন,

روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: يكره للرجل أن يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك يروى هذا اللفظ بروايتين: بمعقد العز من عرشك عن العقد، وبمقعد العز من عرشك من القعود، فبالرواية الثانية لا شك في الكراهة؛ لأنه وصف الله تعالى بما لا يليق به، وهو القعود والتمكن على العرش، وهو قول المجسمة.

সারাংশ : 'আল্লাহ তাআলাকে আরশের ওপর বসা ও অবস্থান করার কথা দেহবাদীরা বলে।'[৪৩৬]

আল্লামা আইনী রাহ. (মৃ. ৮৫৫ হি.) 'আল-বিনায়া' গ্রন্থে লেখেন,

৪৩৫. আল-বাহরুর রায়েক, ৫/২০২-২০৩; ফাতাওয়া আলমগীরী, ২/২৭২
৪৩৬. আল-মুহীতুল বুরহানী, ৫/৩১২

وهو التمكن على العرش، وذلك قول المجسمة وهو باطل.

'দেহবাদীরা আল্লাহ্ তাআলাকে আরশের ওপর অবস্থান করার কথা বলে, যা বাতিল বক্তব্য।'

আল্লামা আবদুল হাই লাখনাভী রাহ. (মৃ. ১৩০৪ হি.) বলেন,

لِأَنَّهُ وصف الله (تَعَالَى) بِمَا هُوَ بَاطِل، وَهُوَ الْقعُود على الْعَرْش، وَهُوَ قَول المجسمة.

'আল্লাহ্ তাআলাকে একটা বাতিল গুণে গুণান্বিত করা হচ্ছে আরশের ওপর উপবিষ্ট বলা। আর এটা দেহবাদীদের বক্তব্য।'[৪৩৭]

হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রাহ. (মৃ. ১৩৯৪ হি.) বলেন,

فتلخص من هذا التفصيل أن أسباب الشرك متعددة: الأول... والرابع: اعتقاد كون الله تعالى جسما، وفي مكان.

'শিরকের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে চতুর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলাকে দেহবিশিষ্ট হওয়ার এবং কোনো স্থানে থাকার আকীদা রাখা।'[৪৩৮]

ঈমান ভঙ্গের একুশতম কারণ

আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে বা নবীকে 'আলেমুল গায়ব' বা সরাসরি 'গায়ব জানেন' বিশ্বাস করা অথবা 'হাযির-নাযির' মনে করা।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

'বলুন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ গায়ব জানে না।'[৪৩৯]

উল্লেখ্য, আল্লাহ্ তাআলা নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন, ওহীর মাধ্যমে বিভিন্ন গায়বী বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন।[৪৪০]

আর গায়বী খবরাখবর সর্বাপেক্ষা বেশি জানানো হয়েছিল আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গায়বের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। সরাসরি গায়বী জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ তাআলারই আছে। সুতরাং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে 'গায়ব জানেন' বা 'আলেমুল গায়ব' বলা যায় না।

আকীদার প্রসিদ্ধ ইমাম তাফতাযানী আশআরী রাহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেন,

---

৪৩৭. আন-নাফিউল কাবীর, পৃষ্ঠা ৪৮২

৪৩৮. ইমদাদুল আহকাম, ১/১২৮, টীকায়

৪৩৯. সূরা নামল, (২৭) : ৬৫

৪৪০. সূরা জিন, ২৬-২৭; সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৭৯

CamScanner

وَبِالْجُمْلَةِ: الْعِلْم بِالْغَيْب أَمْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ الله تَعَالَى، لاسَبِيْلَ إِلَيْه لِلْعِبَاد إِلَّا بِإِعْلَامٍ مِنْهُ، أَوْ إِلْهَامٍ بِطَرِيْقِ الْمُعْجِزَة أَوِ الْكَرَامَة.

'মোটকথা, 'ইলমুল গায়ব' বা গায়ব জানা আল্লাহ তাআলার একক বিষয়। তাতে বান্দার কোনো সুযোগ নেই, তবে আল্লাহ তাআলা তা কাউকে জানালে এবং মু'জিযা হিসেবে (নবীগণকে) ও কারামত হিসেবে (ওলীগণকে) অবহিত করলে তাঁরা জানতে পারেন।'[৪৪১]

প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَمَنْ دُونَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنَ الْغَيْبِ، إِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللهُ، إِذْ لَوْ كَانَ الْخَضِرُ يَعْلَمُ كُلَّ غَيْبٍ: لَعَرَفَ مُوسَى قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ.

'(মুসা আ. ও খাযিরের মাঝে সংঘটিত ঘটনার মধ্যে) এ কথার দলীল রয়েছে যে, নবীগণ ও অন্য কেউ গায়বী বিষয় জানেন না। তবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা জানাতেন, তা ছাড়া।'[৪৪২]

মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম মাতুরীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) লেখেন,

وكذا علم المغيبات إلا ما أعلمه الله تعالى به أحيانا، وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؛ لمعارضته قوله تعالى: قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ.

'এভাবে (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়বী বিষয় জানতেন না। তবে কখনো আল্লাহ তাআলা যা অবহিত করতেন, তা ছাড়া। হানাফীগণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ব জানার আকীদা রাখলে কাফের হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কেননা, তা আল্লাহ তাআলার কালাম "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়ব জানে না"-এর সাথে সাংঘর্ষিক।'[৪৪৩]

এভাবে মোল্লা আলী কারী মাতুরীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন,

إن الأنبياء لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما أعلمهم الله أحيانا، وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب...

'নবীগণ গায়বী বিষয় জানতেন না। তবে কখনো আল্লাহ তাআলা তাঁদের যা অবহিত করতেন, তা ছাড়া। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ব জানার আকীদা

---

৪৪১. শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৬৪
৪৪২. ফাতহুল বারী, ১/২২০
৪৪৩. আল-মুসায়ারাহ, পৃষ্ঠা ১৯৮

পোষণ করার কারণে হানাফীগণ সুস্পষ্টভাবে তাকফীর করেছেন।'[888]

প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম কাযী খান হানাফী রাহ. (মৃ. ৫৯২ হি.) বলেন,

رجل تزوج امرأة بغير شهود، فقال الرجل والمرأة:)خدائرا وبيغامبر مرا كواه كرويم(قالوا: يكون كفرا، لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهو ما كان يعلم الغيب حين كان في الأحياء، فكيف بعد الموت؟

'কোনো পুরুষ ও মহিলা যদি সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করে আর বলে, আল্লাহ ও রাসূলকে সাক্ষী করলাম, তাহলে ইমামগণের মতে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, তারা বিশ্বাস করেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ব জানতেন। অথচ যিনি জীবদ্দশায় (আল্লাহ অবহিত করা ব্যতীত) গায়ব জানতেন না, তিনি মৃত্যুর পর কীভাবে জানবেন?'[৪৪৫]

উল্লেখ্য, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ও ফাতাওয়া শামীতে যদিও এভাবে সাক্ষ্য রেখে বিবাহ করলে কাফের হওয়ার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে ব্যাখ্যার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, নবীগণকে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা বা অন্য কোনো মাধ্যমে এবং ওলীগণকেও বিভিন্ন মাধ্যমে কিছু গায়বী বিষয় অবহিত করেন। সুতরাং কেউ বা কোনো নবী সমস্ত গায়বী বিষয় জানতে পারেন না এবং মাধ্যম ছাড়া কোনো গায়বী বিষয় জানতে পারেন না।

আর কোনো মাধ্যম দিয়ে গায়বী বিষয় জানাকে মূলত 'গায়ব জানা' বলে না; বরং 'কোনো মাধ্যমে গায়বী বিষয়ে অবহিত হওয়া' বলে। তাই কুরআনের দুই জায়গায় (সূরা জিন ২৬ ও সূরা আলে ইমরান ১৭৯)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ... عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا...

এবং এর তাফসীরে ইমাম কুরতুবী, ইবনে কাসীর ও ইবনে আবেদীন শামী রাহ.-সহ অনেকে এর জন্য শব্দ ব্যবহার করেছেন الاطِّلَاع عَلَى بَعْض الْمُغَيَّبَات। তথা কিছু গায়বী বিষয়ে অবহিত-অবগত হওয়া, 'গায়ব জানা' নয়।

এ কারণেই কুরআনে কারীমে গায়ব জানার কথা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা ওপরে উল্লেখ হয়েছে। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামকে উম্মতকে জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে যে, তিনি গায়ব জানেন না।

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

৪৪৪. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ২৫৩

৪৪৫. দেখুন, ফাতাওয়া কাযী খান, ৯/৪২৮, ৭/২০৩; আল-বাহরুর রায়েক, ৩/১৫৫

'(হে নবী) আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার রয়েছে। এবং আমি গায়ব জানি না।'[৪৪৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

'(নবী আপনি বলুন,)... আর আমি যদি গায়ব জানতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম এবং কোনো রকম কষ্ট আমাকে স্পর্শ করত না।'[৪৪৭]

'ফাতাওয়া শামী' গ্রন্থে রয়েছে,

مَطْلَبٌ فِي دَعْوَى عِلْمِ الْغَيْبِ، قُلْتُ: وَحَاصِلُهُ أَنَّ دَعْوَى عِلْمِ الْغَيْبِ مُعَارِضَةٌ لِنَصِّ الْقُرْآنِ فَيَكْفُرُ بِهَا، إِلَّا إِذَا أُسْنِدَ ذَلِكَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً إِلَى سَبَبٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى كَوَحْيٍ أَوْ إِلْهَامٍ.

'গায়ব জানার দাবি সম্পর্কে আলোচনা। ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (মৃ. ১২৫২ হি.) বলেন, এ বিষয়ে সারকথা হচ্ছে, গায়ব জানার দাবি করা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। কাজেই এমন দাবির কারণে কাফের হয়ে যাবে।

তবে যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত দাবি করা হয়—সুস্পষ্টভাবে হোক বা অবস্থার প্রেক্ষিতে বোঝা যায় এমন হোক—তাহলে কাফের হবে না।'

ইবনে আবেদীন শামী রাহ. তাঁর سل الحسام الهندي নামক রিসালায় লেখেন,

فلا يعلم الغيب إلا هو، وما سواه إن علموا جزئيات منه فهو بإعلامه واطلاعه لهم، وحينئذ لا يطلق أنهم يعلمون الغيب؛ إذ لا صفة لهم يقتدرون بها على الاستقلال بعلمه.

'তিনি (আল্লাহ) ছাড়া আর কেউ গায়ব জানে না। তিনি ছাড়া অন্যরা যদি কিছু গায়বী বিষয় জানে, তাও তিনি অবহিত করার কারণে জানতে পারে। কাজেই অন্যরা গায়ব জানে এ কথা বলা যাবে না। কেননা, এটা তাদের কোনো গুণ নয়, যেহেতু তারা গায়বী বিষয় সরাসরি জানতে পারে না।'[৪৪৮]

সুতরাং কুরআনে কারীমের নির্দেশনা এবং আকীদা ও ফাতাওয়ার কিতাবের ভাষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, গায়ব জানার গুণটি একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য নির্ধারিত, তিনিই শুধু গায়ব জানেন।

এ কারণেই প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা মাহমুদ আলূসী হানাফী রাহ. (মৃ. ১২৭০ হি.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা যদিও গায়বী বিষয়ে অন্যকে অবহিত করেন, তবে

৪৪৬. সূরা আনআম, (৬) : ৫০
৪৪৭. সূরা আরাফ, (৭) : ১৮৮
৪৪৮. দ্র. ফাতাওয়া শামী, ৪/২৪৩, দারুল ফিকর; মাজমুআ রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ২/৩১৩

উক্ত অর্থে কারও ব্যাপারে عَلِم فلانٌ الغيبَ 'অমুক গায়ব জানেন' বলা কোনোভাবেই সঠিক নয়। কেননা, তা কুরআনের আয়াত 'আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়ব জানে না'-এর সাথে বাহ্যিকভাবে সাংঘর্ষিক।'[৪৪৯]

অধমের জানা মতেও কুরআনের কোনো আয়াত ও সহীহ হাদীসে নবীর জন্য 'ইলম' শব্দ ব্যবহার করে গায়ব জানার কথা বলা হয়নি।

তা ছাড়া 'গায়ব জানা' নবীগণের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যও নয়; বরং যারা এটাকে নবীগণের বৈশিষ্ট্য বলেছে, তাদের ওপর রদ করা হয়েছে। ইমাম ইজী আশআরী রাহ. (মৃ. ৭৫৬ হি.) ও ইমাম জুরজানী মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৮১৬ হি.) বলেন,

(وأما الفلاسفة فقالوا: هو) أي النبي (من اجتمع فيه خواص ثلاث) يمتاز بها عن غيره (إحداها: أن يكون له اطلاع على المغيبات)... (قلنا:) ما ذكرتم (مردود) بوجوه؛ (إذ الاطلاع على جميع المغيبات لا يجب للنبي اتفاقا) منا ومنكم، ولهذا قال سيد الأنبياء: وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ (والبعض) أي: الاطلاع على البعض (لا يختص به) أي بالنبي.

'ফালাসিফারা বলেছে, নবী হলো যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য একত্র হবে। তন্মধ্যে একটি হলো, গায়বের ব্যাপারে অবগত থাকা। আমরা বলি, এই শর্ত মারদূদ তথা প্রত্যাখ্যাত। কারণ, 'গায়বের ব্যাপারে অবগত থাকা' থেকে যদি 'কুল' গায়ব উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটি সকলের মতেই নবীর জন্য আবশ্যক নয়। আর যদি উদ্দেশ্য হয় 'কিছু' গায়ব, তাহলে এটা নবীর জন্য নির্দিষ্ট নয়।'[৪৫০] কারণ, অন্যরাও 'কিছু' গায়বের ব্যাপারে অবগত হয়; তবে নবী সবচয়ে বেশি অবগত ছিলেন।

সুতরাং গায়ব জানা-না জানার সাথে নবীগণের কোনো বিশেষত্ব প্রমাণ করে না।

তাই হাজার বছর ধরে গ্রহণযোগ্য আকীদার কিতাবসমূহে অথবা অন্য কোনো কিতাবে নবী সম্পর্কে আকীদা রাখার বিষয় হিসেবে 'নবী গায়ব জানেন' এমন কোনো আকীদা বা পরিভাষা স্থান পায়নি।

সুতরাং 'নবী গায়ব জানেন' এমন আকীদা বা পরিভাষাটা কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং আকীদা ও ফাতাওয়ার কিতাবের ভাষ্য সমর্থন করে না। কাজেই এটা আহলুস সুন্নাহর খেলাফ বেরেলভীদের নতুন বানানো আকীদা বা পরিভাষা।[৪৫১]

তবে হ্যাঁ, 'নবী গায়ব জানেন' বলার কারণে কাউকে কাফের বলা যাবে না; বরং তার উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা দেখতে হবে, যা 'ফাতাওয়া শামী'র বক্তব্যেও উল্লেখ হয়েছে।

---

৪৪৯. দেখুন, রুহুল মাআনী, সূরা নামলের ৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়

৪৫০. শারহুল মাওয়াকিফ ৮/২১৮, ২১৯

৪৫১. আরও দেখুন, ইনআমুল বারী, তাকী উসমানী, ১/৫৭১

CS CamScanner

পরিশেষে বেরেলভী বন্ধুদের প্রতি প্রশ্ন রইল, নবীগণ যেভাবে গায়বী বিষয়ে অবহিত হন, তেমনইভাবে ওলীগণও অবহিত হন। তাহলে ওলীদের বাদ দিয়ে শুধু 'নবী গায়ব জানেন' এই কথা বলা হয় কেন?

ঈমান ভঙ্গের বাইশতম কারণ

খতমে নবুওয়াত তথা আমাদের নবীকে শেষ নবী না মানা। কেননা, তাঁর পর কোনো প্রকারের কোনো ধরনের কোনো রকমের নতুন নবীর আগমন হবে না বা জন্মগ্রহণ করবেন না। ইরশাদ হয়েছে,

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো সাবালক পুরুষের পিতা নন, তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।'[৪৫২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: ...وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ.

'অন্যান্য নবী থেকে আমাকে ছয়টি বিষয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। (তন্মধ্যে পাঁচ ও ছয় নম্বর হলো,) আমি সকল মাখলূকের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমার দ্বারা নবীদের আগমন সমাপ্ত করা হয়েছে।'[৪৫৩]

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ، فَلاَ رَسُولَ بَعْدِي وَلاَ نَبِيَّ.

'রিসালত ও নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। আমার পরে কোনো রাসূল নেই এবং কোনো নবীও নেই।'[৪৫৪]

তাঁর পরে যারা নবী হওয়ার দাবি করবে, তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي.

'নিশ্চয় আমার উম্মতের মাঝে ৩০ জন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকে দাবি করবে, সে নবী। অথচ আমি খাতামুন নাবিয়্যীন, আমার পরে কোনো নবী নেই।'[৪৫৫]

ইমাম আযম আবু হানীফা রাহ. (৮০-১৫০ হি.)-এর যুগে এক লোক নবুওয়াতের

---

৪৫২. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৪০
৪৫৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৩
৪৫৪. তিরমিযী, হাদীস নং ২২৭২, হাদীসটি সহীহ; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৪
৪৫৫. তিরমিযী, হাদীস নং ২২১৯, হাদীসটি সহীহ; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৫২

CamScanner

দাবি করে বলেছিল, 'আমাকে সুযোগ দাও, আমি তোমাদের মু'জিযা দেখাব।'

তখন ইমাম আবু হানীফা রাহ. ফতোয়া দিয়েছিলেন, 'যে কেউ তার থেকে মু'জিযা তলব করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমার পরে কোনো নবী নেই।"'[৪৫৬]

মোল্লা আলী কারী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন,

ودعوى النبوة بعد نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كفر بالإجماع.

'আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কেউ নবী হওয়ার দাবি করলে উম্মতের ঐকমত্যে সে কাফের।'[৪৫৭]

সুতরাং কারও জন্য নবী বা রাসূল কিংবা উম্মতী নবী, শরীয়তবিহীন নবী, যিল্লী নবী, বুরুযী নবী, প্রতিচ্ছবি নবী—এ-জাতীয় বা অন্য কোনো ধরনের কোনো রকমের নবী হওয়ার সুযোগ নেই।

অথচ কথিত 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত' তথা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী লিখেছে, 'আমি ওই খোদার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই আমার নাম "নবী" রেখেছেন।'[৪৫৮]

অন্যত্র লিখেছে, 'প্রকৃত সত্য খোদা তিনিই, যিনি কাদিয়ানে তাঁর রাসূল পাঠিয়েছেন।'[৪৫৯]

সে আরও বলেছে, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের পরম বিকাশস্থল। অর্থাৎ আমি প্রতিচ্ছায়ারূপে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'[৪৬০]

অন্যত্র লিখেছে, 'বুরুযীভাবে আমিই খাতামুল আম্বিয়া।... আর যেহেতু আমি যিল্লীভাবে (প্রতিবিম্বস্বরূপ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুতরাং খাতামুন্নাবিয়্যীনের মোহর ভাঙেনি। কারণ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রইল। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নবী রইলেন, অন্য কেউ নয়। অর্থাৎ আমি যেহেতু বুরুযীভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বুরুযীভাবে নবুওয়াতে মুহাম্মাদী-সহ সকল মুহাম্মাদী গুণ ও বৈশিষ্ট্য আমার

---

৪৫৬. মানাকিবে আবী হানীফা, মুওয়াফফাক মাক্কী (মৃ. ৫৬৮ হি.), ১/১৬১

৪৫৭. দ্র. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ২৭৪

৪৫৮. হাকীকাতুল ওহীর পরিশিষ্ট, রূহানী খাযায়েন, ২২/৫০৩, ১২ নং লাইন

৪৫৯. রূহানী খাযায়েন, ১৮/২৩১; বাংলা দাফেউল বালা, পৃষ্ঠা ১২, তাদের ঢাকা বকশীবাজারস্থ কেন্দ্র থেকে জুলাই ২০১০ সালে প্রকাশিত

৪৬০. বাংলা হাকীকাতুল ওহীর টীকা, পৃষ্ঠা ৬২; রূহানী খাযায়েন, ২২/৭৬, টীকার চার নং লাইন

CamScanner

যিল্লিয়তের আয়নায় প্রতিবিম্বিত, তাহলে এখানে আলাদা কোনো ব্যক্তি কোথায়, যে আলাদা নবুওয়াতের দাবি করেছে?'[৪৬১]

সতর্কতা কাম্য

মির্যা কাদিয়ানী প্রথম দিকে নবুওয়াত দাবিকে অস্বীকার করত, এমনকি একে কুফর বলেও আখ্যায়িত করত। এ জন্য মির্যার অনুসারীরা অনেক সময় সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য তার ওই সময়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করে থাকে, যাতে সে সরাসরি নবুওয়াত দাবিকে কুফর বলেছে অথবা রাসূলকে খাতামুল আম্বিয়া বলেছে। যেমনটি তাদের লিফলেটের শুরুতে থাকে। কিন্তু তাদের এই প্রতারণা স্পষ্ট হবে, যদি স্বয়ং মির্যার শেষ দিকের বক্তব্য সামনে থাকে।

আর তার পুত্র ও তাদের দ্বিতীয় খলীফা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদের বক্তব্যও এ বিষয়ে এতই স্পষ্ট যে, কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। (দ্র. তার হাকীকাতুন নবুওয়াহ গ্রন্থটি) যেমন সে লিখেছে, 'যে সকল গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় তিনি নিজে নবী হওয়ার অস্বীকার করেছেন এবং নিজের নবুওয়াতকে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ও ছায়া বলে দাবি করেছেন, এগুলো সবই ১৯০১ ঈসায়ীর পূর্বের।'[৪৬২]

এর এক পৃষ্ঠা পর বলেছে, '১৯০১ সনের পূর্বের যে সকল সূত্রে তিনি নবী হওয়াকে অস্বীকার করেছেন, তার সবই এখন রহিত হয়ে গেছে এবং সেগুলো থেকে এখন প্রমাণ দেওয়া ভুল।'[৪৬৩]

কাজেই মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীরা কাফের।

ঈসা আ.-এর অবতরণ কি খতমে নবুওয়াত আকীদা-বিরোধী?

কুরআন-হাদীসমতে ও সকলের ঐকমত্যে কিয়ামতের আগে হযরত ঈসা আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটা তো খতমে নবুওয়াত (তথা আমাদের নবীর পর আর কোনো নবী নেই) আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক ও এর বিরোধী।

উত্তর :

আল্লামা যামাখশারী (মৃ. ৫৩৮ হি.) 'তাফসীরে কাশশাফে' ও অনেক মুফাসসির স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতের 'খাতামান নাবিয়্যীন'-এর

---

৪৬১. একটি ভুল সংশোধন, পৃষ্ঠা ১০; রূহানী খাযায়েন, ১৮/২১২, ছয় নং লাইন

৪৬২. দ্র. আনওয়ারুল উলূম, ২/৪৪৪, প্রথম লাইন

৪৬৩. আনওয়ারুল উলূম, ২/৪৪৫। সবিস্তারে জানতে দেখুন ইত্তিহাদ থেকে প্রকাশিত অধমের 'কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলি কেন?' বইটি। এতে কাদিয়ানীদের রচিত বইপত্র থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে তাদের কুফরী বক্তব্য ও বিশ্বাস তুলে ধরা হয়েছে, সাথে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হয়েছে।

CS CamScanner

ব্যাখ্যায় প্রশ্নটির উত্তরে লিখেছেন,

معنى كونه آخر الأنبياء: أنه لا ينبأ أحد بعده، وعيسى ممَّن نُبِّئ قبله.

'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাঁর পরে আর কোনো ব্যক্তিকে নতুনভাবে নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত করা হবে না। আর হযরত ঈসা আ. ওই সকল নবীগণের একজন, যারা তাঁর পূর্বে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) لا نبيّ بعدي তথা 'আমার পরে কোনো নবী নেই' হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন,

وثبت أنه – عيسى بن مريم – ينزل إلى الأرض في آخر الزمان، فوجب حمل النفي على إنشاء النبوّة لأحد من الناس، لا على نفي وجود نبي كان قد نُبِّئ قبل ذلك.

'হযরত ঈসা আ. শেষ সময়ে জমিনে অবতরণ করবেন। কাজেই "আমার পরে কোনো নবী নেই" হাদীসটির মর্ম হচ্ছে, তাঁর পরে আর কাউকে নবী বানানো হবে না। সুতরাং উক্ত হাদীসে তাঁর পূর্বে নবুওয়াতপ্রাপ্ত এমন নবী আসাটা (জমিনে অবতরণ) নাকচ করা হয়নি।'[৪৬৪]

ঈমান ভঙ্গের তেইশতম কারণ

ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিত থাকা ও অবতরণ অস্বীকার করা।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর গুরুত্বপূর্ণ একটি আকীদা হলো, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বড় আলামত হিসেবে কানা দাজ্জাল বের হলে তাকে কতল করার জন্য হযরত ঈসা আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন। কুরআন মাজীদের অনেক আয়াত ও ১১৬টি হাদীস দ্বারা ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিত থাকা ও কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে অবতরণ করাটা প্রমাণিত এবং এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত।[৪৬৫]

কিন্তু মির্যা কাদিয়ানী বলেছে, 'ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন; তিনি আর আসবেন না এবং আমিই হলাম ঈসা।'

সে আরও বলেছে, 'ঈসা মরেনি বলা বড় ধরনের শিরক।'[৪৬৬]

---

৪৬৪. আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবা, ২/২৫৮

৪৬৫. দ্র. আত-তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফী নুযুলিল মাসীহ, কাশ্মীরী; যার অনুবাদ ও সংযোজনসহ কিতাব হচ্ছে, আলামতে কিয়ামত আওর নুযুলে মাসীহ, রফী উসমানী; তুহফায়ে কাদিয়ানিয়্যাত, ইউসুফ লুধিয়ানবী, ১ম খণ্ড

৪৬৬. দ্র. রূহানী খাযায়েন, ১৯/৭৫; ২১/৪০৬-৪০৭; ২২/৬৬০; ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন ও তাদের লিফলেট।

CamScanner

সুতরাং মির্যা কাদিয়ানী ও তার অনুসারীসহ যে কেউ ইসলামের এ অকাট্য আকীদা জানার পরও অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।[৪৬৭]

ঈমান ভঙ্গের চব্বিশতম কারণ

সেকুলার হওয়া বা সেকুলারিজমে বিশ্বাসী হওয়া।

সেকুলারিজম মতবাদে একজন ব্যক্তিকে সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্র, বিচার, শিক্ষা, অর্থ ও সংস্কৃতি প্রভৃতিতে ধর্মের ঊর্ধ্বে মনে করা হয় বা এগুলোতে ধর্মের বিধান নেই মনে করা হয়, যা নিঃসন্দেহে কুফর।

সুতরাং কোনো মুসলিম সেকুলার তথা সেকুলারিজমে বিশ্বাসী হতে পারে না এবং কোনো সেকুলার মুসলিম থাকতে পারে না।

সেকুলারিজম কী ও কেন?

সেকুলারিজমের তিনটি বাংলা অনুবাদ হতে পারে। যথা :

১. ইহজাগতিকতাবাদ।

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

৩. ধর্মহীনতা বা ধর্মহীন মতবাদ।

১. ব্যাখ্যা : 'ইহজাগতিকতাবাদ' এটাই সেকুলারিজমের সঠিক অনুবাদ। Secularism ল্যাটিন শব্দ Saculum শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে। Saeculum শব্দের অর্থ ইহজগৎ। এ মতবাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও কার্যকলাপ ইহজগৎ-কেন্দ্রিক। কেননা, সেকুলারিজম শুধু ইহজগৎ স্বীকার করে আর পরজগৎকে অস্বীকার করে। সুতরাং Secularism-এর সঠিক অনুবাদ হবে ইহজাগতিকতাবাদ।

বাংলা একাডেমির ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারি ২০১২ সংস্করণে সেকুলার শব্দের অর্থ করা হয়েছে, 'পার্থিব, ইহজাগতিক, জড়, জাগতিক'।

২. ব্যাখ্যা : 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' মানে কোনো ধর্মের পক্ষে নয়। কেননা, 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ কোনো পক্ষে নয়। কাজেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ কোনো ধর্মের পক্ষে নয়। অর্থাৎ সকল ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন। বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে রয়েছে, 'ধর্মনিরপেক্ষ : ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন, secular।'

তা ছাড়া 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের মধ্যে 'নির' প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে। 'নির'-এর অর্থ 'নেই'। অর্থাৎ কোনো ধর্মের পক্ষে নেই, যেভাবে দলনিরপেক্ষ অর্থ কোনো দলের পক্ষে নেই। অথবা 'নির'-এর অর্থ ধর্মের 'অপেক্ষা' নেই যার। বাংলা একাডেমির

৪৬৭. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ইউসুফ লুধিয়ানবী, ২/১৯৬

অভিধানে 'অপেক্ষার' এক অর্থ করা হয়েছে ভরসা-নির্ভরতা। অর্থাৎ যার ধর্মের ওপর ভরসা বা নির্ভরতা নেই, সে-ই হলো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

সুতরাং যে ব্যক্তি আকীদা-বিশ্বাসে, চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায়, কার্যকলাপে ও জীবনের সব ক্ষেত্রে ধর্মের পক্ষে অবস্থান করল, সে হলো ধর্মের পক্ষের লোক। আর যে ব্যক্তি এমন হবে না, সে হলো সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ।

কাজেই সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, কোনো ধর্মের পক্ষেও নয়; বরং সকল ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন।

৩. ব্যাখ্যা : ধর্মহীনতা বা ধর্মহীন মতবাদ।

যেহেতু এ মতবাদের লোক জীবনের সব ক্ষেত্রে ধর্মের পক্ষের নয় বা ধর্মের ওপর ভরসা নেই কিংবা সকল ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন, তাই এ মতবাদ হলো ধর্মহীন মতবাদ।

এ জন্যই সেকুলারিজমের আরবী 'আলমানিয়্যাহ' শব্দের অনুবাদ করা হয়, 'লা-দীনিয়্যাহ' অর্থাৎ ধর্মহীনতা।

আরবীতে সেকুলারিজমের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে,

فصل الدين عن الدولة والحياة.

অর্থাৎ 'ধর্মকে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।'

তবে কেউ কেউ সহনীয় করতে গিয়ে সেকুলারিজমের সংজ্ঞায় বলেছেন,

فصل الدين عن السياسة.

'রাষ্ট্র-রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা।'

বাংলা একাডেমির ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারিতে সেকুলারিজম মানে লেখা হয়েছে, 'নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয় এই মতবাদ।'

উইকিপিডিয়াতে সেকুলারিজমের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে,

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে সাধারণত রাষ্ট্র আর ধর্মকে পৃথকরূপে প্রকাশ করাকে বোঝায়। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতির বাইরে থেকে পরিচালনা করাকে বোঝানো হয়। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের ওপর নির্ভরশীল থাকে না।... ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো তথ্য এবং প্রমাণের ওপর নির্ভর করবে, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর নয়।'

অর্থাৎ রাষ্ট্র তার সিদ্ধান্ত নেবে যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে। কোনো ধর্মবিশ্বাসের ওপর নয়। এর অর্থ হলো, আপনি ব্যক্তিজীবনে ধার্মিক, রাষ্ট্র ও

রাজনৈতিক জীবনে ধর্মহীন। আপনার ধর্ম কেবলই আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ। আপনার রাজনীতি-অর্থনীতি ইত্যাদিতে ধর্মের উপস্থিতি থাকতে পারবে না।

Oxford Dictionary-তে Secularism-এর সংজ্ঞা :

Secularism means the doctrine- morality should be based solely on regard to the wellbeing of mankind in the present life, to exclusion of all consideration drawn from belief in God or in future life.

'সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদে মানবজাতির ইহজগতের কল্যাণ-চিন্তার ওপর গড়ে উঠবে এমন এক নৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে থাকবে না কোনো ধরনের আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসভিত্তিক বিবেচনা।'

Encyclopedia বা বিশ্বকোষে Secularism-এর নিম্নরূপ দুটো সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

১. Secular spirit or tendency especially a system of political or social philosophy that rejects all forms of religious faith.

'ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এমন একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন, যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে।'

২. The view that public education and other matters of civil society conducted without the introduction of Religious element.

'সেকুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক সংস্থা পরিচালনায় কোনো ধরনের ধর্মীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত হবে না।'[৪৬৮]

Chambers dictionary-এর মতে সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা হলো :

The belief that the state, morals education should be independent of religion.

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো এমন এক বিশ্বাস, যাতে রাষ্ট্র, নৈতিকতা, শিক্ষা ইত্যাদি

---

৪৬৮. Random House Dictionary of English Language (College Edition, New york - ১৯৬৮) গ্রন্থে Secularism-এর তিনটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

১. Not regarded as religious & spiritually sacred.
সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ, যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।

২. Not partaining to or connected with any religion.
এ মতবাদ কোনোভাবেই ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

৩. Not belonging to a religious order.
এ মতবাদ ধর্মীয় আইনকানুন-বহির্ভূত একটি ব্যবস্থা। দ্র. ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান?, অধ্যাপক ফজলুর রহমান।

CamScanner

সবকিছু ধর্মমুক্ত থাকবে।'

ক্যামব্রিজ ডিকশনারিতে এসেছে :

The belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of a country.

'সেকুলারিজম এমন এক বিশ্বাস, যেখানে দেশের সাধারণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে ধর্ম জড়িত হওয়া উচিত নয়।'

উল্লিখিত সেকুলারিজমের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাগুলো মুসলমানদের নয়; বরং যারা সেকুলারিজমকে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের সংবিধানে স্থান দিয়েছে, তাদের কর্তৃক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ও যোগ্য ব্যক্তিরাই সেকুলারিজমের এই সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং সেকুলারিজম যে বাস্তবেই لا دينية (ধর্মহীনতা)—এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় না।

অথচ সভা-সমাবেশ ও টকশোতে কিছু রাজনৈতিক নেতা ও সুশীল বলে বেড়ায়, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়; বরং ধর্ম পালনের স্বাধীনতা।'

উল্লেখ্য, কেউ যদি 'ধর্ম পালনের স্বাধীনতা' ব্যাখ্যায় সেকুলারিজমে বিশ্বাসী হয়, তাহলে ঈমান ভঙ্গের কারণ হবে না। কিন্তু এর অর্থ হলো, সে প্রকৃতপক্ষে সেকুলারিজমেই বিশ্বাসী হলো না। কেননা, সেকুলারিজমের এ দেশীয় ব্যাখ্যাটা আপনার/আপনাদের বানানো, সেকুলারিজমের প্রতিষ্ঠাতাদের নয়।

বরং এটা (ধর্ম পালনের স্বাধীনতা) বঙ্গীয় সংজ্ঞা, এ দেশীয় ব্যাখ্যা। আর সেকুলারিজম তো এ দেশে শুরু হয়নি। আমরা পড়াশোনা কম করি, তাই ওরা আমাদের ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতে সক্ষম হয়।

ধোঁকা খেয়ে বোকা না বনে তাদেরকে বাংলাদেশের সংবিধান দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১২ নং ধারাটি দেখিয়ে দেবেন। উক্ত ধারায় লেখা হয়েছে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) **রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান** ... বিলোপ করা হইবে।'

এখানে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান বিলোপ করা হবে!'

এর মানে হলো, ইসলামকে রাজনৈতিক মর্যাদা দেওয়া যাবে না। কুরআন-সুন্নাহর আইনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হবে না। ইসলামী শরীয়তকে প্রধান নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্ম চলবে না। রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পক্ষে না,

CS CamScanner

এখানে ধর্মের প্রভাবও নেই, বিধানও নেই। এই হলো ধর্মনিরপেক্ষতার এ দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাখ্যা।

যার সারকথা হলো, ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়। এটা মসজিদে আর কিছু ক্ষেত্রে চলতে পারে। এ ছাড়া সমাজে, শিক্ষায়, অর্থনীতিতে, আইন-আদালতে, রাষ্ট্রে ধর্মের উপস্থিতি ও প্রভাব থাকবে না। রাষ্ট্রে ধর্মের পরিচয় যত কম হয়, ধর্মের বিধি-বিধান যতই কম থাকবে, ততই ভালো। এটাই বাংলাদেশের অনেক মুসলিম দাবিদারের ধর্মনিরপেক্ষতা। এটাই এ দেশে নিজেদেরকে আস্তিক দাবিকারী সুশীলদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা!

ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় আজ ধর্ম উপেক্ষিত। পড়ানো হচ্ছে বিবর্তনবাদ ও বানর-শিম্পাঞ্জি তত্ত্ব। সূক্ষ্মভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে নিকৃষ্ট হারাম ট্রান্সজেন্ডারবাদ।

সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যদিও কোনো কোনো পশ্চিমা দেশে একজন মুসলিম প্রজাকে ব্যক্তিপর্যায়ে কিছু ধর্ম-কর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভারত ও মুসলিম-বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলিম প্রজাদের ওপর জেল-জুলুম, নির্যাতন-নিপীড়ন ও দমননীতির হাতিয়ার হিসেবে পরিণত হয়েছে। এরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দাবি করলেও এখানে হিজাব-নিকাব নিষিদ্ধ হয়, দাড়ি রাখতে প্রতিবন্ধকতা আসে, ধর্ম-কর্ম পালনে রক্ষনশীল হলে জঙ্গী-মৌলবাদীর তকমা লাগে!

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলাম ধর্মে জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্দেশনা বিদ্যমান। অথচ সেকুলারিজম একজন মুসলিমকে সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্র, বিচার, শিক্ষা, অর্থব্যবস্থায় ধর্ম পালন করতে দেয় না।

তাহলে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একজন মুসলিমকে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা কীভাবে দিল? কোথায় দিল?

মরহুম ড. ইকবাল বলেন,

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت * ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

'হিন্দুস্তানে মোল্লাদের নামাজ আদায়ের অনুমতি রয়েছে।

অজ্ঞরা এটাকেই ইসলামের স্বাধীনতা মনে করে বসেছে।'

শুধু নামাজ-রোযা ও হজ-ওমরা করতে পারাই আমার ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নয়; বরং আমার ধর্ম তো খেলাফতের রাজনীতির কথা বলে, ইসলামী অর্থনীতির কথা বলে, শরীয়াহ আইনের কথা বলে। সে ক্ষেত্রে আমার ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপ করা হয় কেন?

CamScanner

আমাকে কেন গণতন্ত্রের রাজনীতি করতে হয়?

কেন পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা মেনে নিতে হয়?

ব্রিটিশ আইন বা মানবরচিত আইনে কেন বিচার করা হয়?

বস্তুত সেকুলারিজম মুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং ধর্মহীন কর্মে গড়ে তোলার পাঁয়তারা ছাড়া কিছু নয়।

সেকুলারিজম কেন?

সেকুলারিজমের উৎপত্তির মূল কারণ দুটি :

১. দ্বন্দ্ব নিরসন।

সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বেশিদিন আগের পরিভাষা নয়। ফরাসি বিপ্লবের পরের। বিপ্লবটা ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের।

ইউরোপে গির্জার পাদরিদের মনগড়া মতামতের সাথে যখন বৈজ্ঞানিকদের সাথে দ্বন্দ্ব দেখা দিল এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে পাদরিদের প্রভাব থাকার কারণে বৈজ্ঞানিকদের ওপর অনেক বছর যাবৎ গির্জায়ী নির্যাতন ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালিত হলো, তখন এ প্রস্তাব গৃহীত হলো যে, ধর্মের কর্তৃত্ব গির্জা ও মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে, আর সমাজ ও পার্থিব জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত থাকবে। অর্থাৎ ধর্ম পালন হবে শুধু গির্জায় ও ব্যক্তিগত জীবনে, আর সমাজ ও পার্থিব জীবনের সকল ক্ষেত্র ধর্মমুক্ত থাকবে; এতে রাষ্ট্র যা বলবে, তা-ই পালন করতে হবে।

এমনকি তাদের বাইবেলেও উল্লেখ আছে,

Give to the emperor the things that are the emperor's, and to God the things that are God's.

'যা সম্রাটের তা সম্রাটকে দাও, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও।'[৪৬৯]

বাংলা একাডেমির ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারি ২০১২ সংস্করণে সেকুলার স্টেটের অর্থ করা হয়েছে, 'গির্জার সাথে বৈপরীত্যক্রমে রাষ্ট্র।'

তাদের মাঝে সৃষ্ট এ দ্বন্দ্ব নিরসন করার জন্য সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পাদরিদের প্রভাব শেষ হয়ে যায়। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে।

---

৪৬৯. বাইবেল : নতুন নিয়ম; মথি লিখিত সুসমাচার, ২২ : ২১। তবে বাইবেলে এটা কি আগে থেকে ছিল, নাকি সেকুলারিজমের উৎপত্তির পর যোগ হয়েছে, তা আমার জানা নেই।

CamScanner

কাজেই সেকুলারিজম মতবাদটি মূলত গির্জায়ী নির্যাতনের প্রতিরোধে পাদরি ও বৈজ্ঞানিকদের মাঝে সংকট ও দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দ্বন্দ্ব নিরসনে ইউরোপ ও পশ্চিমা বিশ্বে উৎপত্তি লাভ করেছে। ফলে তারা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দ্বন্দ্ব নিরসন করেছে।

কিন্তু মুসলমানদের মাঝে এমন কোনো সংকট দেখা দেয়নি। কাজেই ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রশ্নই আসে না।

অথচ আমরাও তাদের মতো ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। তাই একদিকে আমাদের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরাও মনে করে, হুজুরদের কাজ শুধু ব্যক্তিজীবন এবং মসজিদ-মাদরাসা, খানকা ও ওয়াজ-মাহফিলে সীমাবদ্ধ; রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে হুজুরদের কোনো সম্পর্ক নেই।

অন্যদিকে সেকুলার রাজনীতিবিদদেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে, রাষ্ট্র পরিচালনা করা তাদেরই কাজ। হুজুরদের কাজ তো ওগুলোই, তাও আবার মাহফিলে রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা যাবে না! এমনকি কোনো কোনো রাজনীতিবিদের মুখে এটাও শোনা যায় যে, 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।'

এভাবেই তাদের মতো আমরাও ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে ধর্মের কর্তৃত্ব ও ধর্ম পালনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি!

অথচ নামাজ-কালাম পড়েও ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার বা ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্র শাসন না করার কথা আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন। গ্রহণযোগ্য হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ.

'ইসলামের হাতলগুলি একের পর এক ভেঙে ফেলা হবে। মুমিনরা একটি হাতল ভাঙলে পরবর্তী হাতল ধরে টিকে থাকার চেষ্টা করবে। তবে সর্বপ্রথম ভাঙবে (ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্র) শাসনের হাতল। আর সর্বশেষে ভাঙবে নামাজের হাতল।'[৪৭০]

আহ, আজকে আমরাই নামাজ পড়েও এ হাদীসের প্রত্যক্ষদর্শী ও বাস্তবায়নকারী! এভাবে চলতে থাকলে একদিন এমন সময়ও আসবে, যখন নামাজ পড়াও থাকবে না!

২. তাদের বিকৃত খ্রিষ্টবাদ পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা নয়। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য তন্ত্র-মন্ত্রের সহায়তা নিতে হয়। আর এতে তাদের ধর্মের স্বকীয়তা, নিজস্ব রীতিনীতি হারানোর কিছু নেই।

---

৪৭০. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২২১৬০, সনদ জায়্যিদ

CamScanner

কিন্তু ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ধর্ম, পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে-অঙ্গনে এবং আচরণ-উচ্চারণে ইসলামের নির্দেশনা ও বিধান রয়েছে। তাই ইসলাম যদি সেকুলারিজমকে মেনে নেয়, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রসহ জীবনের অসংখ্য ক্ষেত্রে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলি, ধর্মের স্বকীয়তা ও নিজস্ব রীতিনীতি হারাতে হয়। এবং তদস্থলে অন্য তন্ত্র-মন্ত্রকে বিধানদাতা হিসেবে মেনে নিয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করতে হয়।

মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন,

قد اشتهر عن النصارى أنهم يفرقون بين الدين والسياسة بقولهم المعروف: «دع ما لِقَيْصَر لقيصر، وما لله لله»، فكأن الدين لا علاقة له بالسياسة، والسياسة لا ربط لها بالدين، وإن هذه النظرية الباطلة قد تدرجت إلى أبشع صورها في العصور الأخيرة باسم «العلمانية» أو «سيكولرإزم» التي أخرجت الدين من سائر شؤون الحياة حتى قضت عليه بتاتا. وإن هذه النظرية في الحقيقة نوع من أنواع الإشراك بالله، من حيث أنها لا تعترف للدين بسلطة في الحياة المادية، وإنما تقصر سلطة الدين على رسوم وعبادات يمارسها المرء في خلوته أو في معبده، فكأن الإله ليس إلها إلا في العبادات والرسوم، وأما الأمور الدنيوية فلها إله آخر، والعياذ بالله.

‘এ কথা প্রসিদ্ধ যে, খ্রিষ্টানরা ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। এ বিষয়ে তাদের প্রসিদ্ধ বাক্য হচ্ছে, “রাষ্ট্রনায়কদের প্রাপ্য তাদেরকে দাও, আর আল্লাহর প্রাপ্য আল্লাহকে দাও।”’

(অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালিত হবে রাষ্ট্রনায়কদের ইচ্ছামতে। এ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান তথা ধর্ম চলবে।) যার সারকথা হচ্ছে, ধর্মের সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই এবং রাজনীতির সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।

এই বাতিল মতবাদ সেকুলারিজমের নামে এত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে, জীবনের সকল অঙ্গন ও ক্ষেত্রকে ধর্মহীন করে দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদ মূলত আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরকের একটি প্রকার। কেননা, এটি বস্তুবাদী জীবনে দ্বীনের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে না; বরং দ্বীনের কর্তৃত্বকে কতক রসম ও ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে, যা মানুষ একাকিত্বে বা ইবাদতখানায় চর্চা করে। কেমন জানি ‘ইলাহ’ তিনি শুধু ইবাদত ও রসমসমূহের ক্ষেত্রে ‘ইলাহ’, আর জাগতিক বিষয়ের জন্য আরেকজন ‘ইলাহ’ রয়েছে। নাউযুবিল্লাহ!’[৪৭১]

সেকুলারিজমে একজন ব্যক্তিকে রাজনীতি, রাষ্ট্র, বিচার, শিক্ষা, অর্থ ও সংস্কৃতিতে ধর্ম ও শরীয়তের ঊর্ধ্বে মনে করা হয়, যা নিঃসন্দেহে কুফর।

---

৪৭১. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৯/২২৪

আল্লামা তাফতাযানী রাহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেন,

(وَلَا يَصِلُ الْعَبْدُ) مَا دَامَ عَاقِلًا بَالِغًا، (إِلَى حَيْثُ يَسْقُطُ عَنْه الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ) لِعُمُوْمِ الْخِطَابَاتِ الْوَارِدَة فِي التَّكَالِيْف، وَإِجْمَاعِ الْمُجْتَهِدِيْنَ عَلَى ذٰلِكَ. وَذَهَبَ بَعْض الإِبَاحِيِّيْن إِلى أَنَّ الْعَبْد إِذَا بَلَغَ غَايَةَ الْمَحَبَّة وَصَفَاء قَلْبِه، وَاخْتَارَ الإِيْمَانَ عَلَى الْكُفْر مِنْ غَيْرِ نِفَاق: سَقَطَ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَلَا يُدْخِلُهُ اللهُ النَّارَ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ؛ وَبَعْضُهُمْ إِلى أَنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ الْعِبَادَات الظَّاهِرَة، وَتَكُوْن عِبَادَتهُ التَّفَكُّرَ؛ وَهٰذَا كُفْرٌ وَضَلَال.

'মানুষ সাবালক ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন থাকা অবস্থায় কখনো শরীয়তের আদেশ-নিষেধ থেকে বের হতে পারবে না। কেননা, কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আহকাম সকলের জন্য ব্যাপক এবং এর ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অথচ কিছু স্বেচ্ছাচারী সূফী মনে করে, বান্দার হৃদয় যখন স্বচ্ছ হয়ে মহব্বতের চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে যায় এবং কোনো প্রকার নেফাক ব্যতীত ঈমানকে কুফরের ওপর প্রাধান্য দেয়, তখন সে শরীয়তের আদেশ-নিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে যায়। আর কবীরা গুনাহের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে দেবেন না।

আবার এদের কিছু লোকের ধারণা হচ্ছে, এমন ব্যক্তির বাহ্যিক ইবাদত (নামাজ ইত্যাদি) আর করতে হয় না। ধ্যানমগ্নতা হলো তার ইবাদত। এটা কুফর ও ভ্রষ্টতা।'[৪৭২]

যেখানে একজন ব্যক্তির জন্য শরীয়তের আদেশ-নিষেধের ঊর্ধ্বে ওঠার কোনো সুযোগ নেই, সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনায় পুরো দেশের মানুষকে শরীয়তের বিধানের ঊর্ধ্বে মনে করার অবকাশ কোথায়? যেমনটা সেকুলারিজমে ভাবা হয়।

সুতরাং যখন একজন ব্যক্তির ব্যাপারে এমন মনে করা কুফর, তো ধর্মকে রাজনীতি ও দেশ পরিচালনা ইত্যাদি থেকে বের করে দেওয়া এবং মানবজীবনের কোনো ক্ষেত্রেই শরীয়ত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ভাবা নিশ্চিত কুফর।

খেলাফতে উসমানিয়ার শেষ সময়ের শায়খুল ইসলাম মুস্তফা সাবরী রাহ. (মৃ. ১২৬৯ হি.) সেকুলারিজম নিয়ে বেশ আলোচনা করেছেন। খুব দৃঢ়তার সাথে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। তিনি লিখেছেন,

وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة الخروج عليه، لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره، فهو ثورة حكومية على دين الشعب... وشق عصا الطاعة منها أي الحكومة لأحكام الإسلام، بل ارتداد عنه من الحكومة أولا، ومن الأمة ثانيا.

إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفرادا، فباعتبارهم جماعة، وهو

৪৭২. শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৫৮

أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد. بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضا لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها.

'মুসলিম-বিশ্বে বর্তমান ইংরেজদের যেকোনো নব-আবিষ্কৃত পদ্ধতি অবশ্যই দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের রাষ্ট্রকে দ্বীন থেকে আলাদা করার অপচেষ্টা সবচেয়ে মারাত্মক ও সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ।

সেকুলারিজম মূলত জনগণকে দ্বীন থেকে আলাদা রাখার একটি রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন এবং রাষ্ট্রকে শরীয়াহ অনুসরণের পাবন্দী থেকে মুক্ত রাখার অপচেষ্টা; বরং প্রথমত রাষ্ট্র, অতঃপর জনগণের ইরতিদাদের (ইসলাম ধর্মচ্যুত হওয়ার) কারণ হয়। আর এমন রাষ্ট্রের অধীনস্থ জনগণ যদিও ব্যক্তি হিসেবে মুরতাদ নয়, কিন্তু দলবদ্ধভাবে বা জাতীয়ভাবে মুরতাদ। এটা ব্যক্তি হিসেবে মুরতাদ হয়ে কুফরের নিকটবর্তী হওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ; বরং সেকুলারিজম ব্যক্তি হিসেবেও ইরতিদাদকে শামিল করবে, যদি তারা স্বতন্ত্রতার দাবিকারী এই মুরতাদ রাষ্ট্রের আনুগত্য গ্রহণ করে, যা পূর্বে ইসলামের অনুসারী ছিল।'[৪৭৩]

খেলাফতে উসমানিয়ার পতনের কিছু সময় পর এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন প্রখ্যাত আকীদাবিশেষজ্ঞ শায়খ যাহেদ কাউসারী (মৃ. ১৩৭১ হি.) রাহ.-কে করা হয়েছিল। যিনি খেলাফত যুগে নায়েবে শায়খুল ইসলামের পদে উপবিষ্ট ছিলেন।

সিরিয়ার হালাবের কিছু আলেম প্রশ্ন করেছিলেন, যদি কোনো মুসলিম এমন প্রচেষ্টা করে যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকবে, কিন্তু তা বিধান হিসেবে প্রয়োগ হবে না; বরং বিপরীতে মানবসৃষ্ট আইন জারি করা হবে, এমন ব্যক্তির কী হুকুম?

তিনি এর জবাবে লেখেন,

فالمسلم إذا طالب بمثل ذلك في سلامه عقله يجري عليه حكم الردة في بلد يكون فيه الإسلام نافذ الأحكام... وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن دين الاسلام جامع لمصلحتي الدنيا والآخرة، ولأحكامهما دلالة واضحة لا ارتياب فيها، فتكون محاوله فصل الدين من الدولة كفرا صارخا منابذا لإعلاء كلمة الله وعداء موجها إلى الدين الإسلامي في صميمه، ويكون هذا الطلب من هذا الطالب إقرار منه بالانبتار والانفصال فيلزمه بإقراره، فنعده عضوا مبتورا من جسم جماعة المسلمين وشخصا منفصلا عن عقيده أهل الإسلام، فلا تصح مناكحته ولا تحل ذبيحته لانه ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب....

'ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন হয় এমন দেশে যদি কোনো মুসলিম সজ্ঞানে এমনটা চায়, তার ওপর ইরতিদাদের হুকুম আরোপিত হবে।...

৪৭৩. মাওকিফুল আকল ওয়াল ইলম ওয়াল আলম, ৪/২৬৩

কুরআন-সুন্নাহ এ বিষয়ে স্পষ্ট করে যে, ইসলাম দুনিয়া-আখিরাতের সমস্ত কল্যাণকে শামিল করে। তাই দ্বীনকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার অপপ্রয়াস স্পষ্ট কুফর, দ্বীন-ইসলামের সাথে নিখাদ দুশমনী। কাজেই ওই ব্যক্তির এমন চাওয়াটা দ্বীন থেকে আলাদা হওয়ার স্বীকারোক্তি প্রদান করার নামান্তর। উক্ত ব্যক্তিকে আমরা মুসলিম সমাজ থেকে কর্তিত এবং ইসলামী আকীদা থেকে বিচ্যুত মনে করব। সুতরাং এমন ব্যক্তির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং এদের জাবীহা খাওয়া হালাল নয়। কারণ, সে মুসলিম নয়, এমনকি আহলে কিতাবও নয়।

এরপর কাউসারী রাহ. এর স্বপক্ষে আবু বকর রাযি. ও সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মত ফয়সালা দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কিছু লোক যখন শুধু একটি হুকুম পালনের ব্যাপারে এই রাস্তা গ্রহণ করল যে, যাকাতের বিধান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা থেকে দূরে থাকবে, তখন সাহাবায়ে কেরাম এটাকে ইরতিদাদ মনে করেছেন। তাদের সাথে মুরতাদের ন্যায় আচরণ করেছেন।'

অতঃপর তিনি বলেন,

فيكون من لا يرضى بقضاء الإسلام خارجا عن عقيدة الإسلام منفصلا عن جماعة المسلمين.

'সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামের বিধানের ওপর সন্তুষ্ট নয়, সে ইসলামী আকীদা-বহির্গত এবং মুসলিম সমাজ-বহির্ভূত।'[৪৭৪]

প্রিয় পাঠক, শরীয়তের মাত্র একটি বিধানকে আলাদা করার হুকুম যদি হয় এই, তো গোটা দ্বীনকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার হুকুম কী হতে পারে?

বাহরাইনের রাজধানী মানামাতে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনের আন্তর্জাতিক ফিকহে ইসলামীর একাদশ বৈঠকে (২৫-৩০ রজব ১৪১৯ হিজরী মোতাবেক ১৪-১৯ নভেম্বর ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) সেকুলারিজম বিষয়ে একাডেমিতে জমা হওয়া গবেষণাপত্র পর্যালোচনার আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ থেকে দুটি হচ্ছে :

رابعا: إن العلمانية نظام وضعي يقوم على أساس من الإلحاد يناقض الإسلام في جملته وتفصيله، وتلتقي مع الصهيونية العالمية والدعوات الإباحية والهدامة، ولهذا فهي مذهب إلحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنون.

'চতুর্থত (সেখানের ক্রমিক নং হিসেবে) : সেকুলারিজম (মানুষের) বানানো একটি মতবাদ। যার ভিত্তি হলো ইলহাদের ওপর, যা সামগ্রিকভাবে ইসলামের খেলাফ। এর গোড়া আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ ও স্বেচ্ছাচারিতার আহ্বানকারীদের সাথে মিলিত হয়।

৪৭৪. মাকালাতুল কাউসারী, পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩১

কাজেই এটি একটি নাস্তিক্যবাদী মতবাদ, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীরা প্রত্যাখ্যান করে।'

خامسا: إن الإسلام هو دين ودولة ومنهج حياة متكامل، وهو الصالح لكل زمان ومكان، ولا يقر فصل الدين عن الحياة، وإنما يوجب جميع الأحكام منه، وصبغ الحياة العملية الفعلية بصبغة الإسلام، سواء في السياسة أو الاقتصاد، أو الاجتماع، أو التربية، أو الإعلام وغيرها.

'পঞ্চমত : নিশ্চয় ইসলাম একটি দ্বীন ও রাষ্ট্রব্যবস্থাসহ পরিপূর্ণ জীবনবিধান, যা সর্বত্র ও সর্বকালের উপযোগী। ইসলামকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না; বরং এটা আবশ্যক যে, ইসলাম থেকেই সকল বিধান প্রকাশ পাবে এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে এ ইসলামের রঙে রঙিন হতে হবে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, তরবিয়ত, সাংবাদিকতা ইত্যাদি যে ক্ষেত্রই হোক না কেন।'

এরপর উক্ত সম্মেলনের পক্ষ থেকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে,

'এ মাজমা নিম্নোক্ত বিষয়ে পরামর্শ দেয় :

ক. মুসলমানদের শাসকদের অবশ্যই মুসলিমদের থেকে ও তাদের দেশগুলি থেকে সেকুলারিজমের বিষয়গুলো প্রতিহত করতে হবে এবং এর থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. আলেমদের জন্য আবশ্যকীয় হলো, সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ উন্মোচনে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং এ থেকে (মুসলমানদের) সতর্ক করা।'[৪৭৫]

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত

ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত বিশ্বাস করতে হবে। কেননা, ইসলাম কিয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী এমন এক দ্বীন ও শরীয়ত, যাতে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।'[৪৭৬]

---

৪৭৫. মাজাল্লাতু মাজমাঈল ফিকহিল ইসলামী ১১তম সংখ্যার তৃতীয় খণ্ড, ৪৬৫-৪৬৬ পৃষ্ঠা (সিদ্ধান্ত নং ৯০, ২/১১)

৪৭৬. সূরা মায়েদা, (৫) : ৩

সহীহ বুখারীর ৪৫ নং হাদীসে এসেছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-কে এক ইহুদী বলল, হে আমীরুল মুমিনীন!

CamScanner

ইসলামে কি রাজনীতি নেই? মদীনা কি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল?

ইসলাম যে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, এটা আজ অনেক মুসলমান ভাই মানেন না বা বুঝতে চান না। তারা বলেন, 'ধর্ম বড় পবিত্র জিনিস, ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনবেন না কিংবা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করবেন না বা রাজনীতিতে শরীয়াহ আইন বিশ্বাস করি না।'

দৈনিক কালের কণ্ঠে (১৯/০২/২০১০ ঈ.) 'ইসলাম ধর্ম রাজনীতির ঊর্ধ্বে' প্রবন্ধে দাবি করা হয়েছে যে, 'ইসলাম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয় এবং ইসলাম রাজনীতির প্রসঙ্গে অনুপ্রবেশ করে না। কুরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়তে রাজনীতি সম্পর্কে কোনো বিধি-বিধান নেই। মদীনা-মুনাওয়ারা ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না; বরং তা ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র! আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের নয়, তিনি ছিলেন মদীনা-রাষ্ট্রের কর্ণধার! বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো ধারণা দ্বীন ও শরীয়তে নেই!'

অথচ ইসলাম জীবনঘনিষ্ঠ দ্বীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামকে রাজনীতি থেকে পৃথক করার সুযোগ নেই। কেননা, রাজনীতি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অপরিহার্য অঙ্গ। যে ইসলামে রাজনীতি নেই, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেই, বিচারের বিধান নেই, আইন প্রণয়নের নীতিমালা নেই, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের কথা নেই, সেটি সেকুলার বা মডারেট ইসলাম হলেও প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নয়।

মদীনা-মুনাওয়ারা যদি ইসলামী রাষ্ট্র না হয় এবং ইসলামে যদি রাষ্ট্র ও রাজনীতি না থাকে, তাহলে রাসূলের দশ বছরের মদীনার জীবন ও খেলাফতে রাশেদার তিন দশক কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র ও রাজনীতি পরিচালিত হলো কেন? বিশেষত কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত হুদুদ-কিসাস ও দণ্ডবিধি, ইসলামী অর্থনীতি এবং খেলাফতব্যবস্থা প্রভৃতি ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া কীভাবে বাস্তবায়ন হলো?

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'(হে নবী!) আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা আপনার প্রতি নাযিলকৃত কালাম এবং আপনার পূর্বে নাযিলকৃত কালামের ওপর ঈমান আনার দাবি করে, (কিন্তু)

আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন। তা যদি আমাদের ইহুদী জাতির ওপর নাযিল হতো, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে ঈদ হিসেবে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত? সে বলল, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম...।'
উমর রাযি. বললেন, এটি যেদিন এবং যে স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছিল, তা আমরা জানি; তিনি সেদিন আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং তা ছিল জুমআর দিন।

CamScanner

তাদের অবস্থা এই যে, তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন (সুস্পষ্টভাবে) তাকে অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান তাদেরকে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়।'[৪৭৭]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :

'তাগূত'-এর শাব্দিক অর্থ 'ঘোর অবাধ্য'। কিন্তু এ শব্দটি শয়তানের জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং বাতিল ও মিথ্যার জন্যও। এ স্থলে শব্দটি দ্বারা এমন বিচারক ও শাসককে বোঝানো হয়েছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানাবলির বিপরীতে নিজ খেয়াল-খুশিমতো ফয়সালা দেয়।

এ আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুখে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বিধানাবলির ওপর অন্য কোনো বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তবে সে মুসলিম থাকতে পারে না।[৪৭৮]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

'যারা আল্লাহর প্রেরিত বিধান অনুযায়ী (অস্বীকৃতি জানিয়ে) ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।'[৪৭৯]

প্রবন্ধে মিথ্যাচার করে এই দাবি করা হয়েছে যে, মদীনা ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র!

প্রবন্ধটির এ মিথ্যাচার বোঝার জন্য উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ই যথেষ্ট। সাথে রাষ্ট্র ও রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট কুরআন-সুন্নাহর আলোচনা ও অধ্যায়গুলো দেখুন এবং হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ থেকে মদীনায় রাসূলের দশটি বছর কুরআন-সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার, বিশেষত হুদুদ-কিসাস ও দণ্ডবিধি বাস্তবায়িত হওয়ার বিবরণগুলো পড়ুন।

মদীনা সনদের তিনটি দফা

এরপরও সেকুলাররা যেহেতু মদীনা সনদের কথা বলে, তাই মদীনা সনদের নিম্নোক্ত দফাগুলোতে পরিষ্কারভাবে কী বলা আছে দেখুন,

وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه، وإن

৪৭৭. সূরা নিসা, (৪) : ৬০

৪৭৮. তাওযীহুল কুরআন, ১/২৫৮

৪৭৯. সূরা মায়েদা, (৫) : ৪৪

CamScanner

من نصره أو آواه: فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء: فإن مرده إلى الله وإلى محمد.

কিছুদূর এগিয়ে বলা হয়েছে,

وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث، أو اشتجار يخاف فساده؛ فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.[৪৮০]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সীরাতে ইবনে হিশামের বাংলা অনুবাদ থেকে উপরিউক্ত দফাগুলোর হুবহু অনুবাদ তুলে দিচ্ছি,

'২৩. আর যে মুমিন ব্যক্তি এই লিপির বক্তব্য স্বীকার করে নিয়েছে আর সে আল্লাহ্ ও শেষদিবসের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার জন্য কোনো নতুন ফিতনা সৃষ্টিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দান বৈধ হবে না। যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে, তার প্রতি আল্লাহর লানত ও গযব হবে কিয়ামতের দিনে এবং তার থেকে কোনো ফিদয়া (মুক্তিপণ) বা বদলা গ্রহণ করা হবে না।

২৪. আর যখন তোমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা ও মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকট তা উত্থাপন করতে হবে।

৪৬. এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে যদি এমন কোনো নতুন সমস্যার বা বিরোধের উদ্ভব হয়, যা থেকে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ তাআলা এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকট মীমাংসার্থে উত্থাপিত করতে হবে।'[৪৮১]

মদীনা যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়, তাহলে মদীনা সনদে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে গ্রহণ করা হলো কেন? এমন সুস্পষ্ট ঘোষণা কি কোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংবিধানে থাকতে পারে?

এ যুগের সুশীল, বুদ্ধিজীবী ও কলামিস্টরা এভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন ও মিথ্যাচার করে বিভ্রান্তি তৈরি করে এবং মুসলমানদের ঈমান-আকীদা বিনষ্ট করে! আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুন।

---

৪৮০. মাজমুআতুল ওছায়িকিছিস সিয়াসিয়্যাহ লিল-আ'হদিন নববী, ড. হামীদুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৬১-৬২; আল-মুজতামাউল মাদানী ফী আ'হদিন নুবুওয়াহ, ড. আকরাম জিয়া আল-উমারী, পৃষ্ঠা ১২১-১২২
তবে 'মদীনা সনদে'র সূত্রগুলো বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হওয়া নিয়ে কারও কারও কথা রয়েছে। এর জন্য ড. আকরাম যিয়া উমারীর 'আসসিরাতুন নাবাবিয়্যাহ' ১/২৭৫ ও ড. দীদান আলইয়ামীর 'বায়ানুল হাকী ফিল হুকমি আলাল ওয়াসীকাহ' কিতাবদ্বয় দেখতে পারেন।
৪৮১. সীরাতুন নবী (সা.), ২/১৭৯-১৮০।

বাঙালি পরিচয় আগে, নাকি মুসলিম পরিচয়?

যারা নিজেদের সেকুলার দাবি করেন, তাদের অনেকেই বলেন, 'আমি বাঙালিও, আমি মুসলিমও।' তাদের এ কথার অর্থ হচ্ছে, আমি আগে বাঙালি, পরে মুসলিম। তাই সংস্কৃতি-উৎসবের ক্ষেত্রে আমি বাঙালি, এ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মুসলিম।

কেউ কেউ পহেলা বৈশাখ, হিন্দুদের পূজা কিংবা খ্রিষ্টানদের বড়দিন এলে বলেন, 'উৎসব-সংস্কৃতি সর্বজনীন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার।' আবার কেউ বলেন, 'সব বিষয়ে ইসলাম বা ধর্মকে টেনে আনবেন না।'

অথচ একজন মুসলিমের জীবন-মরণ এবং এ দুইয়ের মাঝের সবই আল্লাহর জন্য। এটাই হবে একজন মুসলিমের ভাষ্য ও বক্তব্য। যা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দিয়ে ইরশাদ করেছেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

'আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ (এবং জীবন-মরণের মাঝের সবই) আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি আর আমি প্রথম মুসলিম।'[৪৮২]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

'মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে?'[৪৮৩]

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে তাকে দুনিয়ায় এমন স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে যে, সে শরীয়তের কোনো আইন-কানুনের আওতায় থাকবে না এবং যা খুশি তা-ই করতে থাকবে?

তিন প্রকার মানুষ ব্যতীত সকলেই সব সময় শরীয়তের আওতাধীন

সহীহ হাদীসে এসেছে, তিন প্রকার মানুষ ব্যতীত সকলেই সব সময় শরীয়তের আইন ও বিধানের আওতায় থাকবে। এ ছাড়া অন্য কারও জন্য ইসলামের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। হযরত আলী রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

---

৪৮২. সূরা আনআম, (৬) : ১৬২-১৬৩
৪৮৩. সূরা কিয়ামাহ, (৭৫) : ৩৬

CS CamScanner

'তিন ব্যক্তি হতে কলম (শরীয়তের বিধান) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরা হলো :

১. নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়।

২. ছোট শিশু, যতক্ষণ না সে বালেগ হয়।

৩. পাগল, যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।'[৪৮৪]

আল্লামা আবু হাফস উমর নাসাফী রাহ. (মৃ. ৫৩৭ হি.) ও তাফতাযানী রাহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেন,

(وَلَا يَصِلُ الْعَبْدُ) مَا دَامَ عَاقِلًا بَالِغًا، (إِلَى حَيْثُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ) لِعُمُوْمِ الْخِطَابَاتِ الْوَارِدَةِ فِي التَّكَالِيْفِ، وَإِجْمَاعِ الْمُجْتَهِدِيْنَ عَلَى ذٰلِكَ.

'মানুষ সাবালক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন থাকা অবস্থায় কখনো শরীয়তের আদেশ-নিষেধ থেকে বের হতে পারবে না। কেননা, কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আহকাম সকলের জন্য এবং এর ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'[৪৮৫]

সুতরাং উক্ত তিন প্রকার মানুষ ছাড়া আর কারও জন্য কোনো ক্ষেত্রেই গুনাহের কলম বন্ধ হবে না এবং ইসলামের বাইরে যাওয়া যাবে না। তাই মুসলিম-মুমিন দাবিকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে টেনে আনা আবশ্যক।

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের আদেশ দিয়ে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে-সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।'[৪৮৬]

সুতরাং আকীদা-বিশ্বাসে, চিন্তা-চেতনায়, দেহ-মনে, লেবাস-পোশাকে, পরিবার-সমাজে, লেনদেন-কায়কারবারে, সংস্কৃতি-উৎসবে, বন্ধুত্ব-শত্রুতায়, বিচার-শাস্তিতে, শিক্ষানীতি-রাজনীতিতে ও রাষ্ট্র পরিচালনাসহ সব ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। কুরআন-সুন্নাহয় যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তারই অনুসরণ করো।

---

৪৮৪. আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪০৩, তিরমিযী, হাদীস নং ১৪২৩, সহীহ

৪৮৫. শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৫৮

৪৮৬. সূরা বাকারা, (২) : ২০৮

আয়াতটির শানে নুযুল : ছা'লাবা ইবনে ইয়ামীন ও আছাদ প্রমুখ ইহুদী হতে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু তারা পুরাতন ধারণার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমরা ইহুদী থাকা অবস্থায় শনিবারের দিনকে সম্মান করতাম, এখন মুসলমান হওয়ার পরও আমাদের শনিবার দিনকে সম্মান করার অনুমতি দিন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর ও রুহুল মাআনী।

CamScanner

এর বাইরে অন্য কোনো ধর্ম, ইজম, নীতি ও মত-পথ থেকে কিছু গ্রহণ করা বা মনগড়া রীতিনীতি, বিদআত ও কুসংস্কার ইত্যাদি অনুসরণ করার মানসিক দুর্বলতা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলো।

কেননা, ইসলামের বিপরীত ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সবই শয়তানের পথ। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,

خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللهِ»، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ»، ثُمَّ تَلَا {وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ...}.

'একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সরল রেখা টেনে বললেন, (মনে করো) এটি আল্লাহর পথ। তারপর সে রেখার ডানে-বামে আরও অনেকগুলো রেখা টানলেন। তারপর বললেন, এগুলো অন্যান্য পথ। যার প্রত্যেকটিতে শয়তান দাঁড়িয়ে সেই পথগুলোতে চলার জন্য (মানুষকে) আহ্বান করছে। তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"এটা আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো। এ ছাড়া অন্য কোনো পথের অনুসরণ কোরো না। করলে তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।"'[৪৮৭]

অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে ইসলামই 'সীরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ। এর কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো। এ ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম, আদর্শ ও সংস্কৃতি অবলম্বন করলে সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর পথ হারিয়ে শয়তানের পথে চলে যাবে।

জীবনের সব অঙ্গনে ইসলামী বিধি-বিধানের তালিকা

ইসলামে আকীদা, ইবাদত তথা পবিত্রতা, নামাজ, রোযা, হজ, যাকাত ও আখলাক বা সূফীবাদ তথা চারিত্রিক ও নৈতিক বিধান, যেমন : অহংকার, হিংসা, মিথ্যা, দুনিয়ার লোভ ও কৃপণতা ইত্যাদি থেকে আত্মশুদ্ধি লাভ করা এবং সবর, শোকর ও বিনয়-জাতীয় উত্তম গুণাবলি হাসিল করার বয়ান যেভাবে আছে, তেমনইভাবে গুরুত্বের

---

৪৮৭. সুনানে দারেমী, হাদীস নং ২০৮; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৪১৪২, সনদ হাসান; সূরা আনআম, (৬) : ১৫৩

CamScanner

সাথে বিস্তৃতাকারে আলোচিত হয়েছে মুআমালা তথা লেনদেন-কায়কারবার হালাল-হারামের নীতিমালা। যেমন : ক্রয়-বিক্রয়, খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য (মুদারাবা, পার্টনারশিপ, প্লট-ফ্ল্যাট বিজনেস, শুফআ, রক্ত বা অঙ্গ বেচা-কেনা), চাকরি-মজুরি, মিল-ফ্যাক্টরি, জামানত, হাওয়ালাকরণ, ওয়াকফ, হেবা ও ধার প্রদান-গ্রহণ, ভাড়া দান-গ্রহণ, আমানত বা জমা গ্রহণ, বন্ধক গ্রহণ, বর্গা পদ্ধতি, মানি এক্সচেঞ্জ, ঋণ প্রদান-গ্রহণ, ব্যাংক-বিমা, আমদানি-রপ্তানি, মজুতদারি ও পশুপাখি খাওয়া, শিকার বা জবেহ করা, কুরবানী-আকীকা ও অ্যালকোহল প্রভৃতির নীতিমালা।

আরও রয়েছে মুআশারা তথা সহাবস্থান ও সমাজ-জীবনের বিধি-বিধান ও নীতিমালা। যেমন : মাতা-পিতার হক, সন্তানের হক, আত্মীয়-স্বজনের হক, পাড়া-প্রতিবেশীর হক, গরীব-এতীমের হক, পশু-পাখির হক, বিবাহ, তালাক, খোরপোশ, আবাসনব্যবস্থা, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব-বিনোদন, শিল্প-সংস্কৃতি, পারিবারিক ও উত্তরাধিকার সম্পত্তি আইন, ওসীয়ত, হিজড়া ও দাস-দাসীর মাসায়েল ইত্যাদি।

এভাবে ইসলামে শিক্ষানীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি, পররাষ্ট্র ও সমরনীতি, অমুসলিমদের ধর্ম-উৎসব পালনের স্বাধীনতা ও অন্যান্য অধিকার এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব-শত্রুতার সীমারেখা।

আর হুদুদ-কিসাস ও কাযা অধ্যায়ে হত্যা, রক্তপণ, ক্ষমা-সমঝোতা, চুরি, ডাকাতি, নেশা-মদ, যিনা-ধর্ষণ, সমকামিতা, ধর্মদ্রোহিতা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা, মিথ্যা অপবাদ, বিচার ও বিচারকের নীতিমালা, সাক্ষ্যদান, ওয়াকীল নিয়োগ, মামলা দায়ের ও বাদী-বিবাদী এবং স্বীকারোক্তি দানসহ সবকিছুর আইন ও বিধান রয়েছে।

কুরআন, হাদীস, সীরাত ও ফিকহের গ্রন্থসমূহে এগুলোর সবিস্তারে বিবরণ রয়েছে। সহজে পেতে চাইলে আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (মৃ. ১৩৯৪ হি.) রাহ.-এর 'ই'লাউস সুনান' দেখুন, কিংবা ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ.-এর (মৃ. ৫৯৩ হি.) 'আল-হিদায়া' কিতাব থেকে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে সংশ্লিষ্ট আয়াত-হাদীসগুলো পড়ুন।

কিন্তু আমরা ইসলাম থেকে ইবাদত ('আল-হিদায়া' প্রথম খণ্ড) ও সূফীবাদ গ্রহণ করলেও উল্লিখিত বাকি বিষয়গুলোও যে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা জানি না বা মানি না কিংবা গ্রহণ করি না। ফলে আমরা মুসলিমদের মুখ থেকেই বের হয় 'ইসলাম বা ধর্মকে সব জায়গায় টেনে না আনার মতো' ঈমান নষ্টকারী ভয়ংকর কথা!

এটাই সেকুলারিজমের মূল উদ্দেশ্য। তথা পরিবার, সমাজ, উৎসব, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, আইন ও বিচারব্যবস্থা থেকে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মমুক্ত করা বা ধর্মের বিধান বাদ দেওয়া। এরপর গণতন্ত্রের মাধ্যমে এতে পশ্চিমা বা মানবরচিত

CamScanner

আইন, নীতি ও সংস্কৃতি রিপ্লেস ও সংযোজন করানো হয়। যেমন : ইসলামী অর্থনীতি বাদ দিয়ে পুঁজিবাদ, শিক্ষানীতিতে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতি এবং বিবর্তনবাদের মতো কুফরী ও ট্রান্সজেন্ডারের মতো হারাম বিষয়ের শিক্ষা, উৎসব-সংস্কৃতিতে বাঙালি বা হিন্দুয়ানি ও পশ্চিমা উৎসব-সংস্কৃতি, ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থায় ব্রিটিশ আইন, খেলাফত ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র রিপ্লেস বা সংযোজন করা হয়েছে!

আরও মজার বিষয় হচ্ছে, সেকুলার ভাইদের দ্বিচারিতা চোখে পড়ার মতো। একদিকে তারা ধর্মীয় রাজনীতি পছন্দ করেন না, অন্যদিকে তারা ঠিকই বিভিন্ন মাহফিলে গিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে কসুর করেন না। নির্বাচন এলে বলে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ধান-নৌকার মালিক তুই আল্লাহ!

কাজেই তারা ধর্মীয় রাজনীতি বা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার দেখতে না পারলেও, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে এবং নির্বাচনে ধর্মের ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকছে না। অর্থাৎ রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকা থাকবে না; কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাজনীতি চলবে এবং নির্বাচনে ধর্মের ব্যবহার করা যাবে!

কিন্তু একজন মুমিনের ঈমানের দাবি হলো, প্রকৃত ইসলাম চর্চিত হোক পূর্ণাঙ্গভাবে, মসজিদ ও সংসদে সমানভাবে। ব্যক্তিজীবনে, সামাজিক বন্ধনে, লেবাস-পোশাকে, সংস্কৃতিতে, উৎসবে, শিক্ষাঙ্গনে, অর্থনীতি প্রণয়নে, আদালত ভবনে, রাজনীতির ময়দানে, বঙ্গভবনে ও রাষ্ট্রীয় ফরমানে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানার ও মানার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ঈমান ভঙ্গের পঁচিশতম কারণ

লিবারেলিজমে বিশ্বাসী হওয়া বা লিবারেল তথা উদার হওয়া।

লিবারেলিজম শব্দের অর্থ হলো উদারনীতিবাদ।

The voice of freedom of life. একটি স্বাধীন জীবনের কণ্ঠস্বর। যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার চিন্তা-চেতনাকে বিকাশ করতে পারে এবং বাধাহীন চলার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করাই হলো লিবারেলিজম বা উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য।

লিবারেলদের সাথে নামাজ-রোযার মতো ইবাদত নিয়ে দ্বন্দ্ব নেই; বরং এগুলো পালন করেও কেউ লিবারেল হতে পারে। লিবারেলিজমের সাথে ইসলামের মৌলিক একটা দ্বন্দ্ব হলো, নৈতিকতা ও অধিকারের মানদণ্ড নিয়ে। লিবারেলিজমে এগুলোর মানদণ্ড হলো, মানুষের চাহিদা ও প্রবৃত্তি। লিবারেলরা মনে করে, কোনো ব্যক্তি অন্য

CamScanner

কারও বেঁধে দেওয়া মানদণ্ড মানতে বাধ্য নয়। এখন সেই মানদণ্ড যে কেউ দিক না কেন কিংবা আল্লাহরই দেওয়া হোক না কেন। এটাকে বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ব্যক্তি নিজেই নিজের প্রভু। তার চাহিদা ও প্রবৃত্তিই তার প্রভু।

অথচ ইসলামে ব্যক্তির অবস্থান হলো, আবদিয়্যাত-দাসত্বের ও ইতাআত-আনুগত্যের; ব্যক্তিস্বাধীনতার না, প্রবৃত্তি অনুসরণের না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ

'তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হেদায়েত ছাড়া নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?'[৪৮৮]

কাজেই মুসলিমের জন্য সবকিছুর মানদণ্ড আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হেদায়েত তথা ইসলাম। তাই পরিপূর্ণভাবে-সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের আদেশ দিয়ে বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে-সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।'[৪৮৯]

'ইসলাম'-এর শাব্দিক অর্থ মাথা নত করা এবং কারও পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। আমাদের দ্বীনের নাম 'ইসলাম' এ জন্যই রাখা হয়েছে যে, এর দাবি হলো, মানুষ তার প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহ তাআলারই অনুগত হয়ে থাকবে।

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'যখন তার প্রতিপালক তাকে বললেন, "আনুগত্যে নতশির হও", তখন সে (সঙ্গে সঙ্গে) বলল, আমি রাব্বুল আলামীনের (প্রতিটি হুকুমের) সামনে মাথা নত করলাম।'[৪৯০]

কাজেই ইসলাম ও আল্লাহর শরীয়তকে বিনাবাক্যে কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়াই গ্রহণ করার স্বীকৃতি দিতে হবে। কেউ যদি নৈতিকতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর

---

৪৮৮. সূরা কাসাস, (২৮) : ৫০
৪৮৯. সূরা বাকারা, (২) : ২০৮
৪৯০. সূরা বাকারা, (২) : ১৩১

CamScanner

দেওয়া মানদণ্ডকে অস্বীকার করে, তাহলে সে নামাজ-রোযা করেও কাফের হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং কেউ যদি ইসলামের মানদণ্ডকে মেনে নেয়, সে কখনোই কোনো হারাম কাজকে বৈধ এবং ব্যক্তির অধিকার বলে বিশ্বাস রাখতে পারবে না।

কোনটা নারীর অধিকার আর কোনটা পুরুষের অধিকার, কোনটা পুরুষের দায়িত্ব আর কোনটা নারীর দায়িত্ব—প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি ঠিক করে দিতে পারি না বা এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য মানদণ্ড গ্রহণ করতে পারি না। মুসলিমরা এই প্রশ্নগুলোর সমাধান খুঁজবে আল্লাহর দেওয়া মানদণ্ডে।

পাশ্চাত্য মানুষের ভোগবাদিতাকে কেন্দ্র করে একটা মডেল দাঁড় করিয়েছে। পোশাক, খাবার, লাইফস্টাইল—সব ওদের এঁকে দেওয়া। লিবারেল মানদণ্ডে এগুলোকে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফ্রি-মিক্সিং, যিনা-ব্যভিচার—সব ক্ষেত্রেই একই কথা। সাধারণ মুসলিম ভাই-বোনদের এখানে প্রতারিত হওয়া থেকে সাবধান থাকতে হবে।

ঈমান ভঙ্গের ছাব্বিশতম কারণ

হিউম্যানিজম তথা মানবতাবাদে বিশ্বাসী হওয়া।

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের অন্যতম একটি আইটেম হলো 'হিউম্যানিজম'। ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কের মানবতাবাদী সোসাইটির মতে মানবতাবাদ হলো, 'একটি অতিপ্রাকৃত ঈশ্বর এবং পরকালের জীবনে বিশ্বাসী ধর্মগুলোর একটি আনন্দদায়ক বিকল্প। মানবতাবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এটিই একমাত্র জীবন যার সম্পর্কে আমাদের নির্দিষ্ট জ্ঞান রয়েছে এবং আমরা এই ভঙ্গুর গ্রহটিকে নিজেদের এবং যাদের সাথে আমরা ভাগ করে নিয়েছি তাদের জন্য এটিকে সর্বোত্তম জীবন সম্ভব করার জন্য আমরা নিজেদের ও অন্যদের কাছে ঋণী।'

হিউম্যানিজমের কিছু মুখরোচক স্লোগান হচ্ছে, 'আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা মানুষ', 'আগে মানুষ তারপর ধর্ম', 'মানবতাই সবচেয়ে বড় ধর্ম', 'মানুষই শ্রেষ্ঠ ধর্ম', 'সকল ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়', 'সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে কিছু নাই'।

জনৈক মানবতাবাদী লিখেছেন, 'আজকের দিনে মানবধর্মের চেয়ে বড় কোনো ধর্ম নাই। আর এই যুগে এসে ধর্মের জন্য মানুষকে পর করে দেওয়া যে কতটা মূর্খের কাজ, তা একবার গভীরভাবে না ভাবলে আমাদের আজ আর চলবে না।...

সকল ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়। আর মানুষের চেয়ে পৃথিবীতে কোনো ধর্ম বড় নয়।...

এই আধুনিক যুগে আপনি একজন মানবতাবাদী হয়ে উঠুন আর সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখুন। দেখবেন, আপনি আপনার মনের অজান্তেই ধার্মিক মানুষে পরিণত হয়েছেন।... মানুষ ধর্মের চেয়ে বড় সম্পদ। আপনি যে ধর্মেরই অনুসারী হোন না কেন, আপনি সবার আগে সব ধর্মের মানুষকে ভালোবাসুন। আর সকল ধর্মের ওপরে মানুষ আর মানবতাকে স্থান দিন। তাহলে আপনি প্রকৃত ধার্মিক ও মানুষ হতে পারবেন।'

মূলত পশ্চিমা বিশ্ব এই 'মানবতা'র ধারণাকে 'হিউম্যান রাইটস' নাম দিয়ে একটি পৃথক ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। আর পুরো পৃথিবীকে তারা নিজেদের বানানো এই মাপকাঠি দিয়েই একেক দেশে একেক রকম বিচার করে।

উল্লিখিত স্লোগান ও বক্তব্যের মূল কথা একটাই। তা হলো, আল্লাহর নির্ধারিত মানবতার চেয়ে মানুষের নির্ধারিত মানবতাকে মহান হিসেবে দেখা। এবং মানুষের ধর্মীয় পরিচয়কে গুরুত্বহীন করে দেওয়া। এ জন্যই তাদের কাছে মানবতাই সবচেয়ে বড় ধর্ম, মানুষই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

অথচ ইসলামে আল্লাহর নির্ধারিত মানবতা ধর্মের অংশ; ধর্ম কখনো মানবতার অংশ নয়। মুসলিমদের জন্য সবকিছুর মাপকাঠি ইসলাম। তাই ইসলামই একমাত্র ধর্ম, সবচেয়ে বড় ধর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম।'[৪৯১]

আরও ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করবে, তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।'[৪৯২]

পক্ষান্তরে মানবতাবাদীদের নিজেদের বানানো মনগড়া মাপকাঠি ছাড়া হিউম্যানিজম বা মানবতার কোনো ধারণা নেই। তারা মূলত মানবতার নামে দ্বীনী চেতনাবোধের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে। এবং মুসলিমদের ঈমানী গায়রত ও কুফর-শিরকের প্রতি সহজাত ঘৃণাবোধকে নষ্ট করে। মুসলিম পরিচয়কে পেছনে ফেলে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখানোর নীতিবাক্যের আড়ালে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ও জীবনবোধ থেকে দ্বীনের কর্তৃত্ব ও প্রভাবকে বিলুপ্ত করে দেওয়াই হিউম্যানিজমের প্রধান লক্ষ্য।

---

৪৯১. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৯

৪৯২. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ৮৫

CamScanner

আজ অনেক অবুঝ মুসলিম হিউম্যানিজমের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইসলামী শরীয়তের অনেক বিধান ও বিশ্বাসকে ঘৃণা করছে। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার নামে কুফর ও শিরকের প্রতি মুমিনের সহজাত ঘৃণাকে বিলুপ্ত করছে। মানবসেবা ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কখনো হিউম্যানিজম নামক ধর্মে দীক্ষিত হওয়া যাবে না।

তারা 'হিউম্যানিজম' ধারণার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য একটি কমন প্রশ্ন তোলে, 'আমাদের আসল পরিচয় মানুষ, নাকি মুসলিম?'

এই প্রশ্নের উত্তরে তারা বলে, 'আমাদের আসল পরিচয় আমরা মানুষ। তাই আমাদের নিজেদের প্রথমে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখা লাগবে। মুসলিম হিসেবে চিন্তা করলে মাত্র কয়েক কোটি মানুষ নিয়ে ভাবা যায়। কিন্তু মানুষের জায়গা থেকে চিন্তা করলে পুরো পৃথিবীর সকলেই এসে যাবে।'

আমাদের পক্ষ থেকে উক্ত প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন উত্তর হবে 'আমরা মুসলিম।' কেননা, মানবকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ইবাদতের জন্য। ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

'আমারই ইবাদত করার জন্য আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি।'[৪৯৩]

আর আল্লাহ তাআলার ইবাদতকারী তখনই হবে, যখন পরিপূর্ণ মুসলিম হবে। তাহলে মানুষ ও মানবতার মূল্য ইসলাম ছাড়া হতে পারে না। এ কারণেই ইবাদত ও ইসলাম যদি না থাকে, তাহলে মানুষই সর্বনিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। খোদ সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রাণীর সাথে তুলনা করে আরও নিকৃষ্ট বলেছেন।[৪৯৪]

সুতরাং ইবাদত ও ইসলাম ব্যতীত মানুষ ও মানবতার মূল্য নেই। কাজেই 'আমাদের আসল পরিচয় আমরা মানুষ'—তা কখনো হতে পারে না।

ঈমান ভঙ্গের সাতাশতম কারণ

ফেমিনিজম তথা নারীবাদে বিশ্বাসী হওয়া বা ফেমিনিস্ট হওয়া।

উইকিপিডিয়ার ভাষ্য হচ্ছে, 'নারীবাদ বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত একটি আন্দোলন, যা নারীর ক্ষমতায়ন, ভোটদানের অধিকার এবং নারী-পুরুষ সমান—এই দাবি থেকে শুরু হয়।'

কেউ কেউ 'ইসলামী নারীবাদ' নামে একটা পরিভাষা বলে থাকেন। মূলত 'ইসলামী নারীবাদ' পরিভাষাটা পশ্চিমা নারীবাদের বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু

৪৯৩. সূরা যারিয়াত, (৫১) : ৫৬
৪৯৪. সূরা আরাফ, (৭) : ১৭৯

CS CamScanner

মূল চিন্তা ও দাবিতে এ দুইয়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে প্রচলিত পশ্চিমা নারীবাদ ও ইসলামী নারীবাদের মূল চিন্তা ও দাবিতে তেমন কোনো পার্থক্য না থাকলেও দাবি-উপস্থাপন ও কর্মপন্থায় কিছু ভিন্নতা রয়েছে।

ফেমিনিজম বা নারীবাদের প্রবক্তাদের কিছু ক্ষেত্রে গোমরাহ বলা গেলেও আরও কিছু ক্ষেত্রে শরীয়তের অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিষয়কে অস্বীকার, অভিযোগ ও বিদ্রূপ করার কারণে তাদের ঈমান ভঙ্গের কারণ হয়।

যেমন :

১. সকল বিষয়ে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। এমনকি নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের নামে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতেও নারী-পুরুষের সমান অধিকার। কিংবা এ কথা বলা যে, ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাওয়ার বিধান বে-ইনসাফ! এ ক্ষেত্রে আল্লাহ মেয়েদের অবহেলা করেছেন!

অথবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অযৌক্তিক ও অন্যায় বা ধর্মীয় গোঁড়ামি বৈ কিছু না।

অনুরূপ এ কথা বলা যে, নারীদের স্বামীর আনুগত্য করতে হবে কেন? পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্ববান হবে কেন?

এগুলো সবই ঈমান ভঙ্গের কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের সন্তানদের মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে ওসীয়ত করছেন যে, ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাবে।'[৪৯৫]

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

'নারীদের ওপর পুরুষদের একধাপ বেশি শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।'[৪৯৬]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে-মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে।'[৪৯৭]

---

৪৯৫. সূরা নিসা, (৪) : ১১
৪৯৬. সূরা বাকারা, (২) : ২২৮
৪৯৭. সূরা নিসা, (৪) : ৩৪

CamScanner

২. পর্দার বিধান অস্বীকার করা, বোরকা পরিধান ও পর্দাপ্রথা একটি সেকেলে ও মধ্যযুগীয় প্রথা বলা। পর্দাকে ব্যঙ্গাত্মক ও বিদ্রুপাত্মক করতে গিয়ে বোরকাকে টেন্ড-ট্যাবু, জঙ্গী ইত্যাদি বলা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

'হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৪৯৮]

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[৪৯৯]

৩. পুরুষরা একাধিক বিয়ে করতে পারলে নারীরা পারবে না কেন? অথবা পুরুষদের জন্য একাধিক বিয়ের অধিকার জানা সত্ত্বেও কেউ তা অস্বীকার করা কিংবা এটা আমি মানি না বা এটা নারীর সাথে অন্যায় বলা।

---

৪৯৮. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৫৯

৪৯৯. সূরা নূর, (২৪) : ৩১

CamScanner

তবে পুরুষদের জন্য একাধিক বিয়ের অধিকারের বিষয়টি মেনে নিয়ে যদি কেউ নারীদের স্বভাবসুলভ আচরণ থেকে তা অপছন্দ করে, তাহলে ঈমান ভঙ্গ হবে না কিংবা স্বামীকে একাধিক বিয়ে না করতে অনুরোধ করতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

'নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ করো দুই-দুইজন, তিন-তিনজন অথবা চার-চারজনকে। অবশ্য যদি আশঙ্কাবোধ করো যে, তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতে (ক্ষান্ত থাকো)।'[৫০০]

ব্যাখ্যা :

জাহেলী যুগে স্ত্রী গ্রহণের জন্য কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। এক ব্যক্তি একই সময়ে দশ-বিশজন নারীকে নিজ বিবাহাধীনে রাখতে পারত। আলোচ্য আয়াত এর সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করেছে চার পর্যন্ত এবং তাও এই শর্তসাপেক্ষে যে, সকল স্ত্রীর সাথে সমতাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। যদি পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা থাকে, তবে এক স্ত্রীতেই ক্ষান্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ অবস্থায় একাধিক বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামে পুরুষের জন্য বহুবিবাহের বিধানের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। অবস্থাবিশেষে ব্যক্তি-চরিত্রের হেফাজত, পুরুষের পিতৃত্ব ও নারীর মাতৃত্ব-চাহিদা পূরণ ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োজনে পুরুষের বহুবিবাহ একটি নির্বিকল্প সাধু ব্যবস্থা। নারীর জন্য এ ব্যবস্থা দেওয়া হয়নি। কেননা, বহু স্বামীর স্ত্রী হওয়াটা নারীর পক্ষে মর্যাদাকর নয়। তা ছাড়া এটা তার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃপরিচয়কেও অনিশ্চিত করে দেয়। সুতরাং এ ব্যবস্থায় পুরুষের পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি; বরং নর-নারীর অবস্থানগত প্রভেদকে মূল্য দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

'তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া কোনো সতীসাধ্বী বিবাহিতা নারীও তোমাদের জন্য হারাম।'[৫০১]

এর অর্থ, তোমাদের জন্য বেগানা সতীসাধ্বী বিবাহিতা নারী হারাম। প্রত্যেক মহিলা

---

৫০০. সূরা নিসা, (৪) : ৩

৫০১. সূরা নিসা, (৪) : ২৪

যার স্বামী রয়েছে, সে তোমার ওপর হারাম।[৫০২]

৪. পুরুষরা তালাক দিতে পারলে নারীরা পারবে না কেন? নারীদের শুধু ইদ্দত পালন করতে হবে কেন? তালাকের বিধান মানবতাবিরোধী ও বর্বর। অনুরূপ তিন তালাক দিয়ে দেওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য আর হালাল থাকে না, এ বিষয় অস্বীকার করলে ঈমান চলে যাবে।

সূরা তালাকের প্রথম আয়াত,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ

'হে নবী, তোমরা যখন নারীদের তালাক দাও, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের সময়ে তালাক দিয়ো এবং ভালোভাবে ইদ্দতের হিসাব রেখো আর আল্লাহকে ভয় করো, যিনি তোমাদের প্রতিপালক।'

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

'অতঃপর সে (স্বামী) যদি (তৃতীয়) তালাক দিয়ে দেয়, তবে সে (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী) তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য কোনো স্বামীকে বিবাহ করবে।'[৫০৩]

সারকথা, ফেমিনিজম বা নারীবাদের স্লোগানের আড়ালে যদি কুরআন বা শরীয়তের কোনো অকাট্য বিধান অস্বীকার বা অবজ্ঞা করা হয়, তাহলে নিশ্চিত ঈমান ভঙ্গের কারণ হবে।

ঈমান ভঙ্গের আটাশতম কারণ

গণতন্ত্রের মূল কনসেপ্ট বিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর হাকিমিয়্যাহ (আল্লাহই সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতার মালিক) না মানা।

বর্তমান বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের জয়জয়কার চলছে। গণতন্ত্রকে ইংরেজিতে বলা হয় Democracy। উইকিপিডিয়াতে গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ইংরেজি "Democracy" শব্দটি গ্রিক শব্দ Demo Kratia থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা গ্রিক শব্দ "Demos" এবং "Kratia" শব্দ দুটির সমন্বয়ে সৃষ্ট। "Demos" শব্দের অর্থ হলো "জনগণ" এবং "Kratia" শব্দের অর্থ হলো "শাসন"।'

যার সারাংশ দাঁড়ায়, 'জনগণের শাসন ও ক্ষমতা'।

৫০২. দ্র. তাফসীরে তাবারী ও ইবনে কাসীর
৫০৩. সূরা বাকারা, (২) : ২৩০

CamScanner

আর সংজ্ঞা সম্পর্কে উইকিপিডিয়াতে এসেছে, 'বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অনেক পরে আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln) তার এক ভাষণের মধ্যে জনপ্রিয় এক সংজ্ঞা প্রদান করেন। আব্রাহাম লিংকন ১৯/১১/১৮৬৩ তারিখে তার দেওয়া এক বক্তৃতাতে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে,

"Government of the people, by the people, for the people."

যার অর্থ হলো, "গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য।"'

গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞায় মোট তিনটি পয়েন্ট রয়েছে। ইসলাম গণতন্ত্রকে কোন দৃষ্টিতে দেখে, সেই তিন পয়েন্টে খোলাসা করতে চাই।

১. Government of the people তথা জনগণের সরকার। অর্থাৎ জনগণ ভোটে অংশগ্রহণ করে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনপ্রতিনিধি ও সরকার গঠিত হবে। জনগণ চাইলে তারা ক্ষমতায় থাকতে পারবে; না চাইলে থাকবে না এবং জনগণ যা চাইবে, তারা তা করবে।

এর অর্থ হচ্ছে, 'সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ বা সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।' গণতন্ত্রের মূল কনসেপ্ট হলো এটা।

যেমন : বাংলাদেশ সংবিধানের ৭ (১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।'

যদি এর অর্থ এই হয় যে, জনগণ যেহেতু সকল ক্ষমতার মালিক, কাজেই তারা যা চাইবে, যেভাবে চাইবে, তা-ই করতে পারবে। এমনকি আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে বা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধেও যদি জনগণ-জনপ্রতিনিধি সংসদে রায় দেয়, তবে তা বৈধ বিবেচিত হবে, তাহলে অনুচ্ছেদটির উক্ত বক্তব্য নিশ্চিত কুফরী।[৫০৪]

কেননা, এটা ইসলামের মৌলিক আকীদার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। কারণ :

প্রথমত, সকল শক্তি ও ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা এবং তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক। কুরআনে কারীমের ঘোষণা :

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে চাও ক্ষমতা দান করো, আর

৫০৪. তবে এর অর্থ যদি বলা হয়, শাসনক্ষমতা বৈধ হবে কেবল জনগণের সমর্থন-অনুমোদনের ভিত্তিতে, তাহলে কুফরী হবে না। তবে আমাদের দেশসহ অনেক মুসলিম দেশে কুফরী অর্থে ব্যবহার হয়।

যার থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত করো। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।'[৫০৫]

অন্যত্র বলেন,

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।'[৫০৬]

দ্বিতীয়ত, সার্বভৌম ক্ষমতা যাঁর, বিধান চলবে তাঁর। পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা ও শক্তির মালিক যেহেতু আল্লাহ, তাই এ পৃথিবীতে বিধানও চলবে তাঁরই। এ কারণে ইসলাম বলে, জনপ্রতিনিধি ও সরকারের জন্য আল্লাহর বিধান থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই; বরং তারা আল্লাহ তাআলার বিধান বাস্তবায়নের প্রতিনিধি। তারা যতক্ষণ কুরআন-সুন্নাহর ওপর অটল থাকবেন, ততক্ষণ রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে।

পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে নিরঙ্কুশ/সকল ক্ষমতার মালিক যেহেতু জনগণ, ফলে তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ তথা নির্বাচনে ভোট প্রদানের মাধ্যমে উক্ত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক বা প্রতিনিধি বানান সংসদ সদস্যদেরকে। আর সাংসদরা এমন ক্ষমতা পেয়ে আল্লাহর আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে পশ্চিমা ও মানবরচিত আইন প্রণয়ন করেন এবং সংবিধান তৈরি করেন।

আর এ সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন। যেমন সংবিধানের ৭ (২) অনুচ্ছেদে লেখা আছে, 'এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।' অর্থাৎ দেশের সংবিধানই সর্বোচ্চ আইন এবং শেষ কথা।

এদিকে জনগণের ভোটের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক বা প্রতিনিধি সাংসদগণও যেকোনো আইন তৈরি করতে পারেন। সংবিধানের ৬৫ (১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, 'এই সংবিধানের বিধানাবলি-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত হইবে...।'

আর উক্ত ক্ষমতাবলে সাংসদগণ মদ ও পতিতাবৃত্তির মতো জঘন্য হারামেরও বৈধতার লাইসেন্স দেওয়ার এবং মৃত্যুদণ্ডের আসামিকে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করতে পারার আইন করতে পারেন, যা আল্লাহর আইনে অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ। এভাবে চোরের

৫০৫. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ২৬

৫০৬. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৮৯

CamScanner

হাত কাটা, ব্যভিচারের শাস্তি ও কিসাসসহ অনেক কিছুর কুরআনবিরোধী আইন প্রণীত হয়, যা আল্লাহর আইনে জরুরি।

কাজেই জনগণ পরোক্ষভাবে এবং সাংসদগণ প্রত্যক্ষভাবে নিজেদেরকে আইনের মালিক ও বিধানদাতা বানালেন, যা নিশ্চিত কুফর ও শিরক। আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন রেখে বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

'তাদের কি এমন কতক শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন বিধান প্রণয়ন করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?'[৫০৭]

বলাবাহুল্য, আল্লাহর আইনে কোনো খুনির মৃত্যুদণ্ড নিহতের ওলী বা ওয়ারিশ ব্যতীত আর কেউ মাফ বা মওকুফ করতে পারবে না। চাই তিনি রাষ্ট্রের যত বড় ক্ষমতাধরই হোন না কেন। কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইলে তিনি খুনিকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীর ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই। এমনকি প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত খুনিকে ক্ষমা করে দিলেও কারও কিছু বলার নেই!

কেননা, জনগণ-জনপ্রতিনিধিরা সংবিধানে খুনিকে রাষ্ট্রপতি চাইলে ক্ষমা করতে পারার আইন প্রণয়ন করে রেখেছেন, যা কখনো চলতে পারে না। কারণ, আইন ও বিধান চলবে শুধু আল্লাহর। এই মর্মে ইসলামের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হচ্ছে,

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ 'বিধানক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্য।'[৫০৮]

মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ 'ফাতাওয়া উসমানী'-তে বলেন,

مغربی جمہوریت جسکی بنیاد «عوام کی حکمرانی» کے تصور پر ہے، اسلام کے قطعی خلاف ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد «اللہ کی حاکمیت اعلی» کے عقیدے پر ہے جسے قرآن کریم نے «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» کے مختصر جملے میں ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا مغربی جمہوریت کو اپنے تمام تصورات کے ساتھ برحق سمجھنا عصر حاضر کی بدترین گمراہیوں میں سے ہے، اور ایسے لوگوں کو شرعی طور پر گمراہ کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس تفصیل کے ساتھ مغربی جمہوریت کو برحق سمجھے کہ پارلیمنٹ اگر کوئی قانون قرآن کریم کے کسی صریح حکم کے خلاف نافذ کردے تو (معاذ اللہ) پارلیمنٹ کا قانون ہی برحق ہوگا تو ایسا اعتقاد کفر ہے، لیکن اگر کوئی شخص پارلیمنٹ کے فیصلوں کو قرآن وسنت کے تابع قرار دے تو اس کو کفر یا گمراہی نہیں کہہ سکتے، مگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مغربی جمہوریت کو جوں کا توں قبول نہیں کرتا۔

'পশ্চিমাদের যেই গণতন্ত্রের ভিত্তি "জনগণের শাসনক্ষমতার" চেতনার ওপর

৫০৭. সূরা শূরা, (৪২) : ২১
৫০৮. সূরা ইউসুফ, (১২) : ৬৭

প্রতিষ্ঠিত, তা নিঃসন্দেহে ইসলাম-পরিপন্থী। কেননা, ইসলামের ভিত্তি হলো "আল্লাহই সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতার মালিক"—এ বিশ্বাসের ওপর। যা কুরআন মাজীদে সংক্ষেপে এভাবে ইরশাদ হয়েছে,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "শাসনক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্য।"

কাজেই সার্বিক বিবেচনায় পশ্চিমা গণতন্ত্রকে হক মনে করা বর্তমান যুগের জঘন্যতম ভ্রান্তিগুলোর অন্যতম। এ ধরনের লোকদের গোমরাহ ও ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করা হবে।

আর কেউ যদি এ দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রকে হক মনে করে যে, পার্লামেন্ট কুরআনের স্পষ্ট বিধানের বিপরীত কোনো আইন পাশ করলে (নাউযুবিল্লাহ!) পার্লামেন্টের আইনই সঠিক ও পালনীয় হবে, তাহলে এমন বিশ্বাস কুফর।

তবে কেউ যদি পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তকে কুরআন-সুন্নাহর অধীনে রাখে, তখন তা কুফর বা ভ্রষ্টতা হবে না। কিন্তু এর অর্থ হলো, সে পশ্চিমা গণতন্ত্রকেই মেনে নেয় না।

(কেননা, গণতন্ত্রের ভিত্তিই হচ্ছে, "জনগণের শাসনক্ষমতা", যার বহিঃপ্রকাশ ও বাস্তবায়ন হয় জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যগণের মাধ্যমে পার্লামেন্টে। তাই পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তকে অন্য কিছুর অধীনে রাখলে, গণতন্ত্রের ভিত্তি আর থাকে না।)'[৫০৯]

তিনি 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত' গ্রন্থে বলেন,

جمہوریت میں عوام خود حاکم ہوتے ہیں، کسی الٰہی قانون کے پابند نہیں، تو وہ خود فیصلہ کریں گے کیا چیز اچھی ہے یا بری......

جمہوریت سیکولرازم کے بغیر نہیں چل سکتی.

'গণতান্ত্রিক সিস্টেমে সাধারণ লোক স্বয়ং নিজেরাই শাসনক্ষমতার মালিক হয়। এতে কোনো ঐশী বিধানের পাবন্দ বা আবশ্যকীয়তা নেই। তাই কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ এর ফয়সালা নিজেরাই করে।...

আর গণতন্ত্র সেকুলারিজম ছাড়া চলতে পারে না।'[৫১০]

কেননা, সেকুলারিজমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ, উৎসব, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, আইন ও বিচারব্যবস্থা থেকে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মমুক্ত করা বা ধর্মের বিধান বাদ দেওয়া।

এখন এ ক্ষেত্রগুলোতে ধর্মমুক্ত ও ধর্মহীন করার পর সেগুলো পরিচালিত হওয়ার জন্য তৎস্থানে অন্য কিছু লাগবে।

---

৫০৯. ফাতাওয়া উসমানী, ৩/৫০৭
৫১০. দেখুন, কিতাবটির বাংলা অনুবাদ : ইসলাম ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা ১৬০

CamScanner

তাই গণতন্ত্রের স্লোগানে তথা 'জনগণের শাসনক্ষমতা'র নামে সংসদ সদস্যগণের মাধ্যমে এতে পশ্চিমা আইন বা মানবরচিত আইন, নীতি ও সংস্কৃতি বিপ্লেস ও সংযোজন করানো হয়। যেমন : ইসলামী অর্থনীতি বাদ দিয়ে পুঁজিবাদ, ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থায় ব্রিটিশ আইন, খেলাফত ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র বিপ্লেস বা সংযোজন করা হয়েছে! আর উৎসব-সংস্কৃতিতে বাঙালি সংস্কৃতি ও পশ্চিমা উৎসব-সংস্কৃতি পালনের কথা বলা হয়।

অর্থাৎ সেকুলারিজমের কাজ হচ্ছে শরীর থেকে ধর্মের লেবাস খুলে ছুড়ে ফেলা, আর গণতন্ত্রের কাজ হচ্ছে উক্ত লেবাসবিহীন শরীরে অধর্মীয় কাপড় পরিধান করানো।

সুতরাং তিনি যথার্থই বলেছেন যে, 'গণতন্ত্র সেকুলারিজম তথা ধর্মহীনতা ছাড়া চলতে পারে না।'

সারকথা, জীবনের সব ক্ষেত্রে ও সকল অঙ্গনে 'আল্লাহর হাকিমিয়্যাত' তথা আল্লাহই সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতার মালিক—তা বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হবে। তিনিই হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ, সিদ্ধ-অসিদ্ধ নির্ধারণকারী এবং তাঁকেই একমাত্র আইন ও বিধানদাতা মানতে হবে। এরপর আল্লাহর নাযিলকৃত আইন ও বিধান অনুযায়ী শাসন ও ফয়সালা করতে হবে।

আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনে শাসন করার কুফরী নিয়ে আলোচনা

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রকৃত মুমিনের ঈমানের দাবি তো এটাই যে, আল্লাহর জমিনের কোনো ভূখণ্ড ও অংশ এমন থাকতে পারে না, যেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী বিধান কার্যকর হয় না। কোনো মুমিন এটা ছাড়া অন্য কিছু কল্পনাই করতে পারে না। কেননা, মুসলিম উম্মাহ তো পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও শরীয়তের অধিকারী। যাতে বড় একটি অংশ রয়েছে রাজ্য-শাসনবিষয়ক।

উম্মাহর নেতৃত্বদানকারী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীনদের ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে, ইসলামী আইন ও বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা, সকল অন্যায় ও মন্দের প্রতিরোধ করে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামী হদ, কিসাস ও তা'যীর (দণ্ডবিধি) কার্যকর করা, জিহাদের দায়িত্ব পালন করা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন-পুরাতন জাহিলিয়াতের বিধি-বিধান ও সকল তাগূতী ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে ইসলামী বিধি-বিধানের আনুগত্য করা। কারণ, মানুষ একমাত্র বিধানদাতা আল্লাহর নাযিলকৃত অপরিবর্তনীয় আইন ও বিধানের কার্যকর করতে পারে কেবল। এ ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে ব্যতিক্রম কিছু করার সুযোগ নেই।

এরপরও কেউ যদি আল্লাহর নাযিলকৃত আইন ও বিধান অনুযায়ী শাসন ও ফয়সালা

CamScanner

না করে, তাহলে সে ব্যক্তি কি কাফের সাব্যস্ত হবে?

উত্তর :

অনেকের ধারণা হলো, আল্লাহর আইন ও বিধান ব্যতীত অন্য আইনে শাসন ও ফয়সালাকারী মাত্রই কাফের। তাদের প্রধান দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াত,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।'[৫১১]

অথচ তারা একসাথেই পরবর্তী লাগানো এ ধরনের আরও দুটি আয়াত কেন দেখেন না, তা বোধগম্য নয়। আয়াত দুটি হলো, 'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই **জালেম**।' 'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী শাসন করে না, তারাই **ফাসেক**।'[৫১২]

যদি প্রথম আয়াত থেকে তারা কাফের সাব্যস্ত হয়, তাহলে পরবর্তী আয়াতদ্বয় থেকে তারা কাফের না হয়ে, বরং ঈমানের গণ্ডির ভেতরে থেকে 'জালেম' বা 'ফাসেক' সাব্যস্ত হওয়ার কি সুযোগ নেই?[৫১৩]

বস্তুত কুরআন ও হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু মূলনীতি মাথায় রাখা উচিত। কুরআন ও হাদীসের ক্ষেত্রে পূর্বযুগের মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ইমামগণের অভিমতগুলো দেখা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অনেক আয়াত কিছু প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে নাযিল হয়, কিছু আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যানির্ভর হয়।

সর্বোপরি শুধু কুরআনের একটা অনুবাদ দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটা দেখা জরুরি যে, সালাফের মাঝে আয়াতের কী বুঝ ছিল। আমাদের জন্যও সেই বুঝ গ্রহণ করা জরুরি।

---

৫১১. সূরা মায়েদা, (৫) : ৪৪

৫১২. সূরা মায়েদা, (৫) : ৪৫ ও ৪৭

৫১৩. তাফসীরে মাতুরীদী, ৩/৫৩১-৩২

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في «القول المفيد على كتاب التوحيد» (٢/١٥٩، دار ابن الجوزي): واختلف أهل العلم في ذلك، فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ لأن الكافر ظالم لقوله تعالى: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، [البقرة: ٢٥٤]، وفاسق لقوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ}، [السجدة: من الآية ٢٠]، اي: كفروا.

وقيل: إنها لموصوفين متعدِّدين، وإنها على حسب الحكم، وهذا هو الراجح... ويكون ظالما: إذا اعتقد ان الحكم بما انزل الله احسن الاحكام، وأنه انفع للعباد والبلاد، وأنه الواجب تطبيقه، ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حق حكم بغير ما انزل الله، فهو ظالم... ويكون فاسقا: إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه كرشوة...

CamScanner

প্রথম ব্যাখ্যা :

সালাফের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত 'কুফর' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার হয় : ১. **বড় কুফর** তথা ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে কাফের হয়ে যাওয়া, ২. **ছোট কুফর** তথা ঈমানের গণ্ডির ভেতরে থেকে বড় ধরনের কোনো গুনাহ করা। যেমন : হাদীসে কুফর শব্দের ব্যবহার অনেক গুনাহের ব্যাপারে এসেছে। নামাজ তরক করা, কোনো মুসলিমকে হত্যা করা, মহিলারা স্বামীর অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি গুনাহকারীর ব্যাপারে কাফের শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য বড় কুফর নয়, বরং ছোট কুফর।[৫১৪]

অনুরূপ এই আয়াতে যে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা পরিত্যাগকারীকে কাফের বলা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য বড় কুফর নয়, বরং ছোট কুফর।

এ ব্যাপারে সালাফ ও ইমামগণের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ: إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ.

'এর দ্বারা উদ্দেশ্য সেই কুফর নয়, যা তারা মনে করে। (অর্থাৎ) এটা এমন কুফর নয়, যা ইসলাম থেকে খারেজ করে দেয়। (কাজেই) "যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের" থেকে ছোট কুফর উদ্দেশ্য।'

এক লোক আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-কে জিজ্ঞেস করল, 'কুরআনে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। তো যারা এমনটি করবে, তারা কি কাফের হয়ে যাবে?

ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, যখন কেউ এমনটি করবে, সে কাফের হবে (ছোট কুফর উদ্দেশ্য); কিন্তু সে আল্লাহ তাআলা ও পরকালকে অস্বীকারকারীর মতো নয় (বড় কুফর উদ্দেশ্য)।'[৫১৫]

---

৫১৪. দেখুন, সহীহ বুখারী, ২১ নং অধ্যায় (بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ); তা'যীমু কাদরিস সালাত, মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারওয়াযী, ২/৫২৬ (الْكُفْرُ كُفْرَانِ: أَحَدُهُمَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، وَالْآخَرُ لَا يَنْقُلُ عَنْهَا); আত-তামহীদ, ইবনে আব্দিল বার, ৪/২৩৬-৩৭; আল-ইসতিযকার, ইবনে আব্দিল বার, ৫/৩৫২; মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, বায়হাকী, ১/১৯১; শারহুস সুন্নাহ, বাগাবী, ১/৭৬; ইকমালুল মু'লিম, কাযী ইয়ায, ৩/৩৪৮; ফাতহুল বারী, ইবনে রজব হাম্বলী, ১/১৩৭-৪২

৫১৫. মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ৩২১৯, তিনি বলেন, এর সনদ সহীহ; আত-তাফসীর মিন সুনানি সাঈদ ইবনে মানসুর, হাদীস নং ৭৪৯; তা'যীমু কাদরিস সালাত, মারওয়াযী, হাদীস নং ৫৬৯-৫৭৪; শারহু মুশকিলিল আসার, ২/৩১৭-১৮; আস-সুন্নাহ, খাল্লাল, হাদীস নং ১৪১৪-১৪২০; তাফসীরে তাবারী, ১০/৩৫৫-৫৬; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩/১২০; সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, ৬/১১৩-১৪, হাদীস নং ২৫৫২
সারকথা, এই আয়াতের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে অনেকগুলো সনদে বর্ণিত এবং মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণের নিকট সমাদৃত। যার দ্বারা ব্যাখ্যাটির প্রামাণ্যতা সুদৃঢ় সাব্যস্ত হয়।

ইমাম ইবনে আব্দিল বার রাহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন,

قَالُوا: لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، حَتَّى يَكْفُرَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، مِنْهُمْ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ.

অর্থাৎ 'আয়াতটির এমন ব্যাখ্যা উলামায়ে কেরামের এক জামাআত থেকে বর্ণিত, যাদের মধ্যে ইবনে আব্বাস রাযি., তাউস ও আতা রাহ. অন্যতম।'[৫১৬]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابُهُ فِي قَوْله تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قَالُوا: كَفَرُوا كُفْرًا لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، وَقَدْ اتَّبَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ.

'"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী শাসন করে না, তারাই কাফের" আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ও তাঁর সঙ্গীরা বলেছেন, "এর দ্বারা এমন কুফর উদ্দেশ্য, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না" (তথা ঈমান ভঙ্গের কারণ হয় না)। এই বক্তব্য ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যান্য ইমামও গ্রহণ করেছেন।'[৫১৭]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ.-ও (মৃ. ৭৫১ হি.) আব্বাস রাযি.-এর ব্যাখ্যা নকল করে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন।[৫১৮]

অথচ কিছু দ্বীনী ভাই যথাযথ পদ্ধতিতে দ্বীনী ইলম অর্জন না করার কারণে এবং অতিরঞ্জনকারী কতক সালাফী শায়খের লেখা পড়ে কিংবা বক্তব্য শুনে মনে করে যে, এটা বড় কুফর এবং আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনে শাসনকারী মাত্রই কাফের।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা :

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত,

مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللهُ: فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ: فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অস্বীকার করল, সে নিশ্চিত কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান স্বীকার করে, তবে উক্ত বিধান অনুযায়ী

---

৫১৬. আত-তামহীদ, ইবনে আব্দিল বার, ৫/৭৫; আল-ঈমান, কাসেম ইবনে সাল্লাম, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০; শারহুল বুখারী, ইবনে বাত্তাল, ৬/১০৩

৫১৭. মাজমুউল ফাতাওয়া, ৭/৩১২ ও ৭/৫২২

৫১৮. দ্র. তাঁর কিতাবদ্বয় : কিতাবুস সালাত, ১/৬৯; মাদারিজুস সালিকীন, ১/৩৪৫

CamScanner

ফয়সালা করে না, সে জালেম ও ফাসেক।'[৫১৯]

বলাবাহুল্য, এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা মূলত উল্লিখিত তিন আয়াতের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছে।

এ ব্যাখ্যাটার মূল ভিত্তি হলো, শাসক ও ফয়সালাকারীর বিশ্বাস ও অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া। সুতরাং কোনো শাসক আল্লাহর আইন ব্যতীত শাসন করলেই কাফের হবে না; বরং তার বিশ্বাসে যদি 'অস্বীকার' বা অন্য কোনো কুফর পাওয়া যায়, তাহলে কাফের হবে। আর এ ধরনের বিশ্বাস ও অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে কুফরের হুকুম দেওয়ার ব্যাখ্যা প্রায় তাফসীরের কিতাবে এবং বড় বড় ইমামগণের বক্তব্যে রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ও হাসান (বসরী) রাহ. বলেন,

هِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالْكُفَّارِ أَيْ: مُعْتَقِدًا ذَلِكَ وَمُسْتَحِلًّا لَهُ، فَأَمَّا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّهُ رَاكِبُ مُحَرَّمٍ فَهُوَ مِنْ فُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

'এই আয়াত মুসলমান, ইহুদী ও কাফের সকলের জন্য প্রযোজ্য। এর ব্যাখ্যা হলো, যদি সে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন না করায় বিশ্বাসী হয় এবং সে এটিকে বৈধ মনে করে (তাহলে কাফের হয়ে যাবে)।

কিন্তু যদি সে এটি হারাম মনে করে, তাহলে সে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে এবং তার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত হবে। তিনি চাইলে তাকে আযাব দিতে পারেন বা ক্ষমা করে দিতে পারেন।'[৫২০]

'মুসনাদে আবী হানীফা' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

أبو حنيفة، عن شيخ لهم، عن ابن عمر رضي الله عنه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: من لم يؤمن به.

'"যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের"—এর ব্যাখ্যা হলো, যে এর ওপর ঈমান আনে না (সে কাফের)।'[৫২১]

কিছু তাফসীরগ্রন্থে হযরত ইকরিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ عِكْرِمَةُ: قَوْلُهُ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَجَحَدَ بِلِسَانِهِ، أَمَّا مَنْ عَرَفَ بِقَلْبِهِ كَوْنَهُ حُكْمَ اللهِ وَأَقَرَّ بِلِسَانِهِ كَوْنَهُ حُكْمَ اللهِ، إِلَّا أَنَّهُ أَتَى بِمَا يُضَادُّهُ فَهُوَ حَاكِمٌ بِمَا أَنْزَلَ

৫১৯. তাফসীরে তাবারী, ১০/৩৫৭, নং ১২০৬৩; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম, নং ৬৪২৬; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩/১১৯; তাফসীরে বাগাবী, সা'লাবী ও খাযেনে এই ব্যাখ্যা ইকরিমা রাহ. থেকে নকল করা হয়েছে।
৫২০. তাফসীরে কুরতুবী, ৬/১৯০; শারহে আবু দাউদ, ইবনে রাসালান, ১৪/৬০৭
৫২১. মুসনাদে আবী হানীফা, ইবনে খাসরু, ২/৯১৪-১৫, বর্ণনা নং ১২৪৮

اللهِ تَعَالَى، وَلَكِنَّهُ تَارِكٌ لَهُ، فَلَا يَلْزَمُ دُخُولُهُ تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ.

'"যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না" থেকে উদ্দেশ্য হলো, "যারা আল্লাহর আইন অন্তর দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখ দিয়ে অস্বীকার করে।" কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন অন্তর দিয়ে মেনে নেয় এবং মুখ দিয়ে স্বীকার করে, তবে তা বাস্তবায়ন করে না, তাহলে সে এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে না তথা কাফের হবে না।'[৫২২]

প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহ. (মৃ. ৬০৬ হি.) এটা নকল করার পর বলেন, وَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الصَّحِيحُ এটাই সঠিক উত্তর তথা আয়াতটির ব্যাখ্যা।

ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী রাহ. (মৃ. ৩৭০ হি.) লেখেন,

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: هِيَ عَامَّةٌ يَعْنِي فِيمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَحَكَمَ بِغَيْرِهِ مُخْبِرًا أَنَّهُ حُكْمُ اللهِ تَعَالَى، وَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ...

فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ جُحُودَ حُكْمِ اللهِ أَوْ الْحُكْمَ بِغَيْرِهِ مَعَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ حُكْمُ اللهِ، فَهَذَا كُفْرٌ يُخْرِجُ عَنْ الْمِلَّةِ وَفَاعِلُهُ مُرْتَدٌّ إِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مُسْلِمًا، وَعَلَى هَذَا تَأَوَّلَهُ مَنْ قَالَ: «إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَرَتْ فِينَا» يَعْنُونَ: أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنَّا حُكْمَ اللهِ، أَوْ حَكَمَ بِغَيْرِ حُكْمِ اللهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا حُكْمُ اللهِ، فَهُوَ كَافِرٌ كَمَا كَفَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ فَعَلُوا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ كُفْرَ النِّعْمَةِ فَإِنَّ كُفْرَانَ النِّعْمَةِ قَدْ يَكُونُ بِتَرْكِ الشُّكْرِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ جُحُودٍ، فَلَا يَكُونُ فَاعِلُهُ خَارِجًا مِنْ الْمِلَّةِ، وَالْأَظْهَرُ هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ لِإِطْلَاقِهِ اسْمَ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ. وَقَدْ تَأَوَّلَتْ الْخَوَارِجُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ تَرَكَ الْحُكْمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ غَيْرِ جُحُودٍ لَهَا.

সারাংশ : 'ইবনে মাসউদ রাযি., হাসান (বসরী) ও ইবরাহীম (নাখয়ী) রাহ. বলেন, এ আয়াতের হুকুম প্রত্যেক ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে আল্লাহর প্রেরিত আইন অনুসারে বিচার করে না এবং আল্লাহর পরিবর্তে অন্য আইন দ্বারা ফয়সালা করে বলে যে, এটা আল্লাহর আইন। আর যে এমন করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।'

অতঃপর তিনি বলেন, 'যদি আয়াতের মধ্যে কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করা অথবা কুরআনের বিপরীত ফয়সালা করে এ কথা বলা যে, সে আল্লাহর আইন দ্বারা ফয়সালা করেছে; তাহলে এটা (দুই সূরতই) এমন কুফর, যা ইসলাম থেকে বের করে দেবে এবং মুসলমান হলে মুরতাদ হয়ে যাবে। অন্যথায় নয়। আর খারেজী সম্প্রদায় আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করবে না, সে তা অস্বীকার না করলেও কাফের।'[৫২৩]

৫২২. আত-তাফসীরুল কাবীর, রাযী ১২/৬; আল-বাহরুল মুহীত, আবু হাইয়ান, ৪/২৭০; আল-লুবাব ফী উলূমিল কিতাব, ইবনে আদেল হাম্বলী, ৭/৩৫; গারায়িবুল কুরআন, নীসাবুরী, ২/৫৯৬

৫২৩. আহকামুল কুরআন, ২/৫৪৮-৪৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

CS CamScanner

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) **'বয়ানুল কুরআনে'** আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন,

اور یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالی کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے بلکہ غیر حکم شرعی کو قصداً حکم شرعی بتلا کر اس کے موافق حکم کرے سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں.

'আর এ কথা স্মরণ রেখো যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না; বরং ইসলামবিরোধী আইনকে স্বেচ্ছায় ইসলামী বলে সে অনুযায়ী বিচার করে, তাহলে এমন লোক পুরোপুরিভাবে কাফের।'

মুফাসসিরকুল শিরোমণি ইমাম কুরতুবী মালেকী রাহ. (মৃ. ৬৭১ হি.) লেখেন,

وَقِيلَ: فِيهِ إِضْمَارٌ، أَيْ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ رَدًّا لِلْقُرْآنِ، وَجَحْدًا لِقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُوَ كَافِرٌ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ، فَالْآيَةُ عَامَّةٌ عَلَى هَذَا.

'বলা হয়েছে, এর মাঝে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের বিরোধিতা ও রাসূলের হাদীসের অস্বীকৃতির মানসিকতা থেকে যদি কেউ আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা না করে, তাহলে সে কাফের। যা ইবনে আব্বাস রাযি. ও মুজাহিদ রাহ. বলেছেন। আর এ ব্যাখ্যানুযায়ী আয়াতটি ব্যাপক তথা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।'[৫২৪]

এভাবে শাসক ও ফয়সালাকারীর বিশ্বাস বিবেচনায় নিয়ে আয়াতটির ব্যাখ্যা আরও অনেক মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ইমাম থেকে পাওয়া যায়।[৫২৫]

এ কারণেই বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা মাহমুদ আলূসী বাগদাদী মাতুরীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ১২৭০ হি.) এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

وأجيب بأن الآية متروكة الظاهر، فإن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب والجوارح لكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق، ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل الله تعالى.

'আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। যদিও এখানে বিষয়টি ব্যাপক, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো, অন্তরের বিশ্বাস। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত আইনকে বিশ্বাস করবে না, সে নিশ্চিত কাফের।'[৫২৬]

ইমাম ইবনে আব্দিল বার রাহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) লেখেন,

---

৫২৪. তাফসীরে কুরতুবী, ৬/১৯০, দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ

৫২৫. তাফসীরে মাতুরীদী, ৩/৫২৭ ও ৫৩১-৩২; আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরবী, ২/১২৭; তাফসীরে কুরতুবী, ৬/১৯১; তাফসীরে তাবারী, ১০/৩৫৮; যাদুল মাসীর, ইবনুল জাওযী, ১/৫৫৩; আরও দেখুন, তাফসীরে কাশশাফ; তাফসীরে বায়যাবী; তাফসীরে নাসাফী; তাফসীরে আবুস সাউদ ও তাফসীরে মুযহিরী এবং আল-মুফহিম, কুরতুবী, ৫/১১৭; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১/৮৭

৫২৬. রুহুল মাআনী, ৩/৩১৪

CamScanner

وَقَدْ ضَلَّتْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ فَاحْتَجُّوا.. مِنْ كِتَابِ اللهِ بِآيَاتٍ لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا مِثْلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ...

'বিদআতপন্থীদের মধ্য থেকে খারেজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়েছে এমন কিছু আয়াত থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে, যেখানে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। তন্মধ্যে একটি আয়াত হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করবে না, সে কাফের।'[৫২৭]

বস্তুত অন্য কিছু না দেখে শুধু আল্লাহর নাযিলকৃত আইন ও বিধান অনুযায়ী শাসন ও ফয়সালা করার কারণে কাফের বলে খারেজীরা।[৫২৮]

সালাফীদের অনুসরণীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়াতটির ব্যাখ্যা

যারা দাবি করে, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কায়্যিম রাহ. আল্লাহর আইন ব্যতীত শাসন করলেই বিশ্বাস ও অবস্থা বিবেচনা না করে কাফের সাব্যস্ত করেন, তাদের জন্য একটি করে উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন,

وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، فَمَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا يَرَاهُ هُوَ عَدْلًا مِنْ غَيْرِ اتِّبَاعٍ لِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَهُوَ كَافِرٌ... بَلْ كَثِيرٌ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ يَحْكُمُونَ بِعَادَاتِهِمُ الَّتِي لَمْ يُنْزِلْهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَسَوَالِفِ الْبَادِيَةِ وَكَأَوَامِرِ الْمُطَاعِينَ فِيهِمْ، وَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي الْحُكْمُ بِهِ دُونَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ أَسْلَمُوا، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَا يَحْكُمُونَ إِلَّا بِالْعَادَاتِ الْجَارِيَةِ لَهُمُ الَّتِي يَأْمُرُ بِهَا الْمُطَاعُونَ، فَهَؤُلَاءِ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ إِلَّا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَلَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ، بَلِ اسْتَحَلُّوا أَنْ يَحْكُمُوا بِخِلَافِ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَهُمْ كُفَّارٌ، وَإِلَّا كَانُوا جُهَّالًا، كَمَنْ تَقَدَّمَ أَمْرُهُمْ.

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ إِذَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ...وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ تَحْكِيمَ اللهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ أَقْسَمَ اللهُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِحُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، لَكِنْ عَصَى وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُصَاةِ. وَهَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ عَلَى تَكْفِيرِ وُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، ثُمَّ يَزْعُمُونَ أَنَّ اعْتِقَادَهُمْ هُوَ حُكْمُ اللهِ.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিলকৃত আল্লাহর বিধান অনুযায়ী

---

৫২৭. আত-তামহীদ, ১৭/১৬; আল-মুফহিম, কুরতুবী, ৫/১১৭; আল-ই'তিসাম, শাতেবী, ২/৬৯২

৫২৮. দেখুন, সূরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় : প্রায় তাফসীর গ্রন্থসমূহ, এবং শারহুল আকায়িদীন নাসাফিয়্যাহ, তাফতাযানী, পৃষ্ঠা ১৯৩-সহ অনেক আকীদার কিতাবে।

CamScanner

শাসন করার আবশ্যকীয়তা যে অবিশ্বাস করবে, সে নিঃসন্দেহে কাফের। অতএব যে কেউ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসরণ না করে নিজে যা ন্যায় মনে করে, সেই অনুযায়ী লোকদের শাসন করাকে হালাল মনে করবে, সেও কাফের।

অনেক নামধারী মুসলিম আল্লাহর নাযিলকৃত আইন বাদ দিয়ে নিজেদের দেশাচার ও সংস্কৃতি অনুযায়ী শাসন করে আর মনে করে, কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে নিজেদের আইনেই শাসন করা উচিত। এটা কুফরী। তাদের বোঝাতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন, তা ব্যতীত শাসন করা বৈধ নয়। এরপরও যদি তারা না মানে; বরং আল্লাহর আইনের বিপরীত শাসন করাকে হালাল মনে করে, তাহলে তারা কাফের। অন্যথায় তাদের মূর্খ হিসেবে ধরে নেওয়া হবে।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ হচ্ছে, মুসলমানরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হলে তারা (এর ফয়সালার জন্য) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। ইরশাদ হয়েছে, "আপনার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মাঝে সংঘটিত বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক বানাবে। অতঃপর আপনার ফয়সালা সম্বন্ধে নিজেদের মনে কোনো সংকীর্ণতা বোধ করবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে।"[৫২৯]

সুতরাং যারা নিজেদের মধ্যকার বিবাদে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালাকে আবশ্যক মনে করবে না, খোদ আল্লাহ তাআলা শপথ করে বলেছেন যে, তারা মুমিন নয়। **তবে যারা আল্লাহর বিধানকে আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নেয়, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় তা পালন না করে আল্লাহর অবাধ্যতা করে, তারা (কাফের নয়, বরং) গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।**

এই আয়াত দিয়ে খারেজীরা যেসব শাসক আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী শাসন করে না, তাদের কাফের সাব্যস্ত করে। আর তারা বলে যে, তাদের এই বিশ্বাসটা (এমন শাসকদের কাফের বলা) আল্লাহরই আদেশ।'[৫৩০]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেন,

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ يَتَنَاوَلُ الْكُفْرَيْنِ، الْأَصْغَرَ وَالْأَكْبَرَ بِحَسَبِ حَالِ الْحَاكِمِ، فَإِنَّهُ إِنِ اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ، وَعَدَلَ عَنْهُ عِصْيَانًا، مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ، فَهَذَا كُفْرٌ أَصْغَرُ، وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ، مَعَ تَيَقُّنِهِ أَنَّهُ حُكْمُ اللهِ، فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ، وَإِنْ جَهِلَهُ وَأَخْطَأَهُ فَهَذَا مُخْطِئٌ، لَهُ حُكْمُ الْمُخْطِئِينَ.

'সঠিক কথা হলো, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন না করা শাসকের

---

৫২৯. সূরা নিসা, (৪) : ৬৫
৫৩০. মিনহাজুস সুন্নাহ, ৫/১৩০-১৩১; মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩/২৬৮

CamScanner

অবস্থা বিবেচনায় কখনো ছোট কুফর (কবীরা গুনাহ), কখনো বড় কুফর (ইসলাম থেকে খারেজ) হয়।

যদি নির্দিষ্ট বিষয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন করা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করে, তবে অবাধ্য হয়ে অন্য আইনে শাসন করে এবং এর কারণে পরকালে শাস্তির উপযুক্ত হবে তা স্বীকারও করে, তাহলে সেটা ছোট কুফর।

যদি বিশ্বাস করে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করা ওয়াজিব নয়; বরং তা আল্লাহর বিধান জেনেও ইচ্ছাধীন বিষয় মনে করে, তাহলে সেটা বড় কুফর।

আর যদি অজ্ঞতাবশত ভুল করে, তাহলে ভুলকারীর হুকুম প্রযোজ্য হবে।'[৫৩১]

প্রায় একই কথা ইবনে আবীল ইয হানাফীও (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেছেন,

وَهُنَا أَمْرٌ يَجِبُ أَنْ يُتَفَطَّنَ لَهُ، وَهُوَ: أَنَّ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، وَقَدْ يَكُونُ مَعْصِيَةً: كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً... وَذَلِكَ بِحَسَبِ حَالِ الْحَاكِمِ: فَإِنَّهُ إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْحُكْمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ غَيْرُ وَاجِبٍ وَأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ، أَوِ اسْتَهَانَ بِهِ مَعَ تَيَقُّنِهِ أَنَّهُ حُكْمُ اللهِ: فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ.

وَإِنِ اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، وَعَلِمَهُ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ، وَعَدَلَ عَنْهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ: فَهَذَا عَاصٍ، وَيُسَمَّى كَافِرًا كُفْرًا مَجَازِيًّا، أَوْ كُفْرًا أَصْغَرَ.

'এখানে একটা বিষয় খুব ভালো করে বোঝার আছে। তা হলো, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন না করা কখনো ইসলাম থেকে খারেজ হওয়ার মতো কুফরী হয়, কখনো কবীরা বা সগীরা গুনাহ হয়।

মূলত এটি হয় শাসকের অবস্থা বিবেচনায়। শাসক যদি বিশ্বাস করে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন করা ওয়াজিব নয় বা কোনো বিধানকে আল্লাহর বিধান জেনেও তা নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, এটি বড় কুফর।

আর যদি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন করা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করে, এরপর পরকালে শাস্তির উপযুক্ত হবে এটা স্বীকার করেও আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য আইনে শাসন করে, সে গুনাহগার। তাকে কাফের বলা হলেও সেটি রূপকার্থে বলা হবে অথবা বলা হবে, সে ছোট কুফর করেছে।'[৫৩২]

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সরকারি ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ লিল বুহুসিল ইলমীয়্যাহ ওয়াল ইফতা'-এর ফতোয়া, যা প্রতিষ্ঠানটির সাবেক প্রধান আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায রাহ. (মৃ. ১৪২০ হি.)-এর সত্যায়নকৃত :

---

৫৩১. মাদারিজুস সালিকীন, ১/৩৪৬

৫৩২. শারহুল আকীদাতিত তাহাবীয়্যাহ, ২/৪৪৬

س: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟

ج: قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ... فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ... فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر، وظلم أكبر، وفسق أكبر يخرج من الملة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر، وظالما ظلما أصغر، وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة.

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

'**প্রশ্ন** : যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন করে না, তারা কি মুসলিম, নাকি কাফের?

উত্তর :

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন না করাকে হালাল জানলে ও বৈধ বিশ্বাস করলে বড় কুফর, বড় জুলুম ও বড় ফিসক হিসেবে গণ্য হবে; তথা ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাবে।

আর যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন না করাকে হারাম মনে করা সত্ত্বেও ঘুষ বা অন্য কোনো কারণে এমন করে, তাহলে গুনাহগার সাব্যস্ত হবে এবং ছোট কুফর, ছোট জুলুম ও ছোট ফিসক হিসেবে গণ্য হবে; তথা ইসলাম থেকে খারেজ হবে না। আহলে ইলমগণ আয়াতগুলোর তাফসীরে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।'[৫৩৩]

শায়খ আলবানী রাহ. (মৃ. ১৪২০ হি.) এ বিষয়ে একাধিক স্থানে বেশ জোরালো আলোচনা করেছেন। এক স্থানে তিনি এ বিষয়ে তিনও আয়াতের ব্যাখ্যা উল্লেখ করার পর লেখেন,

فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض الحكام المسلمين وقضاتهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الأرضية. أقول: لا يجوز تكفيرهم بذلك، وإخراجهم من الملة إذا كانوا مؤمنين بالله ورسوله، وإن كانوا مجرمين بحكمهم بغير ما أنزل الله... فمن قام من المسلمين بشيء من هذه المعاصي، فكفره كفر عملي، أي إنه يعمل عمل الكفار، إلا أن يستحلها...

'কাজেই এসব আয়াত ওই সকল মুসলিম শাসক ও বিচারকদের ব্যাপারে আরোপ করা জায়েয হবে না, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার না করে মানবরচিত আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করে।

---

৫৩৩. ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ, ১/৭৮০, নং ৫৭৪১

(এর পর তিনি বলেন,) আমি বলি, এটার কারণে তাদেরকে কাফের আখ্যা দেওয়া এবং ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া জায়েয হবে না, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা না করার কারণে তারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

সুতরাং এ ধরনের কোনো পাপ মুসলমানের পক্ষ হতে সংঘটিত হলে তার কুফর হলো, কুফরে আমলী (বিশ্বাসগত কুফর নয়) তথা সে কাফেরদের মতো কাজ করেছে। তবে এটাকে বৈধ মনে করলে বিশ্বাসগত কুফর হিসেবে গণ্য হবে।'

তিনি অন্যত্র বলেন,

ولكن مما ينبغي التنبه له أنه ليس كذلك من لا يحكم بشيء منها مع عدم إنكاره ذلك، فلا يجوز الحكم على مثله بالكفر وخروجه عن الملة، لأنه مؤمن، غاية ما في الأمر أن يكون كفره كفرا عمليا.

وهذه نقطة هامة في هذه المسألة يغفل عنها كثير من الشباب المتحمس لتحكيم الإسلام.

'এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য যে, অস্বীকার করা ব্যতিরেকে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে না, তার ওপর কুফরী আরোপ করা এবং ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া অনুচিত ও অবৈধ। কারণ, সে মুমিন। সর্বোচ্চ এটুকু বলা যায়, তার কুফর হলো আমলগত কুফর, বিশ্বাসগত নয়।

এ প্রসঙ্গে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয়। অথচ এ সূক্ষ্ম বিষয়ে আল্লাহর হাকিমিয়্যাহর ব্যাপারে অনেক চেতনাদীপ্ত তরুণ গাফেল ও উদাসীন।'

তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর উল্লিখিত প্রথম ব্যাখ্যাটা (ছোট কুফর) নকল করে বলেন,

وهذا قاصمة ظهر جماعة التكفير وأمثالهم من الغلاة.

'এটা তাকফীরী দল ও তাদের মতো অতিরঞ্জনকারীদের কোমর ভেঙে দিয়েছে।'[৫৩৪]

শায়খ আলবানী 'ফিতনাতুত তাকফীর' গ্রন্থে বলেন,

فإن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان – بل منذ أزمان – هو آية يدندنون دائما حولها، الا وهي قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الْكَٰفِرُونَ، فيأخذونها من غير فهوم عميقة ويوردونها بلا معرفة دقيقة .ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة، وهي: {فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الْكَٰفِرُونَ}، {فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ}، {فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ} فمن تمام جهل الذين يحتجون بهذه الآية باللفظ الأول منها فقط {فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الْكَٰفِرُونَ}: انهم لم يلموا على الأقل ببعض

৫৩৪. সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, ৬/১১১, ১১৩; হাদীস নং ২৫৫২ও ৬/৪৫৭-৫৮, হাদীস নং ২৭০৪; এবং ৭/১৩৫, হাদীস নং ৩০৫৪

CamScanner

النصوص الشرعية – قرآنا أم سنة – التي جاء فيها ذكر لفظة (الكفر)، فأخذوها بغير نظر على أنها تعني الخروج من الدين ...بينما لفظة (الكفر) في لغة الكتاب والسنة لا تعني دائما هذا الذي يدندنون حوله، ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه.

فشأن لفظة (الكافرون) – من حيث إنها لا تدل على معنى واحد – هو ذاته شأن اللفظين الآخرين: (الظالمون) و(الفاسقون)، فكما أن من وصف أنه ظالم أو فاسق لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه، فكذلك من وصف بأنه كافر، سواء بسواء.

'নিশ্চয় এই জমানায়—বরং আরও আগ থেকে—তাকফীরী ফিতনা একটি আয়াতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যা তারা সর্বদা বুলি আওড়ায় ও গুঞ্জরিত করে। তা হলো, "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।" তারা এ আয়াতটি গভীরভাবে না বুঝে গ্রহণ করে, সূক্ষ্মভাবে না জেনে প্রয়োগ করে।

আমরা জানি, এই আয়াতটি পুনরাবৃত্তি সহকারে কুরআনে এসেছে, যার শেষাংশ তিনভাবে এসেছে। অর্থাৎ ..."তারাই কাফের", "তারাই জালেম" ও "তারাই ফাসেক"।

তাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক হলো, তারা এ ক্ষেত্রে কেবল প্রথম আয়াতের শেষাংশ তথা ..."তারাই কাফের" বাক্য দ্বারা দলীল পেশ করে। এবং কুরআন-সুন্নাহর অন্যত্র "কুফর" শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা আদৌ লক্ষ করে না। ফলে তারা কেবল এই শব্দটি ইসলাম থেকে খারেজ হওয়ার অর্থে ব্যবহার করে।

অথচ "কুফর" শব্দটি সর্বদা কুরআন-সুন্নাহয় এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না, যা তারা গুঞ্জরিত করে এবং যে অবাস্তব ও ভুল বুঝের ওপর জো ধরে থাকে।

যেভাবে কেউ "জালেম" ও "ফাসেক" বিশেষণে বিশেষিত হলে সে ইসলাম থেকে খারেজ হওয়া আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ কাউকে "কাফের" বলা হলেও সে ইসলাম থেকে ছিটকে পড়া জরুরি না।'[৫৩৫]

ইয়াসাক সংবিধান ও তাকফীর

ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.) সূরা মায়েদার ৫০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সেই 'ইয়াসাক সংবিধান'-এর বিবরণ দিয়েছেন, যা তাতারিদের যুগে মুসলিম উম্মাহর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি লেখেন,

وَقَوْلُهُ تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ اللهِ الْمُحْكَمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، النَّاهِي عَنْ كُلِّ شَرٍّ وَعَدْلٍ إِلَى مَا سِوَاهُ

---

৫৩৫. দ্র. ফিতনাতুত তাকফীর, পৃষ্ঠা ২০-২১, দারু ইবনে খুযায়মাহ

مِنَ الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالِاصْطِلَاحَاتِ الَّتِي وَضَعَهَا الرِّجَالُ بِلَا مُسْتَنَدٍ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ، كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْكُمُونَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ مِمَّا يَضَعُونَهَا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ، وَكَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جِنْكِزْخَانَ الَّذِي وَضَعَ لَهُمُ الْيَسَاقَ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ مَجْمُوعٍ مِنْ أَحْكَامٍ قَدِ اقْتَبَسَهَا مِنْ شَرَائِعَ شَتَّى: مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ أَخَذَهَا مِنْ مُجَرَّدِ نَظَرِهِ وَهَوَاهُ، فَصَارَتْ فِي بَنِيهِ شَرْعًا مُتَّبَعًا يُقَدِّمُونَهَا عَلَى الْحُكْمِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ...

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী লোকদের জন্য বিধানদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে উত্তম?"

এতে আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির নিন্দা করেছেন, যে যাবতীয় কল্যাণময় ও সব ধরনের অকল্যাণমুক্ত আল্লাহর বিধান থেকে সরে যায় এবং শরীয়তের কোনো দলীল ছাড়াই মানুষ যে সকল চিন্তা, খেয়াল ও পরিভাষা আবিষ্কার করেছে, সেগুলোর দিকে ধাবিত হয়।

যেভাবে জাহিলী যুগের লোকেরা তাদের রায় ও খেয়াল-খুশির ভিত্তিতে রচিত গোমরাহী ও অজ্ঞতাপূর্ণ আইন-কানুন দ্বারা শাসন করত এবং যেভাবে তাতারিরা তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান (১১৬৫-১২২৭ ঈ.) থেকে গ্রহণ করা রাজ্য পরিচালনার নীতিমালা দ্বারা শাসন করে।

চেঙ্গিস খান তাদের জন্য "ইয়াসাক" নামক একটি সংবিধান প্রণয়ন করেছে, যা মূলত ইহুদী, খ্রিষ্টান ও ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের বিধানাবলি থেকে চয়ন করে তৈরি করেছে। এতে তার নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত অনেক বিধানও ছিল।

সংবিধানটি তার বংশধরদের মধ্যে অনুসরণীয় আইনের মর্যাদা লাভ করে। তারা এটাকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর ওপর প্রাধান্য দিত। তাদের মধ্য থেকে যারা এ কাজ করে, তারা কাফের।'[৫৩৬]

এখানে 'তারা এটাকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর ওপর প্রাধান্য দিত' তাদের কাফের হওয়ার কারণ। কেননা, ওপরে ঈমান ভঙ্গের বারোতম কারণে উল্লেখ হয়েছে যে, ইসলামের চেয়ে অন্য কোনো সংবিধানকে উত্তম বা সমতুল্য মনে করা কিংবা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর মনে করা।

সারকথা, আয়াতটির হুকুম আরোপ করার ক্ষেত্রে শাসক ও ফয়সালাকারীর বিশ্বাস ও অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া। তার বিশ্বাসে যদি অস্বীকার বা অন্য কোনো বড় কুফর পাওয়া যায়, তাহলে প্রতিবন্ধকতা না থাকলে কাফের সাব্যস্ত হবে।

৫৩৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩/১৩১

CamScanner

নিম্নে বড় কুফর হওয়ার কিছু বিবরণ দেওয়া হলো। এগুলোর যেকোনো একটা পাওয়া গেলে বড় কুফর হিসেবে গণ্য হবে :

* আল্লাহর হাকিমিয়্যাত তথা শাসকত্বের স্বীকৃতি না দেওয়া।

* আল্লাহর বিধান ও আইন অবিশ্বাস করা বা অস্বীকার করা।

* রাজনীতি বা রাষ্ট্রে শরীয়াহ আইন বিশ্বাস না করা।

* আল্লাহর বিধান ও আইন অনুযায়ী শাসন করা ওয়াজিব নয় মনে করা।

* আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনে শাসন করা বৈধ মনে করা, যদিও আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করাকে উত্তম বলে।

* কোনো বিধানকে আল্লাহর বিধান জেনেও তা নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।

* ইসলামের অকাট্য কোনো বিধানের ওপর আপত্তি তোলা বা যুগের সাথে অনুপযোগী মনে করা কিংবা সংস্কারযোগ্য বলে মনে করা।

* ইসলামের বিধান ও আইনের চেয়ে অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা ও সংবিধানকে উত্তম বা সমতুল্য মনে করা কিংবা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর মনে করা।

* আল্লাহর আইনের পরিবর্তে অন্য আইন দ্বারা ফয়সালা করে বলা যে, এটা আল্লাহর আইন।

* অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইসলামের কোনো বিধান বা রাসূলের সুন্নাহকে শরীয়তের বিধান হিসেবে অপছন্দ করা।

* কাউকে বা নিজেকে আল্লাহর বিধান ও আইনের ঊর্ধ্বে মনে করা অথবা অন্য আইনে তার বিচারকে বৈধ মনে করা।

* পুরো শরীয়াহ আইন বাতিল করে দেওয়া অথবা সব ক্ষেত্রে শরীয়াহ আইন বাদ দিয়ে শাসন করা।

* আল্লাহর আইন সত্য-সঠিক নয় বা উত্তম নয়—এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কিংবা যেকোনো ধরনের অবিশ্বাস বা অস্বীকৃতির মানসিকতা থেকে আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা না করা অথবা ভিন্ন আইন প্রণয়ন করা কিংবা বহাল রাখা। তবে আগে থেকে শরীয়াহ-বিরোধী আইন চালু হয়ে গেলে তখন কেবল প্রচলিত আইনে বিচার করা কুফরকে আবশ্যক করে না।

উল্লেখ্য, শাসক ও ফয়সালাকারী রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত হতে হবে না; বরং যে কেউ হলেই হবে, সবার ক্ষেত্রে একই হুকুম।

সর্বোপরি যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন সত্য-সঠিক ও উত্তম বিশ্বাস করে এবং তার

CamScanner

স্বীকৃতি প্রদান করে; তবে প্রবৃত্তির তাড়নায় বা অন্য কোনো কারণে তা পালন না করে, সে এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে না, তথা কাফের হবে না; বরং গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিন্তু এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্যরা—যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করে না, তারা বড় কুফর থেকে নিরাপদ ও আশঙ্কামুক্ত নয়। বিশেষত সেকুলার ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে। কেননা, সেকুলারিজম ও গণতন্ত্রের মূল কনসেপ্ট কুফর ও ঈমান ভঙ্গের কারণ, যা সবিস্তারে উল্লেখ হয়েছে এবং এ-জাতীয় রাষ্ট্রের সরকারের কার্যক্রমেও বিভিন্ন সময় কুফর প্রকাশ পায়।

মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন,

إن فسق الإمام على قسمين: الأول: ما كان مقتصراً على نفسه، فهذا لا يبيح الخروج عليه، وعليه يحمل قول من قال: إن الإمام الفاسق أو الجائر لا يجوز الخروج عليه.

والثاني: ما كان متعدياً وذلك بترويج مظاهر الكفر واقامة شعائره، وتحكيم قوانينه، واستخفاف أحكام الدين والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه، وتفضيل شرع غير الله عليه، فهذا ما يلحق بالكفر البواح، ويجوز حينئذ الخروج بشروطه.

'রাষ্ট্রপ্রধানের ফিসক-পাপাচার দুই প্রকার :

১. যে ফিসক তার ব্যক্তিজীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। এমন হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ নয়। যারা ফাসেক ও জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ নয় বলেছেন, তাদের কথা এ প্রকার ফিসকের ওপর প্রযোজ্য।

২. যা তার ব্যক্তিজীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, যেমন : কুফরীর বাহ্য বিষয়গুলোর প্রচলন করা, কুফরী নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করা, কুফরী আইন-কানুনকে বিচারক মানা এবং দ্বীনের বিধি-বিধানকে অবজ্ঞা করা আর আল্লাহর আইনকে তুচ্ছ মনে করার কারণে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহর আইনের ওপর অন্য আইন প্রাধান্য দেওয়া। এগুলো সুস্পষ্ট কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। তখন শর্তসাপেক্ষে বিদ্রোহ করা বৈধ হবে।'[৫৩৭]

বলাবাহুল্য, উল্লিখিত বিষয়গুলোর কিছু বিষয় সেকুলার ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানে এবং সরকারের কার্যক্রমে বিভিন্ন সময় প্রকাশ পায়। তবে নির্দিষ্টভাবে কাউকে তাকফীর করতে হলে উপযুক্ত প্রমাণ লাগবে।

পরিশেষে উলামায়ে কেরামের খেদমতে আরজ হলো, অধমের খেয়ালমতে

৫৩৭. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৯/২৭২। উল্লেখ্য, শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। দেখুন, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৯/২৭৩-২৭৫

বর্তমান এ বাস্তবতাকে অস্বীকারের উপায় নেই যে, আগেকার ইসতিহলালে আমলীর রূপ আর বর্তমানের ইসতিহলালে আমলীর রূপ একই পর্যায়ের নয়। যেমন : নামাজ তরক করা, যাকাত না দেওয়া কুফর নয়, তবে কবীরা গুনাহ। একইভাবে শাসক বা বিচারক যদি আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘন করে, তাও কুফর নয়, বরং কবীরা গুনাহ।

কিন্তু বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবতা হলো, শাসনব্যবস্থার বিষয়টা এতটুকুতে সীমাবদ্ধ নয়। কেননা একটা হলো, নিজে ব্যক্তিগতভাবে শরীয়তের বিধান না মানা। যেমন : অলসতা করে নামাজ না পড়া, বিচারক ঘুষ খেয়ে বা অন্য কোনো দুনিয়াবি স্বার্থে শরয়ী বিধান মতে ফয়সালা না করা।

আরেকটা হলো, শরীয়তের বিধান না মানতে বাধ্য করা। যেমন : নামাজ পড়তে না পারার আইন করা, শরয়ী বিধানমতে ফয়সালা করতে না পারার ব্যবস্থা করা। এখন যারা পশ্চিমা সেকুলারিজম ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তারা শুধু শরীয়তের বিধান নিজেরা মানে না এতটুকু নয়; বরং অন্যরাও যাতে শরীয়তের বিধান মানতে না পারে, সেই আইন করে ও ব্যবস্থা করে! কাজেই এটা কেবল নামাজ না পড়া এবং শরয়ী বিধানমতে ফয়সালা না করার মতো কবীরা গুনাহ নয়; বরং তা স্পষ্ট কুফর না হলেও কুফরীর হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে মুফতী তাকী উসমানী সাহেব হাফিযাহুল্লাহ একটু আগের আলোচনাটির শেষের দিকে গিয়ে লেখেন,

والقسم السابع: أن يرتكب فسقاً متعدياً إلى دين الناس، فيكرههم على المعاصي، وحكمه حكم الإكراه المبسوط في محله، ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو حكماً، وذلك بأن يصر على تطبيق القوانين المصادمة للشريعة الإسلامية، إما تفضيلاً لها على شرع الله، وذلك كفر صريح، أو توانياً وتكاسلاً عن تطبيق شريعة الله بما يغلب منه الظن أن العمل المستمر على خلاف الشريعة يحدث استخفافاً لها في القلوب، فإن مثل هذا التواني والتكاسل، وإن لم يكن كفراً صريحاً بحيث يكفر به مرتكبه، ولكنه في حكم الكفر، بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة الأذان: حل قتالهم؛ لأنه من أعلام الدين، وفي تركه استخفاف ظاهر به. راجع باب الأذان من رد المحتار.

‘তা ছাড়া অনেক মুসলমান নামাজ-রোযাকে শরীয়তের অংশ মনে করলেও দীর্ঘদিন খেলাফতব্যবস্থা না থাকায় এবং সেকুলারিজম ও গণতন্ত্র বিশ্বে মহামারি আকার ধারণ করার কারণে তারা ইসলামে যে রাজনীতি আছে, তা বিশ্বাসই করে না এবং শাসনব্যবস্থাকে শরীয়তেরই অংশ মনে করে না, যা নিশ্চিত কুফর।

তবে সবচেয়ে জরুরি হলো, সাধারণ মুসলমানদেরকে এসব থেকে বাঁচানোর জন্য

এবং সতর্ক করার জন্য ব্যাপকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা।'

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া ও নেতাদেরকে মানা কখন কুফর?

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'(হে নবী!) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যে কালাম অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল, এসবের ওপর তারা ঈমান এনেছে। অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত শয়তান তাদেরকে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়।'[৫৩৮]

ব্যাখ্যা : 'তাগূত'-এর শাব্দিক অর্থ 'ঘোর অবাধ্য'। এ স্থলে শব্দটি দ্বারা এমন বিচারক ও শাসককে বোঝানো হয়েছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানাবলির বিপরীতে নিজ খেয়াল-খুশিমতো ফয়সালা দেয়।

এ আয়াত থেকে কেউ কেউ বলেন, তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া কুফর।

উত্তর :

এটা সব সময় কুফর নয়; বরং বৈধ ও হালাল মনে করে বিচারপ্রার্থী হলে কুফর হবে। কিন্তু এটাকে অবৈধ ও অন্যায় জেনে যদি করে, তাহলে কুফর হবে না।

এভাবে কুরআনে কারীমে এসেছে,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

'ইহুদী-খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের গুরু-পাদরিদেরকে "রব" হিসেবে গ্রহণ করেছে।'[৫৩৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.

'ইহুদী-খ্রিষ্টান তাদের গুরু-পাদরিদের ইবাদত বা উপাসনা করত না। তবে ওরা

৫৩৮. সূরা নিসা, (৪) : ৬০
৫৩৯. সূরা তাওবা, (৯) : ৩১

CamScanner

তাদেরকে হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিল।'[৫৪০]

অর্থাৎ হালাল-হারামসহ সকল বিধি-বিধান নির্ধারণের ক্ষমতা ও আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তবে ইহুদী-খ্রিষ্টান যেহেতু আল্লাহর উক্ত ক্ষমতা ও অধিকার তাদের গুরু-পাদরিদেরকে দিয়ে রেখেছে, তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ওরা নিজেদের গুরু-পাদরিদেরকে "রব" হিসেবে গ্রহণ করেছে।'

এখান থেকে কারও কারও বক্তব্য হচ্ছে, গণতন্ত্রে জনগণ তাদের সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতাদেরকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে বিধান নির্ধারণের ক্ষমতা ও আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়ে তাদেরকে 'রব' হিসেবে গ্রহণ করেছে। কাজেই রাজনৈতিক নেতাদেরকে মানা কুফরী।

উত্তর :

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন,

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا – حيث أطاعوهم في تحليل ما حرَّم الله، وتحريم ما أحل الله – يكونون على وجهين: أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلُّوا دين الله فيتَّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتِّباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دينَ الرسل؛ فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركًا، وإن لم يكونوا يُصلُّون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتَّبع غيره في خلاف الدِّين، مع علمه أنه خلاف الدِّين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله؛ مشركًا مثل هؤلاء.

والثاني: أن يكون اعتقادُهم وإيمانُهم بتحريم [الحرام] وتحليل [الحلال] ثابتًا، لكنَّهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلمُ ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ؛ فهؤلاء لهم حُكم أمثالهم من أهل الذنوب.

'যে সকল ইহুদী-খ্রিষ্টান তাদের গুরু-পাদরিদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে তথা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল ও হালালকৃত বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে, এর দুই অবস্থা হতে পারে :

১. তারা জানে যে, তাদের গুরুরা আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করেছে। এরপরও তারা তাদের নেতাদের আনুগত্য করে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল ও হালালকৃত বস্তুকে হারাম হিসেবে বিশ্বাস করে। অথচ তারা ভালো করেই জানে যে, তাদের নেতারা রাসূলদের আনীত দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। এটা কুফর, এটাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শিরক হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। যদিও তারা নেতাদের জন্য নামাজ পড়ে না এবং সিজদাও করে না।

---

৫৪০. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৯৫, হাদীস হাসান

কাজেই যে এমন বিশ্বাস রেখে দ্বীনের বিপরীত বিষয়ে তা বিপরীত জানা সত্ত্বেও কারও আনুগত্য করে, সে তাদের মতো মুশরিক।

২. তারা হারামকে হারাম ও হালালকে হালাল বিশ্বাস করে, তবে আল্লাহর নাফরমানীতে তাদের নেতাদের আনুগত্য করেছে। যেমন : মুসলমানরা নাফরমানী জেনেও পাপকাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। তাদের হুকুম অন্যান্য পাপীদের মতোই (অর্থাৎ শুধু গুনাহগার হবে)।'[৫৪১]

সুতরাং হারামকে হারাম জেনে এবং হালালকে হালাল বিশ্বাস করে যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানীতে নেতাকে মানে বা সরকারের আনুগত্য করে, তাহলে কুফর-শিরক হবে না।

প্রশ্ন : মানুষের বানানো প্লেন ব্যবহার করতে পারলে, মানুষের প্রণয়নকৃত সংবিধানে দেশ পরিচালনা করা যাবে না কেন?

কারও কারও প্রশ্ন, মানুষের বানানো গাড়ি ও প্লেন ব্যবহার করতে পারলে, মানুষের প্রণয়নকৃত সংবিধানে দেশ পরিচালনা করা যাবে না কেন? অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর সংবিধান লাগবে কেন?

উত্তর : মানুষের বানানো লাইট থাকা সত্ত্বেও দিনের বেলায় সূর্যের আলো লাগে কেন?

যদি উত্তর হয় এমন :

ক. আলোর প্রয়োজন যেহেতু সূর্য দ্বারা পুরা হচ্ছে, তাই লাইটের দরকার নেই।

খ. আর সূর্যের আলোর সামনে লাইটের আলোর কোনো মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা নেই।

গ. তা ছাড়া সূর্যের আলো তো উপকারী, তাই এটা এভোয়েড করা যায় না।

একই উত্তর সংবিধানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য :

ক. সংবিধানের প্রয়োজন যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা পুরা হচ্ছে, তাই মানুষের প্রণয়নকৃত সংবিধানের প্রয়োজন নেই।

খ. আর আল্লাহপ্রদত্ত সংবিধানের সামনে মানুষের সংবিধানের কোনো মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা নেই।

গ. তা ছাড়া আল্লাহপ্রদত্ত সংবিধানের উপকারিতা স্বীকৃত ও পরীক্ষিত। তাই এটাও এভোয়েড করা যায় না।

এটা হচ্ছে যুক্তি-পাল্টা যুক্তির আলাপ। তবে এখানে একটা শরয়ী আলাপ রয়েছে।

---

৫৪১. মাজমুউল ফাতাওয়া, ৭/৭০

CamScanner

আর তা হচ্ছে, বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার তথা বিমান, টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদি ব্যবহারে কোনো রকম বাধা নেই, তাহলে মানুষের বানানো আইন-কানুন মানতে সমস্যা কোথায়?

উত্তর :

এখানে একটা মূলনীতি ভালো করে জেনে রাখা প্রয়োজন। তা হলো, মানুষের কাজকর্ম তিন প্রকারে বিভক্ত :

১. মামুরাত তথা আল্লাহ তাআলার আদেশাবলি। যথা : নামাজ, রোযা, ভালো কাজে সহায়তা করা ইত্যাদি এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

২. মানহিয়্যাত তথা নিষিদ্ধ বিষয়াবলি। যথা : যিনা, চুরি, ডাকাতি, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

৩. মাসকুত আনহা তথা যে সমস্ত বিষয়ে শরীয়ত স্পষ্ট কিছু বলেনি। এ-জাতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূলনীতি হলো, বিষয়টা যদি মানহিয়্যাত তথা নিষিদ্ধ বিষয়াবলির প্রকারে অন্তর্ভুক্ত না হয় বা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে সেটা বৈধ সাব্যস্ত হবে।

বিমানসহ আধুনিক আবিষ্কৃত বস্তুগুলোতে এমন কিছু না থাকার কারণে এগুলোর ব্যবহার বৈধ।

তদ্রূপ সংবিধান বা রাষ্ট্রপরিচালনার আইন/নীতি বা অন্য কিছু যতক্ষণ না মানহিয়্যাতের প্রকারে অন্তর্ভুক্ত হয় বা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, ততক্ষণ সেগুলো মানা বৈধ। যেমন : দেশের নিরাপত্তা ও উন্নতি-অগ্রগতি বজায় রাখতে যে আইন প্রণয়ন করা হয়, সেগুলোর আমরা বিরোধিতা করি না।

কিন্তু যখনই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক আইন—যেমন : নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের নামে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার আইন, মদের লাইসেন্স দেওয়ার আইন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের নামে ১৮ বছরের নিচে বিবাহ নিষিদ্ধের আইন, অথবা পাঠ্যবইয়ে বিবর্তনবাদ, ট্রান্সজেন্ডার ও হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি ইত্যাদি চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে—তখনই ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে আমরা প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি।

২. গণতন্ত্রের সংজ্ঞার দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে, By the people তথা by the selected people. অর্থাৎ জনগণের ভোটে নির্বাচিত।

জানা কথা, গণতন্ত্রে চোর-ডাকাত, জুয়াড়ি, মদখোর, ফাসেক, জালেম সবারই সমান ভোটাধিকার রয়েছে। এখানে ভোটদাতার জন্য এবং প্রার্থীর জন্য কোনো শর্ত

বা কোয়ালিটি নেই; আদালত, দিয়ানত কিছুই দেখা হয় না। শুধু মাথা গণনা করা হয় এবং মাথা গণনার ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়।

মরহুম কবি ড. ইকবাল এ বাস্তবতা তুলে ধরে বড় চমৎকার করে বলেছেন,

اس راز کو اک مرد فرنگی نے کیا فاش ٭ ہر چند کہ دانا اسے کھولا نہیں کرتے

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں ٭ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے

'এই রহস্য ফাঁস করেছে এক ইউরোপিয়ান

যে রহস্য প্রকাশ করে না কোনো বুদ্ধিমান

গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থার নাম, যেখানে

মানুষকে গণনা করা হয়, মেপে দেখা হয় না।'

অর্থাৎ কে ভালো কে খারাপ তা দেখে ভোট নেওয়াও হয় না, দেওয়াও হয় না। ভালো মানুষের ভোটেও অসৎ ব্যক্তি নেতা হয়ে যায়, আবার খারাপ মানুষের ভোটেও ভালো মানুষ নির্বাচিত হয়।

তা ছাড়া আমাদের দেশে গণতন্ত্রে এরূপ সমান ভোটাধিকারের অসারতা ও অযৌক্তিকতা একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখুন।

ধরুন, এক এলাকায় মানুষ আছে ৮০ হাজার। সেই এলাকায় নির্বাচন করতে প্রার্থী দাঁড়াল তিনজন। একজনের পক্ষে ভোট দিল ৩০ হাজার লোক। আরেকজনের মার্কায় সিল মারল ২৩ হাজার। আরেকজন পেল ২০ হাজার। আর সাত হাজার মানুষ কোনো প্রার্থীকেই সমর্থন করল না। স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচিত হবে ৩০ হাজার ভোট ও সমর্থন পাওয়া প্রার্থী।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সবচেয়ে বেশি সমর্থন পেয়েছে, তা কিন্তু নয়। কারণ, তাকে বাকি ৫০ হাজার লোক মেনে নেয়নি। কিন্তু এরপরও সে জনতার নির্বাচিত নেতা!

এরচেয়ে বড় ধোঁকা ও প্রতারণা আর কী হতে পারে?

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. বলেন,

اسلام میں جمہوری سلطنت کوئی چیز نہیں۔

'ইসলামী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলে কিছু নেই।'

অন্যত্র বলেন,

بعض لوگوں کو یہ حماقت سوجھی ہے کہ وہ جمہوری سلطنت کو اسلام میں ٹھونسنا چاہتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ اسلام میں

جمہوریت ہی کی تعلیم ہے، اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ مگر یہ بالکل غلط ہے، ان لوگوں نے مشورہ کی دفعات ہی کو دفع کر دیا۔

‘কিছু মানুষের বোকামি এত চরমে পৌঁছেছে যে, তারা ইসলামে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটাতে চায়। তাদের দাবি হলো, ইসলামে গণতন্ত্রের শিক্ষা রয়েছে। এর স্বপক্ষে তারা প্রমাণ পেশ করেছে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী দিয়ে,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"আপনি (প্রয়োজনীয়) বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।"[৫৪২]

কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল। লোকেরা পরামর্শের ধারাকেই পাল্টে দিয়েছে। ইসলামে পরামর্শের যে অবস্থান রয়েছে, তারা তা বিলকুল বোঝেনি।’[৫৪৩]

৩. For the people তথা জনগণের কল্যাণে। গণতন্ত্রের এই দিকটা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হলেও বাস্তবে এর প্রতিফলন দেখা যায় না।

গণতন্ত্রের রাজনীতির ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী হবে?

গণতন্ত্রের মূল কনসেপ্ট হারাম ও কুফরী মতবাদ হওয়ার ব্যাপারে ইলমের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কেউ দ্বিমত করার কথা না।

তবে গণতন্ত্রের প্রধান বা অবিচ্ছেদ্য একটা কাজ হচ্ছে নির্বাচন। এখন এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বৈধ কি না?

একদল আলেম মনে করেন, এতেও অনেক হারাম বিষয় থাকার কারণে অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়; বরং খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপকভাবে দাওয়াহ এবং জিহাদের প্রস্তুতি নিতে থাকবে। আলহামদুলিল্লাহ, এর সফলতা আমরা আফগানিস্তানে দেখতে পাচ্ছি।

আবার আরেক দল আলেমের বক্তব্য হচ্ছে, গণতন্ত্র হারাম ও কুফরী মতবাদ হলেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছাড়া আপাতত কার্যকরী কোনো পথ খোলা নেই। তাই শর্তসাপেক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ও ভোট প্রদান করা বৈধ। এ কারণেই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের আলেমগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন।

এ দলের প্রকৃত সফলতা দেখা না গেলেও তাদের অর্জন ও প্রাপ্তিও কম নয়। কেননা, দেশীয় রাজনীতিতে এবং সরকার ও ধর্মবিদ্বেষীদের ইসলাম-বিরোধী ইস্যুতে তাদের

---

৫৪২. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৫৯

৫৪৩. আশরাফুল জাওয়াব, ৩০৫ ও ৩০৭-৩০৮, ইকরা বুক ডিপো, দেওবন্দ

CamScanner

বড় ধরনের ভূমিকা ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যা কোনোভাবেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

তবে দুটোই ইজতিহাদী বিষয়, যার যেটা ভালো লাগে গ্রহণ করার সুযোগ আছে। উল্লিখিত সীমার মধ্যে থাকলে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে নিন্দা ও সমালোচনা করা উচিত নয়। বিষয়টা এভাবেই চলে আসছিল।

কিন্তু এখন উপরিউক্ত দুটি দল থেকে আরও দুটি দল জন্ম লাভ করেছে। প্রথম দল থেকে জন্ম নেওয়া দলটির দাবি হচ্ছে, নির্বাচন ও ভোট প্রদানসহ গণতন্ত্র-সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়েই অংশগ্রহণ করা যাবে না; বরং সবই হারাম বা কুফর!

আর দ্বিতীয় দল থেকে জন্ম লাভ করা দলটির বক্তব্য হচ্ছে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো পথই নেই! বরং কেউ কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে দাওয়াতের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলছেন। আবার কেউ এক ধাপ এগিয়ে ভোটকে প্রকৃত জিহাদ বলছেন কিংবা এটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করছেন, যেন নির্বাচনই এ যুগের প্রকৃত জিহাদ। ইন্নালিল্লাহ...!

প্রথম দুই দল থেকে জন্ম নেওয়া শাখা দুই দলই প্রান্তিকতার শিকার। উভয় দলের উচিত, এ বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করা।

আর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ইসলামী দলগুলোর প্রতি অনুরোধ থাকবে, গণতন্ত্র যেহেতু মহামারি আকার ধারণ করেছে, তাই আপনারা ভোট প্রদান ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সাময়িক বৈধতার বিষয়টি স্পষ্ট করার সাথে সাথে গণতন্ত্রের কুফর ও হারাম বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সতর্ক করবেন। কেননা, এটা ঈমান-আকীদার বিষয়, সাধারণ কোনো বিষয় নয়।

কিন্তু যারা নির্বাচন ও ভোটের পক্ষে কথা বলছেন, তারা এই সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করে বলছেন না।

সঠিক আকীদায় বিশ্বাসী ও আমানতদার ছাড়া ভোট দেওয়া যাবে না

মুফতী শফী রাহ. যেখানে ভোটকে সাক্ষ্য বলেছেন, সেখানে প্রার্থীকে সঠিক আকীদায় বিশ্বাসী ও আমানতদার হওয়ার শর্ত করেছেন। শরীয়াহ আইনে অবিশ্বাসীকে ভোট দেওয়া মিথ্যা সাক্ষ্য ও কবীরা গুনাহ বলেছেন।[৫৪৪]

উস্তাদে মুহতারাম মুফতী আবদুস সালাম রাহ. বলেন, অনৈসলামিক দলকে ভোট প্রদানের তো প্রশ্নই আসে না; বরং তিনি এটাকে ঈমান-কুফরের বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৪৫]

৫৪৪. জাওয়াহিরুল ফিকহ, ৫/৫৩৬

৫৪৫. আপকে সুওয়ালাত আওর উনকা হল, ৪/৩৯২

CamScanner

কাজেই যে দল ও প্রার্থীর আকীদা ঠিক আছে, বাধ্য হয়ে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী রাজনীতি করছে, তাদেরকে কোনো বিনিময় ছাড়া হলে ভোট দেওয়া যাবে; বরং মুফতী শফী রাহ. তখন ভোট দেওয়া জরুরি বলেছেন।

কিন্তু যারা শরীয়াহ আইনে বিশ্বাস করে না; বরং সেকুলারিজমে বিশ্বাসী এবং গণতন্ত্রের সমস্ত বিষয় নির্দ্বিধায় মেনে নেয়, তাদের ভোট দেওয়া যাবে না।

অমুসলিম বা সেকুলারদের সাথে জোট গঠন ও ভোট প্রদান

সমকালীন বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের পরামর্শে কোনো রাজনৈতিক বা জাতীয় ইস্যুতে কাফের বা সেকুলারদের সাথে জোট গঠন করা, তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা মূল নেতৃত্ব ও ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকার শর্তে জায়েয। তবে কখনো যদি বড় শত্রু বা জালেমকে প্রতিহত করার জন্য ছোট শত্রুর সাথে জোট করতে হয়, অথবা মুসলমান যদি অনন্যোপায় হয়ে কাফের বা সেকুলারদের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়, তাহলে নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে থাকার শর্ত ছাড়াও জায়েয। আর এ-জাতীয় কারণে জোট গঠন হলে অমুসলিম বা সেকুলারদেরকে ভোট দিয়ে তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে।[৫৪৬]

ঈমান ভঙ্গের উনত্রিশতম কারণ

কুফরী জাদুটোনা করা।

কুরআনে কারীমে এসেছে,

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

'সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত...।'[৫৪৭]

---

৫৪৬. দ্র. কিফায়াতুল মুফতী, ৯/৩৬৫, ৯/৩৭৯, ৯/৩৯১

৫৪৭. সূরা বাকারা, (২) : ১০২।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের আমলে কিছু শয়তান, যাদের মধ্যে জিন ও মানুষ উভয়ই থাকতে পারে, কতক ইহুদীকে ফুসলানি দিল যে, হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের রাজত্বের (খ্রিষ্টপূর্ব ৯৭০-৯৩০) সকল রহস্য জাদুর মধ্যে নিহিত। তোমরা যদি জাদু শিক্ষা করো, তবে তোমাদেরও বিস্ময়কর ক্ষমতা অর্জিত হবে। সুতরাং তারা জাদুর তালীম নিতে ও তা কাজে লাগাতে শুরু করে দিল। অথচ জাদু শেখা যে কেবল অবৈধ ছিল তা-ই নয়; বরং তার কোনো কোনো পদ্ধতি ছিল কুফরী পর্যায়ের।

ইহুদীরা খোদ হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামকেই একজন জাদুকর সাব্যস্ত করেছিল এবং তাঁর সম্পর্কে প্রচার করেছিল, তিনি শেষ জীবনে মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এসব অপবাদমূলক কাহিনি তারা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহেও জুড়ে দিয়েছিল, যা বাইবেলে আজও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেলে এখনো পর্যন্ত তাঁর মুরতাদ হওয়ার বিবরণ বিদ্যমান (দ্র. ১-বাদশানামা ১১ : ১-২১)। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক!

কুরআন মাজীদের এ আয়াতে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের প্রতি আরোপিত এ ন্যক্কারজনক অপবাদকে খণ্ডন করা হয়েছে। এর দ্বারা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে যারা অপবাদ দিত যে, 'এটা ইহুদী

মুফতী শফী রাহ. বলেন, কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় জাদু এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ড, যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করা হয় এবং তাদের সাহায্য নেওয়া হয়। তাদের সাহায্যে কিছু অলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হয়। বাবেলবাসীর যে জাদুর কথা কুরআন মাজীদে উল্লেখ হয়েছে তার উদাহরণ এটা। এটাকে পবিত্র কুরআনে কুফর বলা হয়েছে।

ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ. বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, জাদুর সকল প্রকার কুফর নয়; বরং ওই জাদু কুফর, যার মধ্যে ঈমানের পরিপন্থী কথা ও কাজ অবলম্বন করা হয়।

আর যদি ওই জাদুতে কুফর বা শিরক না থাকে, তবে গুনাহ অবলম্বন করা হলে কবীরা গুনাহ ও হারাম হবে।

জাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া হারাম। তবে মুসলমানদের ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুপাতে জাদু শিক্ষা করা কোনো কোনো ফিকাহবিদের মতে জায়েয।

তাবীযের মধ্যে শয়তান ও জিনের সাহায্য গ্রহণ করা হলে তাও জাদুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত ও হারাম।

আর যদি তাবীযের শব্দসমূহ বোধগম্য না হয় এবং শয়তানের সাহায্য গ্রহণের সম্ভাবনাযুক্ত হয়, তাও হারাম।

কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় যেগুলোকে জাদু বলা হয়, সেগুলো ছাড়া অন্যান্য জাদুর মধ্যেও কুফর ও শিরক অবলম্বন করা হলে তাও হারাম।

অনুমোদিত ও জায়েয বিষয়াদির সাহায্যে হলে এবং তা অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার না করার শর্তে জায়েয।

যদি কুরআনের আয়াত বা হাদীসের সাহায্যে অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলে করা হয়, তাহলে জায়েয নয়। উদাহরণত কারও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাবীয করা অথবা ঝাড়ফুঁক করা। এগুলো আল্লাহর নাম ও কুরআনের আয়াত-সংবলিত হলেও তা হারাম।[৫৪৮]

ও খ্রিষ্টানদের কিতাব থেকে আহরিত', তাদের সে অপবাদ কতটা মিথ্যা! এ স্থলে কুরআন মাজীদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইহুদী ও নাসারাদের কিতাবসমূহকে রদ করছে।

সত্য কথা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন কোনো মাধ্যম ছিল না, যা দ্বারা তিনি নিজে ইহুদীদের কিতাবে কী লেখা আছে তা জেনে নেবেন। এটা জানার জন্য তাঁর কাছে কেবল ওহীরই সূত্র ছিল। সুতরাং এ আয়াত তাঁর ওহীপ্রাপ্ত নবী হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। এর দ্বারা তিনি ইহুদীদের কিতাবে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের প্রতি কী ধরনের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, সে কথা জানিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং অতি দৃঢ়তার সাথে তা খণ্ডনও করেছেন।-তাওযীহুল কুরআন

৫৪৮. মাআরিফুল কুরআন, মুফতী শফী রাহ. সূরা বাকারার ১০২ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য

CamScanner

ঈমান ভঙ্গের ত্রিশতম কারণ

দ্বীনী কারণে উলামায়ে কেরামকে অপমান করা, গালি দেওয়া।

যুগে যুগে যাঁরা নবীগণের ইলম ও আমল ধারণ করে আসছেন তাঁরাই যুগের হক্কানী উলামায়ে কেরাম। তাঁরা প্রাপ্ত ইলম ও আমল মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁদের কাছেই মানুষ লাভ করে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান। চিনতে পারে নিজের প্রভুকে, শিখতে পারে আল্লাহর বিধি-বিধান। বুঝতে পারে শরীয়তকে।

তাঁরা মানুষের আসল সফলতা আখিরাতের মুক্তির চিন্তায় সর্বাধিক চিন্তাশীল। তাঁরা উম্মতের পরম মঙ্গলকামী। তাঁদের কাছে ইসলাম সবার আগে। তাঁরা দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী। দ্বীন রক্ষার ঢাল ও সুদৃঢ় প্রাচীর। ইসলামের বিরুদ্ধে সব ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট। তাঁরা নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করে সব ধরনের বাতিল মতবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য সর্বদা অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যান। তাঁরা হক কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। হক প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জান-মাল ব্যয় করতে পরোয়া করেন না। বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করতে কালক্ষেপণ করেন না। তাঁদের হাতেই জিন্দা হয় সুন্নাত। দূরীভূত হয় বিদআত।

আল্লাহ তাআলা তাঁদের বানিয়েছেন নিজ একত্ববাদের অন্যতম সাক্ষী। ইরশাদ করেছেন,

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতারা এবং ন্যায়নিষ্ঠ আলেমরাও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।'[৫৪৯]

যেখানে কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া, হিংসা-বিদ্বেষ রাখা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা নাজায়েয ও ফাসেকী কাজ, সেখানে উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ উলামায়ে কেরামকে অপমান করা, গালি দেওয়া, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা যে আরও জঘন্যতম কাজ, তা বলাই বাহুল্য।

আলেমকে অপমান করা ও গালি দেওয়ার দুটি কারণ হতে পারে :

১. ব্যক্তিগত কোনো কারণে, যেমন : জায়গা-জমি বা লেনদেনে সমস্যা হওয়ার কারণে। এটা কুফর নয়।[৫৫০]

২. আলেম হওয়ার কারণে বা দ্বীনী কথা বলার কারণে।

কোনো আলেমকে আলেম হওয়ার কারণে কিংবা দ্বীনী কথা বলার কারণে গালি

---

৫৪৯. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৮

৫৫০. ইনআমুল বারী, তাকী উসমানী, ১/৩২৩-২৪

CamScanner

দেওয়া, অপমান করা ও তাঁর সঙ্গে দুশমনি করা একটি কুফরী কাজ। এটি খুবই ভয়াবহ মানসিকতা। এমন মানসিকতা লালনকারী ব্যক্তি তাওবা না করলে ঈমানের সঙ্গে তার মৃত্যু হবে কি না ঘোর সন্দেহ আছে।

ইমাম ইবনুল মুবারক রাহ. বলেন,

من استخف بالعلماء ذهبت آخرته.

'যে আলেমদের অবজ্ঞা করে, তার আখিরাত বরবাদ হবে।'[৫৫১]

ফকীহ ইবনে নুজাইম মিসরী রাহ. (৯৭০ হি.) বলেন,

وَيُخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرُ إِذَا شَتَمَ عَالِمًا أَوْ فَقِيهًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ.

'যদি কোনো আলেমকে (ব্যক্তিগত) কোনো কারণ ছাড়া (আলেম হওয়ার কারণে) গালি দেয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'[৫৫২]

এর কারণ হচ্ছে, উলামায়ে কেরাম হলেন আম্বিয়া কেরামের ওয়ারিশ ও তাঁদের প্রতিনিধি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের মনোনীত করেছেন দ্বীনের জন্য। তাই আলেমদের সঙ্গে বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করা, তাঁদের গালি দেওয়া ও অপমান করা পরোক্ষভাবে ইসলামকে অসম্মান করার নামান্তর।

আল্লাহ তাআলা আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের ঈমান ভঙ্গের সকল কারণ ও রূপসমূহ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

বিদআত : পরিচিতি ও মূলনীতি

বিদআত দুই প্রকার : ১. কুফরী বিদআত, ২. ফিসকী বিদআত।

প্রথম প্রকার হচ্ছে, যা পাওয়া গেলে ঈমান ভঙ্গ হয় ও কাফের হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, যা করলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ থেকে খারেজ হয়। এতক্ষণ প্রথম প্রকার আলোচিত হয়েছে। এখন দ্বিতীয় প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হবে।

দ্বীন-ধর্ম থেকে কোনো কিছু বিয়োজন ও কমানোকে বলা হয় 'ইলহাদ'। আর সংযোজন ও বাড়ানোকে বলা হয় 'বিদআত'। এটা আকীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রে হতে পারে। যদিও আমরা 'বিদআত' শব্দ থেকে সাধারণত আমলের ক্ষেত্রটাকে বুঝে থাকি।

ইসলামী শরীয়তে ছাড়াছাড়ির যেমন অবকাশ নেই, তেমনইভাবে বাড়াবাড়িরও

---

৫৫১. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৪০৮

৫৫২. আল-বাহরুর রায়েক, ৫/২০৭; আরও দেখুন, শারহুল ফিকহিল আকবার, মুল্লা আলী কারী, পৃষ্ঠা ৪৭০-৪৭৫; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ২/২৩৯; আহসানুল ফাতাওয়া, ১/৩৮

কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তরকারিতে যেমন লবণ বেশি হলে খাওয়া যায় না, তেমনই দ্বীনের মধ্যে বৃদ্ধি করলেও তা গ্রহণযোগ্য হয় না। সহীহ হাদীসে এসেছে,

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

'বিদআত হলো পথভ্রষ্টতা, আর পথভ্রষ্টার পরিণাম হলো জাহান্নাম।'[৫৫৩]

আরেকটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ.

'আল্লাহ তাআলা বিদআতীদেরকে তাওবা থেকে দূরে রাখেন।'[৫৫৪]

বিদআত পরিচিতির জন্য চারটি মূলনীতি

প্রথম মূলনীতি

এটা কয়েকটা পয়েন্ট আকারে বুঝতে হবে :

১. সুন্নাহ ও শরীয়তের বিরোধিতা বা বিদআত থেকে বাঁচতে হলে কুরআন-সুন্নাহ উভয়টাকে গ্রহণ করতে হবে এবং কুরআন-সুন্নাহর স্বীকৃত ব্যাখ্যা বিশেষত কুরআনের তাফসীর উক্ত শাস্ত্রের আলোকে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِه.

'তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত এ বস্তুদ্বয়কে আঁকড়ে ধরবে, পথভ্রষ্ট হবে না—কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ।'[৫৫৫]

আর কুরআনের মনগড়া তাফসীর প্রসঙ্গে সহীহ হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه ابن حبان في الثقات له ١٣٩١٣ بسند صحيح.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মনগড়া তাফসীর করবে, তার স্থান জাহান্নাম ছাড়া বৈকি।'[৫৫৬]

মূলনীতির এ পয়েন্ট গ্রহণ করলে হাদীস অস্বীকারকারী-আহলে কুরআন, কাদিয়ানী,

---

৫৫৩. নাসায়ী, হাদীস নং ১৫৭৮, সনদ সহীহ

৫৫৪. আল-মু'জামুল আওসাত, তাবরানী, হাদীস নং ৪২০২, সনদ হাসান

৫৫৫. মুআত্তা মালেক, হাদীস নং ৩; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩১৮, সনদ সহীহ

৫৫৬. তিরমিযী, হাদীস নং ২৯৫০

CamScanner

হিজবুত তাওহীদ, বেরেলভী, লা-মাযহাবী ও মাওলানা মওদুদী সাহেবসহ প্রায় ব্যক্তি ও ফেরকার বিকৃতি ও ভ্রান্তি ধরতে পারবেন।[৫৫৭]

২. সহীহ হাদীস ও আমলযোগ্য হাদীস থেকে গৃহীত হলে তা বিদআত হবে না।

মূলনীতির এ পয়েন্ট বলে দেয় যে, সুন্নী-বেরেলভী বন্ধুরা বিভিন্ন আকীদা-আমল সহীহ হাদীস থেকে গ্রহণ না করার কারণে শরীয়তে বৃদ্ধি করে বিদআতে লিপ্ত হয়। যেমন : নবীকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করা হতো না বা নবী নূরের তৈরি কিংবা 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বললে আঙুলে চুমা খাওয়া ইত্যাদি।

আর আহলে হাদীস/লা-মাযহাবী বন্ধুরা আমলযোগ্য হাদীস থেকে গ্রহণ না করার কারণে সহীহ হাদীসের নামে ফিতনা সৃষ্টি করে। যেমন : বুকের ওপর হাত বাঁধার হাদীস। কারণ, বুকের ওপর হাত বাঁধার হাদীসমতে ১১০০ হিজরী পর্যন্ত কেউ আমল করেনি।[৫৫৮]

৩. চার খলীফার সুন্নাহতে পাওয়া গেলে তা বিদআত হওয়া তো দূরের কথা; বরং মান্য করা ওয়াজিব। ইরবায ইবনে সারিয়া রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

'আমার পর তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু ইখতিলাফ-মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়েতের পথের পথিক খলীফাগণের সুন্নাহকে সর্বশক্তি দিয়ে ধারণ করবে। আর সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় থেকে দূরে থাকবে। কারণ, সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় বিদআত। আর সকল বিদআত গোমরাহী।'[৫৫৯]

---

৫৫৭. এদের অনেকেরই কুরআনের তাফসীর রয়েছে। যেমন : কাদিয়ানীদের বিকৃত অনুবাদ ও মনগড়া তাফসীর 'তাফসীরে কাবীর' ও 'তাফসীরে সাগীর' (যার ইংরেজি-বাংলাসহ ৬৫টি ভাষায় কয়েক বছর আগে 'বিরল কুরআন প্রদর্শনী'র নামে সুন্দরবনে প্রদর্শনী করেছে), মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরেলভী সাহেবের 'কানযুল ঈমান' এবং মাওলানা মওদূদী সাহেবের 'তাফহীমুল কুরআন' প্রভৃতি। তবে কাদিয়ানীদের বিকৃতি কুফর আর অন্যদের বিকৃতি ভ্রষ্টতা হিসেবে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে।
সবিস্তারে জানতে দেখুন, কাশ্মীরী রাহ.-এর ইকফারুল মুলহিদীন গ্রন্থটি।

৫৫৮. অনেকে মনে করেন, বুকের ওপর হাত বাঁধার কথা শাফেয়ী মাযহাবে রয়েছে। এটা ভুল তথ্য। কারণ, শাফেয়ী মাযহাবের কিতাবসমূহে রয়েছে, বুকের নিচে হাত বাঁধার কথা। আর বুকের ওপর হাত বাঁধার কথা ১১০০ হিজরী পর্যন্ত কেউ বলেনি। সর্বপ্রথম আমীর ছানআনী (মৃ. ১১৮৩ হি.) বুকের ওপর হাত বাঁধার কথা বলেছেন। এরপর কাযী শাওকানী, মুবারকপুরী, আজীমাবাদী ও আলবানী সাহেবরা বলেছেন। সবিস্তারে জানতে দেখুন, الاقتصاد في التقليد والاجتهاد لحكيم الأمة أشرف علي التهانوي مع تعليقنا ص ২৮৫-২৮৭।

৫৫৯. মুসনাদে আহমদ, ১৭১৪৫, ২৮/৩৭৫, সহীহ হাদীস

CS CamScanner

মূলনীতির এ পয়েন্টের আলোকে বিদআত বলা যাবে না হযরত আবু বকর রাযি.-এর জময়ে কুরআন, হযরত উমর রাযি.-এর চালুকৃত জামাআত সহকারে বিশ রাকাত তারাবীহ এবং হযরত উসমান রাযি.-এর জারিকৃত জুমআর দ্বিতীয় আজান, যা অনেক আহলে হাদীস মানে না।

৪. সাহাবায়ে কেরামের তাআমুলে পাওয়া গেলে তা বিদআত হবে না; বরং তা অনুসরণ করা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও জান্নাতী হওয়ার আলামত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

'অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ এবং যে সমস্ত মুসলমান নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।'[৫৬০]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতী আর জাহান্নামী লোকের পরিচয় তুলে ধরে বলেন,

وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. أخرجه الترمذي وقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ مُفَسَّرٌ.

'বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। কিন্তু সব দলই জাহান্নামী, শুধু এক দল হবে জান্নাতী। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাসূল! সেই এক দলে কারা থাকবেন? বললেন, যারা আমার এবং আমার সাহাবীদের মত ও পথের পথিক হবে।'[৫৬১]

মূলনীতির এ পয়েন্টের কারণে বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হয় না আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি, যা চার মাযহাবে রয়েছে। যথা : রফয়ে ইয়াদাইন করা বা না করা ও আমীন জোরে বা আস্তে বলা ইত্যাদি, যা অনেক আহলে হাদীস স্বীকার করে না।

এভাবে অস্পষ্ট বিধানের ব্যাখ্যা সাহাবায়ে কেরাম থেকে গ্রহণ করা বিদআত নয়। যেমন : কমপক্ষে এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা দাড়ি রাখা ওয়াজিব হওয়া। সবিস্তারে জানতে দেখুন বান্দার 'দাড়ি ও তার পরিমাণ' বইটি।

৫. অনেকের মতে, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগের অধিকাংশ আহলে হক থেকে যদি কোনো কাজ বা আমলের সমর্থন পাওয়া যায় কিংবা জানা সত্ত্বেও কারও থেকে নিষেধ পাওয়া না যায়, তবে তা বিদআত হিসেবে গণ্য হবে না।

---

৫৬০. সূরা তাওবা, (৯) : ১০০
৫৬১. তিরমিযী, ২/৯২, হাদীস নং ২৮৩২, তাবরানী আওসাত, ৪৮৮৬, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য

এই দুই যুগের সমর্থন গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হলো, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

'আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম হলো, আমার যুগের লোক। অতঃপর তাবেয়ীদের যুগ। এরপর তাবে-তাবেয়ীদের যুগ।'[৫৬২]

তিন থেকে নিয়ে পাঁচ পর্যন্ত মূলনীতির পয়েন্টগুলোর আলোকে বেরেলভীদের বিভিন্ন কাজ ও রসম বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হয়। কেননা, এগুলোর কার্যকারণ, যৌক্তিকতা ও উদ্বুদ্ধকারী বিষয় থাকা সত্ত্বেও চার খলীফার সুন্নাহ বা সাহাবায়ে কেরামের আমল কিংবা তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগের লোকদের থেকে সমর্থন পাওয়া যায় না।

৬. কোনো বিষয়ের ওপর উলামায়ে উম্মতের ইজমা হলে তা বিদআত হবে না; বরং তা অনুসরণ করা ওয়াজিব।

৭. শর্তসাপেক্ষ উসূলের আলোকে ইজতিহাদ ও কিয়াসকৃত মাসআলাকে বিদআত না বলা চাই। যদিও সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে চার মাযহাবে কিছু মাসআলায় জায়েয-নাজায়েযের মতভেদ হয়েছে।

বেরেলভী বা বিদআতীরা শর্তসাপেক্ষ উসূলের আলোকে ইজতিহাদ-কিয়াস না করার কারণে কিংবা ইজতিহাদ ও বিদআতের মাঝে পার্থক্য করতে না পারায় আমলের নামে বিদআতে লিপ্ত হয়। সামনে এর ব্যাখ্যা লক্ষ করুন।

দ্বিতীয় মূলনীতি

ইবাদতের নিয়তে নতুন যে আমল বা পদ্ধতি করছি/করতে চাচ্ছি, এটার কার্যকারণ, যৌক্তিকতা ও উদ্বুদ্ধকারী নবী ও সাহাবা যুগে ছিল কি না? এখানে দুই অবস্থা :

এক. সেই যুগে ছিল না, বরং পরবর্তী যুগে সৃষ্ট বা আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন : প্লেনে নামাজ পড়া, রোযা অবস্থায় ইনজেকশন দেওয়া, ব্যাংক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন নতুন পদ্ধতি ইত্যাদি। এগুলোর ক্ষেত্রে বিদআতের প্রয়োগ হবে না; বরং ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম নির্ধারিত হবে।

দুই. নবী ও সাহাবী যুগে এর কার্যকারণ, যৌক্তিকতা ও উদ্বুদ্ধকারী ছিল। কিন্তু এরপরও তারা সেই কাজ বা আমল করেননি। যেমন : জুমআর দ্বিতীয় আজানের ওপর ইজতিহাদ-কিয়াস করে ঈদের নামাজের জন্য আজান দেওয়া। এখানে

৫৬২. বুখারী, হাদীস নং ৩৬৫০; আরও দেখুন, রাহে সুন্নাত, সারফারায খান সফদর, পৃষ্ঠা ৭৯ ও আকায়েদে ইসলাম, আবদুল হক, পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪

আজানের কারণ হচ্ছে ঈদের নামাজ। তো ঈদের আজানের কারণ হলো ঈদের নামাজ, যা সে যুগে ছিল; এরপরও আজান ছিল না।

এ দ্বিতীয়টার হুকুম বোঝার জন্য এর প্রকার বুঝতে হবে। এটা দুই ভাগে বিভক্ত :

১. যে আমলটি করতে চাচ্ছি এর কার্যকারণ, যৌক্তিকতা ও উদ্বুদ্ধকারী যে বিষয়টি সে যুগে ছিল, তা পালনের পদ্ধতি নির্ধারিত। যেমন : আজানের আগে সালাত ও সালাম বলার আমলটি করতে চাচ্ছি। এখন এই সালাত ও সালামের কার্যকারণ ও যৌক্তিকতা হচ্ছে আজান। তো সে যুগে আজানের নির্ধারিত পদ্ধতি রয়েছে, যেটাতে আজানের আগে সালাত ও সালাম বলার আমল নেই। সুতরাং আজান সে যুগে ছিল, কিন্তু সালাত ও সালামের আমলটি ছিল না।

এই প্রকারের হুকুম হচ্ছে, উক্ত নির্ধারিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে ভিন্নভাবে আদায় করা বিদআত। কাজেই সে যুগে যে সকল ইবাদত পালনের নির্ধারিত পদ্ধতি রয়েছে, এর থেকে বাড়ানো বিদআত।

২. যে আমলটি করতে চাচ্ছি এর কার্যকারণ ও উদ্বুদ্ধকারী যে বিষয়টি সে যুগে ছিল, তা পালনের পদ্ধতি নির্ধারিত নয়। যেমন : জিকির করা, দরূদ শরীফ পড়া, দাওয়াত-তাবলীগের কাজ করা, ওয়াজ করা, দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ইত্যাদি। এগুলোর জন্য সে যুগে সুনির্ধারিত কোনো পদ্ধতি ছিল না। সুতরাং এগুলো বৈধ যেকোনো পদ্ধতিতে পালন ও আমল করা যাবে।

কিন্তু এগুলো পালনের জন্য ইজতিহাদ-কিয়াসের মাধ্যমে হোক বা স্বপ্নযোগে হোক কিংবা কাশফ-ইলহামের মাধ্যমে হোক, একটা নির্ধারিত সময় কিংবা নির্ধারিত পদ্ধতিকেই আবশ্যকীয় মনে করা বা একটা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করলেই শুধু সওয়াব পাওয়া যাবে মনে করা বিদআত হিসেবে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, কিছু সাহাবী ও পরবর্তী ইমাম বলেছেন, জিকির, দরূদ পাঠ, দুআ, সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকা ইত্যাদির জন্য নির্ধারিত সময়-দিন বা পদ্ধতি আবশ্যকীয় করে নেওয়া বিদআত। এভাবে নামাজের পর কিংবা ঈদের নামাজের পর সালাম-মুসাফাহা আবশ্যকীয় করে নেওয়া বিদআত বলেছেন।

এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, যে আমল বা বিষয় পালন করতে সাধারণত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় না বা লম্বা সময় দিয়ে তা অর্জন করতে হয় না, এগুলোর ক্ষেত্রে কোনো সময়-দিন বা পদ্ধতি নির্ধারিত করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কারও মনে প্রশ্ন আসতে পারে, তাবলীগওয়ালারা যে একটা নির্ধারিত পদ্ধতিকে আবশ্যকীয় মনে করে। এভাবে কওমী মাদরাসাগুলো যে দ্বীনী ইলম শিক্ষার জন্য একটা পদ্ধতিকে আবশ্যকীয় মনে করে। তাহলে এগুলো কি বিদআত হবে না?

CamScanner

উত্তর :

একটা হচ্ছে, মূল দাওয়াত-তাবলীগের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিকে আবশ্যকীয় মনে করা। অর্থাৎ এটা ছাড়া আর কোনো পদ্ধতিতে করা যাবে না বা করলে দাওয়াত-তাবলীগের কাজ করার যে সওয়াব রয়েছে, তা পাওয়া যাবে না, এটা মনে করলে অবশ্যই বিদআত।

আরেকটা হচ্ছে, আমার সাথে বা আমার দলে দাওয়াত-তাবলীগের কাজ করতে হলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে করতে হবে এবং তাবলীগের কাজ করার যে সওয়াব রয়েছে, তা এ পদ্ধতিতে করলেও পাওয়া যাবে, এটা বিদআত নয়। কারণ, এটা নির্ধারণকারীর দৃষ্টিতে এ যুগের জন্য অধিক ফলপ্রসূ হওয়া ও ব্যবস্থাপনার কারণে করা হয়। যেমনটা তাবলীগ জামাআতে করা হয়ে থাকে।

অনুরূপ দ্বীনী ইলম শিক্ষা করার বিষয়টি। অর্থাৎ কওমী মাদরাসা ও এর নিসাবকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা করার একমাত্র পদ্ধতি মনে করা এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে তা করা যাবে না কিংবা করলে দ্বীনী ইলম শিক্ষা করার যে সওয়াব রয়েছে তা হবে না—এমন মনে করলে বিদআত হবে।

তবে অধিক ফলপ্রসূ ও ব্যবস্থাপনাগত কারণে যদি এটাকে আবশ্যকীয় মনে করে থাকে এবং ইলম শিক্ষার সওয়াব এ পদ্ধতিতে করলেও পাওয়া যাবে মনে করে, তাহলে বিদআত হবে না।

তাসাওউফের সকল আমল ও শোগল সম্পর্কেও একই কথা। আত্মশুদ্ধি বা আত্মাকে উত্তম গুণে গুণান্বিত করা শরীয়তের নির্দেশ। উক্ত নির্দেশ পালনের জন্য কারও পক্ষ থেকে একটা পদ্ধতিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এটাকে শরীয়ত কর্তৃক একমাত্র সুনির্ধারিত ও আদিষ্ট পন্থা মনে করা হয় না।

মোটকথা, দ্বিতীয় অবস্থার যে দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে, এতে প্রথম প্রকারে কোনো ধরনের ইজতিহাদ-কিয়াসের সুযোগ নেই। আর দ্বিতীয় প্রকারে (ইজতিহাদ-কিয়াসের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনোভাবে হোক) একটা নির্ধারিত সময় কিংবা নির্ধারিত পদ্ধতিকে শরীয়তের আবশ্যকীয় বিষয় মনে করা বা উক্ত পদ্ধতিতে করলেই সওয়াবের কারণ মনে করা বিদআত।

সুতরাং প্রতি জুমআর নামাজের পর দরূদ শরীফ পড়ার জন্য মিলাদ-কিয়ামের প্রচলিত নির্দিষ্ট পদ্ধতি বিদআত।

তবে হ্যাঁ, কখনো কোথাও যদি বিশেষ কোনো সওয়াবের নিয়ত ছাড়া এবং শরীয়ত কর্তৃক সুনির্ধারিত ও আদিষ্ট পন্থা মনে করা ব্যতীত এমন কেউ করে, তাহলে বিদআত হবে না।

তৃতীয় মূলনীতি

এরপরও কোনো আমল বা বিষয়ে বিদআত হবে কি হবে না, এ নিয়ে সংশয় হতে পারে। তখন উসূল হচ্ছে, যে আমলটি সুন্নাত বা বিদআত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত নয়, তা বর্জনীয়। কেননা, শরীয়তের দাবি হলো, সুন্নাত মোতাবেক আমল করার সাথে সাথে বিদআত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। তাই যে আমলের ব্যাপারে এই সন্দেহ হবে যে, এটা কি সুন্নাত না বিদআত, সেই আমলকেও বর্জন করবে। একাধিক ইমাম সুস্পষ্টভাবে তা বলেছেন, যা হানাফী ফিকহের অনেক ফতোয়ার কিতাবে রয়েছে।

ইমাম সারাখসী রাহ. (মৃ. ৪৮৩ হি.) বলেন,

وما تردد بين البدعة والسنة يتركه؛ لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم.

'যে আমলটি সুন্নাত কিংবা বিদআত হওয়া নিয়ে দ্বিধা হয়, তা ছেড়ে দেবে। কেননা, বিদআত বর্জন করা আবশ্যকীয়, কিন্তু সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা জরুরি নয়।'[৫৬৩]

আল্লামা মাহমুদ ইবনে মাজাহ বুখারী রাহ. (মৃ. ৬১৬ হি.) বলেন,

وكل ما دار بين البدعة والسنّة كان تركه أولى من الإتيان به.

'যে বিষয়টি সুন্নাত কিংবা বিদআত হওয়াটা নিশ্চিত নয়, তা আমল করার চেয়ে বর্জন করা উত্তম।'[৫৬৪]

ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) লেখেন,

وما تردّد بين البدعة والسنة تركه؛ لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم.

'যে আমলটি সুন্নাত কিংবা বিদআত হওয়া নিয়ে দ্বিধা হয়, তা বর্জনীয়। কেননা, সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা জরুরি নয়, কিন্তু বিদআত বর্জন করা আবশ্যকীয়।[৫৬৫]

একই বক্তব্য 'বাদায়িয়ুস সানায়ী', 'আল-বাহরুর রায়েক', 'ফাতাওয়া শামী' ও 'ফাতাওয়া আলমগীরী'-তেও রয়েছে।

চতুর্থ মূলনীতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنا هَذا ما لَيس مِنهُ فَهو رَدٌّ.

---

৫৬৩. আল-মাবসূত, ২/১৪৬
৫৬৪. আল-মুহীতুল বুরহানী, ২/১০৮
৫৬৫. ফাতহুল কাদীর, ১/৫২১

CamScanner

'যে কেউ দ্বীন-শরীয়ত নয় এমন কিছুকে আমাদের এই দ্বীন-শরীয়তে আবিষ্কার করলে, তা পরিত্যাজ্য।'[৫৬৬]

এ হাদীস জানিয়ে দিচ্ছে, কোনো বিষয় বা কাজ তখনই পরিত্যাজ্য হবে তথা বিদআত হিসেবে গণ্য হবে, যখন দ্বীন-শরীয়ত মনে করে নতুন কিছু আবিষ্কার করা হবে। কাজেই দুনিয়াবি হিসেবে নব-আবিষ্কৃত বিষয়, যেমন : মোবাইল, বিমান ও মাইক ইত্যাদি বিদআত নয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, 'সাহাবীদের এক কাফেলা একবার সফরে বের হন। পথিমধ্যে তারা আরবের একটি গোত্রের এলাকায় পৌঁছালে তাদের মেহমান হতে আবেদন করেন, কিন্তু গোত্রবাসী তাদের মেহমানদারী করতে অসম্মতি জানায়। এ সময় গোত্রপ্রধানকে সাপ বা বিচ্ছু দংশন করে এবং গোত্রবাসী বিষ নামানোর জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো কাজ হয় না। অবশেষে তারা সাহাবীদের কাছে এসে বলল, আমাদের গোত্রপ্রধান দংশিত হয়েছেন, আমরা সব ধরনের চেষ্টা করেছি, কিন্তু ফল হচ্ছে না। তোমাদের কাছে কি কিছু আছে?

এক সাহাবী বললেন, হাঁ, আমি ঝাড়ফুঁক জানি, কিন্তু আমরা তোমাদের কাছে মেহমানদারীর আবেদন করেছি, তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ।

অতঃপর তিনি বলেন,

فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ.

"আল্লাহর শপথ, তোমরা বিনিময় নির্ধারণ করার আগ পর্যন্ত আমি কোনো প্রকার ঝাড়ফুঁক করব না। অবশেষে তারা এক পাল ছাগল দিতে সম্মত হলো। সে সাহাবী সূরা ফাতেহা পড়ে ওই ব্যক্তির গায়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সে এমন সুস্থ হয়ে গেল, যেন সে এইমাত্র বাঁধনমুক্ত হলো এবং এমনভাবে হাঁটতে লাগল যেন তার কোনো কষ্টই নেই। অতঃপর তারা তাদের ওয়াদাকৃত বিনিময় দিল। তখন একজন সাহাবী বললেন, এগুলো আমরা ভাগ করে নিই। তখন যে সাহাবী ঝাড়ফুঁক করেছেন তিনি বললেন, না, নবীজীকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া তা হবে না। তিনি যা বলেন তা-ই করব। তারা নবীজীর কাছে আসার পর পুরো ঘটনা বলেন। তখন নবীজী বলেন,

৫৬৬. বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭; মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮

তোমাদের কে বলল, এটি জাহেলী ঝাড়ফুঁক! **তোমরা যা করেছ ঠিকই করেছ। যাও, এগুলো তোমাদের মাঝে বণ্টন করে নাও আর আমাকেও এক অংশ দিয়ো।**"'[৫৬৭]

খারিজা ইবনুস সালত তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, 'তার চাচা একদা এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, এক লোক উন্মাদ হয়ে গেছে। তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তখন ওই লোকের পরিবার খারিজার চাচার কাছে এসে বলল, আমরা শুনেছি তোমাদের রাজা (নবীজী) নাকি উত্তম কিছু নিয়ে এসেছেন। তাই তোমার কাছে কি এ ব্যক্তির চিকিৎসার কিছু আছে?'

فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَبَرَأَ، فَأَعْطَاهُ مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: كُلْ، فَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، فَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ.

'তখন আমি তিন দিন তাকে সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁ দিলাম। এতে লোকটি সুস্থ হয়ে গেল এবং তারা একশটি ছাগল হাদিয়া দিল। তিনি নবীজীর কাছে এসে ঘটনা শোনালেন। নবীজী বললেন, এ ছাগল তুমি খাও। অন্যরা বাতিল ঝাড়ফুঁক করে খায়, এগুলো তো তুমি সত্য ঝাড়ফুঁক করে পেয়েছ।'[৫৬৮]

এ হাদীসদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয়, দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে কুরআন পড়ে বা খতম করে কিছু নেওয়া বা টাকার লেনদেন করা অবৈধ নয় এবং তা বিদআতও নয়।

সুতরাং কোনো বিষয় বা কাজ তখনই বিদআত হিসেবে গণ্য হবে, যখন এতে এ শর্ত পাওয়া যাবে যে, দ্বীন-শরীয়ত মনে করে নতুন কিছু আবিষ্কার করা হবে। অথবা ধর্মীয় বিষয় দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে না হয়ে আখিরাতের উদ্দেশ্যে করা হবে। কাজেই দুনিয়াবি হিসেবে নব-আবিষ্কৃত বিষয়, যেমন : মোবাইল ইত্যাদি বিদআত নয়। কেননা, তা দ্বীন-শরীয়ত মনে করে আবিষ্কার করা হয়নি। এভাবে দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করাও বিদআত নয়। কেননা, বিষয়টি ধর্মীয় হলেও আখিরাতের উদ্দেশ্যে করা হয় না; বরং রহমত ও বরকতের উদ্দেশ্যে করা হয়।

বিদআতী ও বিদআতের শিকার ব্যক্তির মাঝে তারতম্য

মনে রাখতে হবে, বিদআত অনেক ব্যক্তি ও ঘরানার মধ্যেই আছে।[৫৬৯] কিন্তু দ্বীনী বিষয়ে অপব্যাখ্যা করা যাদের শিআর ও বৈশিষ্ট্য, বিদআতের প্রতি আনুকূল্য যাদের মানহাজ, বিদআতের প্রতি পক্ষপাতই যাদের মেজায, বিদআতই যাদের খুসূসিয়্যত, বিদআতই যাদের স্বতন্ত্র ফেরকা হওয়ার ভিত্তি, বিদআতের কারণে যাদের আলাদা

---

৫৬৭. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৪৯

৫৬৮. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২১৩৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৬১১০, ৬১১১

৫৬৯. বরং একেবারে বিদআতমুক্ত কোনো ব্যক্তি ও ঘরানা সম্ভবত নেই।

CamScanner

পরিচিতি এবং যাদের আকীদা-আমলে বিদআতের ছড়াছড়ি, বিদআতের এশায়াত যাদের ঐতিহ্য, তারা আর যে সকল ব্যক্তি ও ঘরানা সাধারণত সুন্নাহ অনুসরণ এবং সাহাবা ও সালাফের তরীকা মানার চেষ্টা করে, তবে কিছু ক্ষেত্রে বিদআতের শিকার হয়ে যায়, উভয় এক পর্যায়ের নয়।

তবে কিছু ক্ষেত্রের বিদআতগুলোকেও অবশ্যই বিদআত মানতে হবে এবং সেগুলো থেকেও দূরে থাকতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিদআতমুক্ত আমল ও জীবনযাপনের তাওফীক দান করুন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

CamScanner